

বাংলা
সাহিত্যে
চর্চামের
অবদান

অধ্যাপক শাহেদ আলী

বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান

অধ্যাপক শাহেদ আলী



বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা— চট্টগ্রাম

বাংলা সাহিত্যে চতুর্থাংশের অবদান

অধ্যাপক শাহেদ আলী

প্রকাশক :

এন, এম, হাবিবউল্লাহ

ভারপ্রাপ্ত পরিচালক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম

ফোন : ২২৭৩২৫

ঢাকা অফিস :

১২৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা

ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৯২০১

বিক্রয় কেন্দ্র :

১৫০-১৫২, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫

নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম

দ্বিতীয় প্রকাশ :

জানুয়ারী, ১৯৯৭

পৌষ, ১৪০৩

রমজান, ১৪১৭

স্বস্ত্য : লেখক

কন্সল :

সমর মজুমদার

কম্পোজ : এশেঞ্জ কম্পিউটার

৬৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণ :

আল-মানার প্রিন্টিং প্রেস

১০, নন্দলাল দত্ত লেন,

লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

দাম : ৮৫.০০ টাকা।

Bangla Shahittaye Chattragramer Aubodan By Professor Shahed Ali.
Published by N. M. Habib Ullah, Director-in-charge, Bangladesh Co-operative
Book Society Ltd. Niaz Manjil, Jubilee Road, Chittagong. Phone : 227325.
Dhaka Office : : 125, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Phone : : 9569201 Sales
Center : 150-152, New Market, Dhaka-1205 & Niaz Manjil Jubilee Road,
Chittagong Second Edition : January, 1997.

Price Tk. 85.00 US \$ 8.5

ISBN : 984-493-019-7

প্রকাশকের কথা

জনাব শাহেদ আলী পেশাগত জীবনে বহু কলেজে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। সৃষ্টি কর্মের দিক দিয়ে তিনি মূলতঃ কথা শিল্পী হলেও প্রবন্ধ রচনার জন্য ও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর “বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান” প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৬৫ ইং সনে। বইটি তখন প্রকাশ করেছিলেন চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল। এটি একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে চট্টগ্রামের প্রায় সকল লেখকের সংক্ষিপ্ত সাহিত্য কর্ম এতে তুলে ধরা হয়েছে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটি ছিলো একটি পথিকৃৎ গ্রন্থ। সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও এতে বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের পরিচয় রয়েছে। সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রেকার্ডেল গ্রন্থ হিসাবে এর একটি গুরুত্ব রয়েছে। বহু বছর বইটি বাজারে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ কোঃ বুঃ সোঃ লিঃ এর পক্ষে এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠকদের সামনে আবার পেশ করার জন্য আমরা এর পুনর্মুদ্রনের ব্যবস্থা করে। আশা করি এ বইটি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বাংলা ভাষার ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা সমাদৃত হবে। এবং সাহিত্য গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা মিটাতে কিছুটা সহায়ক হবে।

এন, এম হাবীব উল্লাহ

ভারপ্রাপ্ত পরিচালক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ।

লেখকের কথা

বইটি সাবেক চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত হয় খৃষ্টাব্দ ১৯৬৫ সালে। আমি চট্টগ্রাম থেকে চলে আসার পর বইটি মুদ্রিত হয়েছিল বিভ্রমের কি ব্যবস্থা হয়েছিলো আমি জানি না। গ্রন্থকার হিসাবে আমাকে মাত্র একটি কপি দেয়া হয়েছিলো। সেই কপিটিও সম্ভবত অন্য কেউ নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি আর ফেরত দেননি। এর পরে শত চেষ্টা করেও আমি আর সেটি সংগ্রহ করতে পারিনি। আমার ইচ্ছা ছিলো বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ আমি আগা-গোড়া দেখে এর প্রযোজনীয় সংশোধন ও সম্প্রসারণ করবো। কিন্তু বইয়ের মূল কপি হাতে না থাকায় তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। তিরিশ বছরেরও আমি অধিক কাল পরে বইটি আবার পুন মুদ্রিত হতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার অতৃপ্তি রয়ে গেলো। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রকাশনা পরিচালক প্রফেসর এন, এম হাবিবুল্লাহ এবং চেয়ারম্যান জনাব আ, জ, ম, শামসুল আলমের উদ্যোগেই তা সম্ভব হয়েছে। কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পরম করুণাময় আল্লাহ তৌফিক দিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণটি পূর্ণতর কলেবরে প্রকাশের জন্য এরা দা রাখি। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে স্নেহ ভাজন মাহুম খানের আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম প্রশংসার দাবী রাখে।

অধ্যাপক শাহেদ আলী।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

“বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান” প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৬৫ সনে। চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের তদানীন্তন সেক্রেটারী ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, আমাদের সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর স্বাপ্নিক জনাব সালাহ উদ্দিন আহমদ নিজে উদ্যোগী হয়ে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত কথাসিদ্ধী জনার শাহেদআলী তখন চট্টগ্রামে অধ্যাপনা করছিলেন। তিনি নিজে চট্টগ্রামের লোক না হয়েও জনাব সালাহ উদ্দিন আহমদ ও চট্টগ্রাম সিটি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব এ, এ রেজাউল করিম চৌধুরীর অনুরোধে গ্রন্থটি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর ভূমিকা স্বরূপ চট্টগ্রামের মনীষী জনাব ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক একটি “সংক্ষিপ্ত চট্টল পরিচিতি” লিখে দেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় দীর্ঘদিন হলো এই মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থটি বাজারে নেই। বাংলা ভাষার ছাত্র- ছাত্রীদের জন্যতো বটেই, আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্যও এটি একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের উপর এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। কোন কোন জেলায় এই প্রকল্পের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণের জন্য এই পুস্তক গুলো মূল্যবান বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ “বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান” পুনর্মুদ্রনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বহু বছর পর বইটি আবার পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দ বোধ করছি এবং আন্তাহ তা’আলার কাছে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি।

এ, জেড, এম শামসুল আলম

চেয়ারম্যান

বাঃ কোঃ বুঃ সোসাইটি লিঃ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল চট্টগ্রামের সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে ইতিহাস লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেন। এ ব্যাপারে আমার কিছুটা দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম নৈশ কলেজের অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরীর বিশেষ উৎসাহ ও অনুরোধে আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করি। জেলা কাউন্সিলের তৎকালীন সেক্রেটারী ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ, সি-এস-পি'র উদ্যোগে ও প্রেরণায়ই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়।

পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার আগে চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের চেম্বার চট্টগ্রাম লোকসাহিত্যের অনেক মাল-মশলা সংগৃহীত হয়। লোক সাহিত্যের বিচারে সে গুলোতে অনেক মূল্যবান উপাদান থাকলেও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্যে ওগুলো অপরিহার্য নয়। তাই চট্টগ্রামী সাহিত্যের একটা ইতিহাস দাঁড় করানোর জন্যে আমাকে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালাতে হয়। জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ চট্টগ্রাম ত্যাগ করার পর জনাব জাকি আজম, সি-এসপি, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আমার পরামর্শমতো জনাব জাকি আজম চট্টগ্রামের প্রতিটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের নিকট প্রতিটি ইউনিয়নের জীবিত ও মৃত প্রতিটি কবি-সাহিত্যিকের নাম-খাম ঠিকানা এবং পাভালপি ও পুঁথি-পুস্তকের খবর আমাকে জানানোর জন্যে একটি নির্দেশনামা পাঠান। এ ব্যাপারে তাঁদের কাছ থেকে কোন মূল্যবান তথ্য না পাওয়া গেলেও অনেকেই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন এবং কেউ কেউ কিছু খবরও দিয়েছিলেন। এই সহযোগিতার জন্যে তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

যে এলাকার নির্ভরযোগ্য কোন রাজনৈতিক ইতিহাসই আজো রচিত হয়নি সেই এলাকার সাহিত্যের ইতিহাস রচনা যে কী কঠিন কাজ তা অনেকের পক্ষে আন্দাজ করাও কঠিন। সুখের বিষয়, চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান মরহুম মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ জীবনব্যাপী সাধনায় যেসব পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলোর সাহায্যে চট্টগ্রামের সাহিত্যের একটা কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব। এসব পুঁথি-পুস্তকের যে সামান্য পরিচয় সাহিত্য-বিশারদের পুঁথিপরিচিতি ও প্রবন্ধাবলীতে পাওয়া যায় সেগুলোকে ভিত্তি করেই আমি আমার অনুসন্ধানকার্য চালাই এবং অজস্র পুঁথি-পুস্তক এবং সাময়িক পত্র পাঠ করি, বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সংগে আলোচনা ও পরামর্শ করি—তারই ফল এই ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমদ শরীফ আমার চিঠি পাওয়ার পরই এ ব্যাপারে আমি কোথায় কি সাহায্য পেতে পারি তা আমাকে লিখে পাঠান।

‘মাহেনও’ সম্পাদক জনাব আবদুল কাদের, অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার সৈয়দ মুর্তাজা আলী এবং কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কাছ থেকে কোন কোন ব্যাপারে আমি পরামর্শ নিয়েছি। জনাব এনামুল হকের বইগুলো থেকেও সাহায্য পেয়েছি প্রচুর। তা ছাড়া ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, চট্টগ্রাম নৈশ কলেজের অধ্যাপক আহমদ হোসেন, কথালিঙ্গী ও সাংবাদিক সৈয়দ শাহাদাত হোসেন আমাকে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই-পুস্তক দিয়ে অকুষ্ঠ সাহায্য করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান সুলেখক আবুয্যোহা নূর আহমদ, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী থেকে আমি যখন যে বই চেয়েছি আমাকে তা বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করতে দিয়ে রাখিত করেছেন। এ ব্যাপারে আমি ঢাকা যাদুঘর লাইব্রেরী এবং পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষিত অনেক দূশ্রাপ্য প্রাচীন পত্র-পত্রিকা এবং মূল্যবান পুস্তকও ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছি। এঁদের সকলের কাছেই আমি কম-বেশী ঋণী।

পাভুলিপি কপি করার ব্যাপারে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রী সুলেখিকা কল্যাণীয়া সুরাইয়া বেগম স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে যে শ্রম স্বীকার করেছে তা কখনো ভুলবার নয়।

চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের বর্তমান সেক্রেটারী জনাব, এস, আর খান ইতিহাস লেখার কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্যে আমাকে একাধারে তাগিদ দিয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন। এজন্যে তিনি ধন্যবাদার্থ।

চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল, চট্টগ্রাম সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে আমাদের আজো অলিখিত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াসে পথিকৃতের যে ভূমিকা নিয়েছেন, পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য জেলা কাউন্সিলগুলি তা অনুসরণ করলে আমাদের সেই ইতিহাসের মাল-মশলার জন্যে সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লেখককে অন্ধকারে হাতড়াতে হবেনা বলে আমার বিশ্বাস। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রত্যেকটি জেলা যদি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যাদের জন্যে চট্টগ্রামের সাহিত্যের এ ইতিহাস লেখা চট্টগ্রামের সেই ভঙ্গুণ সমাজের মনে যদি এই ইতিহাস তাদের নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সামান্য গর্ব ও গৌরববোধ জাগাতেও সক্ষম হয় তবেই আমার এ পরিশ্রম সার্থক বলে গণ্য হবে।

আগষ্ট,

তারিখ ১৯৬৫

শাহেদ আলী

মুখবন্ধ

সাগরপারের এ চট্টগ্রামের অবস্থান যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনই তার ভাষাটিও বৈশিষ্ট্যময়। চট্টগ্রাম সাহিত্যক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিভায় প্রোঞ্জল। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী, চট্টগ্রামের নাবিক, চট্টগ্রামের কৃষক উদ্বেল প্রাণের চঞ্চলতায় কঠোরতম জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রেরণায় উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে বর্মা আর দূর প্রাচ্যে উপনীত হবার পর চট্টগ্রামের সাহিত্য এক নব রূপ লাভ করে। মগ-হিন্দু-মোগল-পাঠান-দিনেমার-পর্তুগীজ-ইংরেজ, এই জাতি সমূহের ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত কেন্দ্র, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ধর্মের সংযোগস্থল, আওলিয়া পীর-বুজুর্গদের সাধনার পীঠস্থান, অপক্লম, প্রাকৃতিক-লৌকিকের মীলা কেন্দ্র চট্টগ্রাম স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ, ঐতিহ্যে মহীয়ান, বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান।

পণ্ডিতব্যক্তিগণ ভাষার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণে বিভ্রান্ত। সুষ্ঠু সংজ্ঞাদানে কঠিন বলেই তাঁরা মনে করেন। বাঙলা ভাষাকে মনীষীগণ দেশজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। বহুভাষা দেশজ ভাষাই দেশের সাহিত্য এবং সেই হিসাবে চট্টগ্রামী ভাষাকেও বাঙলা সাহিত্য বলা চলে। বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে চট্টগ্রামের ভাষার বিশেষ অবদান অনস্বীকার্য। প্রকৃতির আদুরে পরিবেশে ধর্মের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম যেমন সুফী মতবাদ লালন করে চলেছে, তেমনই আন্তর্জাতিক সংযোগ, ঘটনার সংঘাত, চট্টগ্রামের ভাষায়, সাহিত্যে, যে রোমাঞ্চ, যে প্রেমের অবতারণা করেছে তা বৈশিষ্ট্যময়।

রাষ্ট্র-ঘাট তৈরী করা, তার সংরক্ষণ আর সংস্কারের মধ্যে একটি দেশ বা জাতির পূর্ণ রূপায়ন হয় না। বাহ্যিক সৌষ্ঠবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্য, শিল্প, কলা, কৃষ্টি আর সংস্কৃতি স্বকীয়তা বজায় রেখে যখন উৎকর্ষ লাভ করে তখনই তাকে উন্নতি বলা যেতে পারে। স্বকীয়তা ও স্বাভাবিক রক্ষা করে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টায় আজ সর্বত্র লোকগীতি, পল্লীগীতা, কথ্যভাষা—সব কিছুকে বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতির দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে।

“বাঙলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান”—কেন এর প্রকাশনা এই প্রশ্নের উত্তরে তাই বলা যায়ঃ বৈশিষ্ট্যময়, ঐতিহ্য সমৃদ্ধ কিন্তু অবহেলিত একটি অঙ্গকে শুধী সমাজের সামনে পেশ করে তার বিকাশের পথকে সুগম করা—চট্টগ্রাম জিলা কাউন্সিল নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করে। জিলা কাউন্সিল দেশের সাহিত্য, কলা ও কৃষ্টির ধারক ও বটে।

চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের এটা প্রথম প্রচেষ্টা। তাড়াহড়োর মধ্যে বিরাট একটি কাজ শেষ করার যেসব গলদ থাকে, তা হয়ত এ বইয়েও দেখা যাবে। খুবই তথ্যময়, স্বয়ংসম্পূর্ণ বই প্রকাশ করার অহমিকা জিলা কাউন্সিলের নেই। প্রথম সংস্করণের ক্রটি বিচ্যুতি এই বইএর পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবার ইচ্ছা জিলা কাউন্সিলের রয়েছে। তাড়াহাড়িতে যে বই প্রকাশ পেল, আশা করি তার ক্রটি-বিচ্যুতি সকলেই ক্ষমার চোখে দেখবেন।

কাজী জালালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জিলা কাউন্সিল, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব, দুর্লভ প্রাচীন পুঁথির সংগ্রাহক ও সম্পাদক, চট্টগ্রামের
সু-সম্ভান মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের অমর স্মৃতির উদ্দেশে--

সূচীপত্র

▼ প্রথম অধ্যায় :	
বাংলার ইতিহাসে চট্টগ্রাম	১৯
▼ দ্বিতীয় অধ্যায় :	
ভাষা ও সংস্কৃতি : বৌদ্ধ-হিন্দু আমল	২৩
ভাষার মুক্তি : মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতা	২৪
▼ তৃতীয় অধ্যায় :	
মুসলিম চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি	২৬
▼ চতুর্থ অধ্যায় :	
মুসলিম আমলের কবি ও কাব্য পরিচয় (১)	২৮
পঞ্চদশ শতক	
(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর	২৮
(খ) মুজাম্মিল	৩০
▼ পঞ্চম অধ্যায় :	
কাব্য পরিচয় (২)	৩৩
ষোড়শ শতক	
(ক) আফজল আলী	৩৩
(খ) সাবিরিদ খান	৩৬
(গ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর : মহাভারতের অনুবাদ	৪১
(ঘ) শ্রীকরণ নন্দী	৪৫
(ঙ) দৌলত উজীর বাহরাম খান	৪৬
(চ) হাজী মোহম্মদ	৪৯
(ছ) মুহম্মদ কবীর	৫১
(জ) শ্রীধর	৫৫
(ঝ) সৈয়দ সুলতান	৫৬
(ঞ) শেখ পরান	৬২
ষষ্ঠ অধ্যায় :	৬৪
মুসলিম আমলের কবি ও কাব্য পরিচয় (৩)	৬৪
(ক) মোহাম্মদ নসরুল্লাহ খাঁ	৬৪
(খ) মুহম্মদ খান	৬৬
(গ) নওয়াজিশ খাঁ	৭৪
(ঘ) কমর আলী	৭৮

(ঙ) আব্দুল নবী	৭৯
(চ) মুহম্মদ নকী	৮১
(ছ) শমশের আলী	৮৩
(জ) মুজাফ্ফার	৮৪
(ঝ) শরীফ শাহ	৮৫
(ঞ) রতিদেব	৮৭
(ট) দ্বিজ রামদেব	৮৮
▼ সপ্তম অধ্যায় :	৯০
আরাকানের রাজদরবারে চট্টগ্রামের কবি	৯০
(ক) দৌলত কাজি	৯১
(খ) মরদন	৯৯
(গ) কোরেশী মাগন ঠাকুর (১৬)	১০০
(ঘ) আলাওল	১০৩
(ঙ) সপ্তদশ শতকের আরও কতিপয় কবি	১০৮
▼ অষ্টম অধ্যায় :	১১৩
অষ্টাদশ শতকের কতিপয় কবি	১১৩
(ক) শেখ মনসুর	১১৩
(খ) মুহম্মদ মুকীম	১১৭
(গ) শেখ সেররাজ চৌধুরী	১১৯
(ঘ) রামজীবন বিদ্যাবূষণ	১২০
(ঙ) ভবানী শঙ্কর দাস	১২২
(চ) মুহম্মদ রজা	১২৩
(ছ) আলী রজা	১২৪
(জ) মুহম্মদ আলী	১২৫
(ঝ) হৈয়দ নুরুদ্দিন	১২৭
(ঞ) মুহম্মদ উজির আলী	১২৯
(ট) দ্বিজ রাধাকান্ত	১৩০
(ঠ) নিধিরাম আচার্য	১৩১
(ড) মুক্তারাম সেন	১৩২
(ঢ) বদীউল (কাজী)	১৩৪
(ন) বালক ফকির	১৩৫
(ত) মুহম্মদ দানীশ	১৩৬
(থ) শেখ তনু	১৩৭
(দ) অষ্টাদশ শতকের আরো কতিপয় কবি	১৩৭

▼ নবম অধ্যায় :	
গীতি কবিতা	১৩৯
(ষোড়শ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক)	
▼ দশম অধ্যায়	১৪৫
ইংরেজ আমল ও মুসলমান	১৪৫
(সাধারণ আলোচনা)	
▼ একাদশ অধ্যায় : ইংরেজ আমলের কবি ও কাব্য পরিচিতি	১৪৯
(ক) কবি চুহর	১৪৯
(খ) হাজীদুল্লাহ্ খান	১৫১
(গ) হাসমত আলী চৌধুরী	১৫৪
(ঘ) সৈয়দ নাসির উদ্দিন	১৫৫
(ঙ) মোশারফ আলী	১৫৭
(চ) উজির আলী মুঙ্গী	১৫৭
(ছ) হায়দর আহমদ	১৫৮
(জ) আসাদ আলী চৌধুরী	১৫৯
(ঝ) সলিম উদ্দিন	১৫৯
(ঞ) ওয়াজি উদ্দীন চৌধুরী	১৬০
(ট) তমিজী	১৬২
(ঠ) হাজী আলী	১৬৩
(ড) কবি ফকির আসকর আলী	১৬৪
(ঢ) লোকমান আলী	১৬৪
(ন) নীল কমল দাস	১৬৫
(ত) শঙ্করভট্ট ও সদানন্দ ভট্ট	১৬৬
(থ) রঞ্জিত রাম দাস	১৬৭
(দ) রামতনু আচার্য	১৬৭
(ধ) রামলোচন দাস	১৬৮
(নে) ভৈরব আইচ	১৬৯
(প) কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ মজুমদার	১৭০
প্রাচীন ধারার গীতি কবি	১৭০
▼ দ্বাদশ অধ্যায়	১৭২
আধুনিক ধারা	১৭২
নবীন চন্দ্র সেন	১৭২
নবীন চন্দ্র দাস	১৭৪
শশাঙ্ক মোহন সেন	১৭৫
আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ	১৭৫

মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী	১৭৭
নজীর আহম্মদ চৌধুরী	১৭৮
আবুল মা আলী মুহম্মদ হামিদ আলী	১৭৯
মাহবুব উল আলম	১৮০
দিদারুল আলম	১৮০
আবুল ফজল	১৮০
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	১৮১
বুলবুল চৌধুরী	১৮১
ওহীদুল আলম	১৮১
আবুল কাসেম	১৮২
ফেরদৌস খান	১৮২
আবদুর রহমান	১৮২
আহমদ শরীফ	১৮২
আব্দুল হক চৌধুরী	১৮২
সফিনাজ্জ নুরন্না নাহার	১৮২
সুচরিত চৌধুরী	১৮৩
সুলতানা রহমান	১৮৩
এন, এম, হাবিব উল্লাহ	১৮৩
হাল আমলের আরো কতিপয় লেখক-লেখিকা	১৮৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	১৮৪
চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য	১৮৪
পালাগান পরিচয়	১৮৪
ভেলুয়া	১৮৪
ভেলুয়ার পালার পটভূমিকা	১৮৫
কাহিনী	১৮৫
চরিত্র সৃষ্টি	১৮৭
হাদী খেদা	১৮৭
কমল সদাগর	১৮৯
কাফন চোরা	১৯০
নসর মালুম	১৯২
নুরুন্নেহা ও কবরের কথা	১৯৫
কাহিনী	১৯৬
সুজা তনয়ার বিলাপ	১৯৮
পরীবানুর হাঅলা	২০০
লোক সাহিত্যের আরো কয়েকটি দিক	২০২
গ্রন্থ পঞ্জী	২০৬

সংক্ষিপ্ত চট্টল পরিচিতি

— ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক,
এম-এ, পি এইচ-ডি, এস-আই।

চট্টলা (প্রাচীন—চাটিল>চট্টল>চট্টলা) আমার জন্মভূমি। এখানে জন্মেছি বলে আমি গৌরব বোধ করে থাকি। এ দেশ আর কাকে কতখানি ভুলিয়ে রাখা, জানিনি। আমার প্রতি এর যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে, তা ভাল করেই বুঝতে পারি। আমি এ টানটুকুন জীবনে কখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

চট্টলার প্রতি আমার যে মমতা, তা চিরকালে। সেই হৃদয়ের অঙ্কনটুকুনই সূর্যার মতো চোখে মেখে আমি চট্টলার প্রতি অবাক-বিস্ময়ে তাকাই, আর চট্টলাও আমার প্রতি স্নেহের আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়েই চেয়ে থাকে। তাই, আমাদের কারণে ও দৃষ্টি চোখের নয়,— হৃদয়ের। চোখের দেখা যে দেখাই নয়,—এতে ভৃষ্টি নেই। তাই হৃদয় দিয়েই চট্টলাকে দেখে থাকি। সে যে আমার সামনে খুলে দেয় তার হৃদয়ের অর্গলবদ্ধ গোপন দুয়ার, না চাইতেই বিছিয়ে দেয় তার মনের মণিকোঠা রক্ষিত নকসী-কাঁথা, আর অকৃপণ হ'য়ে ডুলে ধরে তার অন্তরের অন্তরঙ্গ পরিচয়।

মোট কথা, চট্টলার পরিচয় তার হৃদয়ে এবং হৃদয় দিয়েই তাকে বুঝতে হবে। তার সংস্কৃতি হচ্ছে তার আপন সত্বার মন্বন্তর-বিকাশ; আর তার সাহিত্য এ মন্বন্তর-বিকাশেরই একটা তন্ময়রূপ মাত্র। তাইতে, চট্টলা সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হলে, তার সাহিত্যের রূপ ও রস বোঝা সহজ নয়। আমার হৃদয় চট্টলা সাংস্কৃতিক-রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে, আমার প্রাণে চট্টলার স্রষ্টিক্ত বেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ লেখায় তারই একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এঁকে দিচ্ছি এ শ্রমসার যে, আলোচ্য গ্রন্থে অঙ্কিত চট্টলা-সাহিত্য-চিত্র এতে যথকিঞ্চিত স্পষ্টতরো হবে।

শৈল-কিরীটিনী, নদী-মালিনী, বনানী-কুম্ভলা চট্টলা, প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া দুলালী কন্যা। সে যেন এক শবরী বাগিকা,—অধিত্যকায় হরিণ চরায়, উপত্যকায় হাতী পোষে, পর্বত-গাড়ে 'জুম' বুনে, 'চৈবার' আর্শিতে মুখ দেখে, গহণ অনন্যে মহাভয়াল 'গয়াল' পালে, আর পুষ্পিত তরুর ডালে ডালে লতার দোলায় দোল খায়।

আবার সে যখন ঝঞ্ঝা বাতায় কুঞ্চেয়া দাঁড়ায়, 'গর্কী' বন্যায় গোসল করে, দাবাগ্নির লেলিহান শিখায় আঙন পোহায়, 'ঠাডার'-বজ্রে বুক পেতে দেয়, আর দ্বিগন্ত-বিদারী বিদূৎ-ঝলায় ঝলমল করে, তখন তার সে কি রুদ্র মূর্তি!

পুনরায়, সে যখন অতি সন্তর্পণে সমতল ভূমিতে নেমে এসে মাঠে-মাঠে সোনা ছড়ায়, গলায় গলায় গান জাগায়, ঘাটে-ঘাটে শহর, বন্দর ও পুখে পুখে হাট বাজারে ভিড় জমায়, তখন তার সে কি ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি! যে কখনও তা দেখেনি, সে কি করে উপলব্ধি করবে, এই যে চট্টলা, সে কি স্বপ্নপুরী!

যখনই চট্টলার কথা চিন্তা করি, মনে হয়, কি বিচিত্র এই দেশ! এ যে, “বজ্জাদপি কঠোরানি, যুদনি কুসুমাদপি,”—বজ্জের চাইতেও কঠোর, কুসুমের চাইতেও মৃদু। এর বৃকে জ্বলছে সৃষ্টির অনির্বাক্ত অগ্নিশিখা, মুখে উচ্চারিত হচ্ছে নব-নবীনের বাণী, চক্ষু স্কুরিত হচ্ছে প্রজ্ঞার বিদ্যুদ্দীপ্তি। মহাসমুদ্রের মহা আহবানে সানন্দে সাড়া দিয়ে সে যেমন বর্ষিবিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠ মিতালি পাতাচ্ছে, অত্রভেদী পর্বতের ধ্যান গাঞ্জীর্বে অনন্তের সাথেও সে তেমনই ঘটচ্ছে নিবিড় পরিচয়। চট্টলা যেন কোমলে-কঠোরে, শান্তিতে-সংগ্রামে, সৃষ্টিতে-ধ্বংসে খোদার এক অপূর্ব কীর্তি।

এখানে যে যখন এসেছে, পরম আদরে স্থান পেয়েছে; অহম ব্রহ্মের পার্বত্য পথে এসেছে আদম অনার্য অধিবাসী জুমিয়া-চাকমা, কুকী-তিপুরা ও মুকং। তারা শুধু বনের মাঝখানে ‘টং’ বেঁধে ‘জুমের’ রং দেখে না, বাঘ ভালুকের সাথে যুদ্ধ করে বাজুর কুঅওৎ পরখ করে। এমন কি বনের অজগরের টুটি টিপে মেরে তার মাংস উৎসব করে খায়। আজও তারা মহামুনিতে মেলা বসিয়ে পুণ্য ও পত্নী,—দুইই লাভ করে।

আর্য হিন্দু এলেন সীতা দেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সীতাকুন্ডের উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করতে। তারা দেখলেন, সিদ্ধুর শীতল-বন্ধ-প্রদাহী বাড়বাগ্নিকে বাড়বকুণ্ডে বেঁধে রেখে চট্টলা সিদ্ধু বৃকের জ্বালা মিটিয়েছে। তাই, আজও সিদ্ধু চট্টলার রাঙা পা দু’খানি ধুইয়ে দিচ্ছে ব’লে সে শুধু সিদ্ধুবন্দিতা নয়,—হিন্দু-সম্পূজিতাও বটে।

ভারতের বৃকে শঙ্করাচার্যের প্রচারে বৌদ্ধ জাতি যখন নিচ্ছিন্ন হল, চট্টলাই তখন তাকে মায়ের মত বৃক পেতে নিল। তাই, ভারতের বৌদ্ধ-ধর্মের একটি শেষ আশ্রয় হ’ল চট্টলা। চক্রশালা ও চন্দ্রনাথে বৃক পদ-চিহ্ন স্থাপিত হ’ল; তার সাথে মগধের ‘মগধেশ্বরী’ ও চট্টলায় এসে বাসা বাঁধলেন।

আরবের ধূসর-বৃকের উষর-মরু ছেড়ে মুসলিম-আরব যখন বিশ্বস্তার বিচিত্র সৃষ্টির সন্ধানে দিকে দিকে ছুটে চলল, চট্টলা তখন তাঁদেরকে চোখ ইসারায় দরদীর মতো ডাক দিল। তারা শোলকবহরে এসে ‘সুলুকু-ল-বহর’ বা সমুদ্র-পথ ভুলে গেলেন, ‘বাল্যার’ পলল ভূমিতে ‘বাবুদ্রা’ বা সবজী বাগান রচনা করলেন, ‘আলকরনে’ ঘর বেঁধে গভারের সিঙের কারবার ফাঁদলেন, আর শুদিরপারে সমুগ্রগামী ‘গদীরা’, বা জাহাজ তৈরির কারখানা খুললেন।

খ্রীষ্টানেরা এলেন পর্ভুগীজ নামে হজরৎ ঈসার বাণী নিয়ে ইউরোপ থেকে; আর আশ্বপ্রকাশ করলেন ‘হার্মদ’ বা জ্বলদসূর্য্যপে। তবু, চট্টলা তাঁদেরকে ঘরের ‘জানালা’ খুলে দেখলে, বারাভায় ‘মৈজ’ পেতে ‘কোদারায়’ বসতে দিলে, আলমারি থেকে ‘পেপে’ ‘পেয়ারা’ সফেটা, ‘আনারস’ প্রভৃতি ফল বা’র করে পিরিচে ‘পাউরুটির’ সাথে খেতে দিয়ে অতিথি সৎকার করলে। ওঁরাও চট্টল ভূমে স্থায়ী হলেন।

সত্যই চট্টগ্রাম হরের রকম মানুষের আবাসভূমি। এরা সবাই মিলে চট্টগ্রামকে করেছে এক আন্তর্জাতিক অঞ্চল। এখানে মন্দিরে-মসজিদে, ক্যাম্পাঙে-গীর্জায়, দরগা-আখড়ায়, আশ্রম-খানুকায়ে বিবাদ নেই। এখানকার সাধু-সন্ত, পীর-ককীর, মোস্তা-মৌলবী, রাউলী-পাত্রী সমভাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। পূর্ব পাকিস্তানের আর কোথাও তো এমনটি দেখিনি।

ওধু চট্টগ্রামের নয়,-পৃথিবীর যে কোন দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়ার সাথে সেখানকার অধিবাসীর জীবন-বিকাশের সহজ অতি গভীর। চট্টগ্রামবাসীর জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানকার আবহাওয়ার কলেই এঁরা যেমন পরিশ্রমী, তেজস্বী, সংসাহসী ও স্পষ্টবাদী, তেমনি উদারহৃদয়, ধর্মপরায়ণ, সরলপ্রাণ ও অতিথিবৎসল। বৃষ্টি-বাদল আগ্রহ্য করে এঁরা মাঠে মাঠে সোনা ফলায়, হাঙর কুমীরের সাথে সংগ্রাম করে অসীম সমুদ্রের অধে-জলে পাড়ি জমায়, ঝড়-ভুকান উপেক্ষা করে অনন্ত-আকাশের নীলিমায় নিখোঁজ হয়।

স্বীকার করি, চট্টগ্রামবাসী নিয়েছেন বহু, দিয়েছেনও অনেক। কিন্তু, তাঁরা যা নিয়েছেন তা যেমন সবার আগে, তাঁরা দিয়েছেন, তাও সবার আগে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথাই ধরা যাক না। শধু পূর্ব-পাকিস্তান নয়,—সমগ্র বাংলায় যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঠাই ছিল না, তখন চট্টগ্রামের দুই বীর সন্তান—কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও সৈয়দ সুলতান, বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ‘পরাগলী মহাভারত’ ও ‘নবী-বংশ’, রচনা করে বাংলা ভাষীর মুখে কুটালেন অক্ষর-ভাষা এবং বুকে জাগালেন অনন্ত-আশা। অতঃপর, ধীরে ধীরে বাংলায় রচিত হ’ল মনসা, চন্ডী ও ধর্ম মঙ্গল, লাইলী মজনু, ইউসুক জুলেখা ও মকতুল হোসেন। বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা হ’ল, বাংলা সাহিত্যের জয় হ’ল।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টলাই ছিল অগ্রণী। যতীন্দ্রমোহন সেন, কাজেম আলী ও ইসলামাবাদীই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

অধিকন্তু, চট্টলা পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুকে দিয়েছে সীতাকুন্ড, বাড়ব কুন্ড ও আদিনাথের পূন্য তীর্থ; বৌদ্ধকে দিয়েছে মহামুনি ও চক্রশালার পবিত্র চৈত্র্য; মুসলমানকে দিয়েছে, বদর ঔলিয়ার বদরপাতি, বারোজিদ বোস্তামির দরগাহ, শেখ ফরীদেদর চশমা ও হজরৎ মুহম্মদের কদম মোবারক আর খ্রীষ্টানকে দিয়েছে গীর্জায় গীর্জায় ভজনালয়। এমন কি, জরায়ো-প্রসূ আধুনিক মানুষকে দিয়েছে কাঙাই ও কব্রকাজারের স্বাস্থ্য-নিবাস। তাঁদের জন্য বন্দর, পোতাশ্রয়, কলকারখানাও প’ড়ে উঠেছে; বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হ’য়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব পাকিস্তানে চট্টলা এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির অধিকারিনী। এ সংস্কৃতির মেজাজ বিচিত্র, প্রকৃতি উদার ও চরিত্র প্রগতিশীল। দেখতে পাই, এখানকার সাহিত্যে চট্টলার এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কুমদকহুরের মতই ফুটে আছে। দেখবার চোখ ও বুঝবার মন যাঁর আছে, তাঁর কাছে এ সত্য গোপন থাকার কথা নয়।

“বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান” নামক এই গ্রন্থটিতে গোপ্পদে আকাশ বিস্তৃত হওয়ার মতো এ সত্যের যে একটা আভাস, একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, সে বিশ্বাস আমার আছে। অতএব, এ গ্রন্থের প্রণেতা অধ্যাপক শাহেদ আলী সাহেবের এবং যাঁরা (অর্থাৎ চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল) এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন, তাঁদের এ মহতী প্রচেষ্টার জন্য আমি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি—

প্রথম অধ্যায়

বাংলার ইতিহাসে চট্টগ্রাম

ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্রের দিক দিয়ে চট্টগ্রাম বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রত্যন্তবর্তী এ জেলাটির আয়তন—আড়াই হাজার বর্গমাইলেরও কিছু উপরে; সম্প্রতি (১৯৫৪) সন্দীপ চট্টগ্রামের সাথে যুক্ত হওয়ায় এ জেলার আয়তন আরো বেড়েছে। চট্টগ্রামের উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাক্ নদী, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। ফেনী নদী চট্টগ্রামকে নোয়াখালী থেকে এবং নাক্ নদী এ জেলাকে ব্রহ্মদেশ থেকে আলাদা করেছে। মানচিত্রের দিকে তাকালে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক—এলাকাটি যেন বাংলাদেশ থেকে স্বতন্ত্র একটি এলাকা। আসলেও এ এলাকাটির অধিকার নিয়ে প্রথমে তিপুরা ও আরাকানীদের মধ্যে, পরে তিপুরা, আরাকানী ও মুসলমানদের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চলে; এবং মাত্র ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এ এলাকাটি মুঘল শক্তির সহায়তায় স্থায়ীভাবে বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

চট্টগ্রামে প্রথমে যারা বসতি স্থাপন করে তারা তিব্বতো-বার্মান ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক—এ অনুমান অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য। এর পর পুরাণের যুগে নাকি চট্টভট্ট নামে আরেকটি জাতি চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে; চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতিগুলো ছড়িয়ে পড়েছিলো দক্ষিণ দিকে। এ সময় আরাকান থেকে খউংতা বা কানুরান নামে আরেকটি জাতি উত্তর দিকে এগোতে থাকে। পাহাড়ী জাতিগুলোর মধ্যে তিপুরারাই ছিলো সবচেয়ে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী; তাই সহজেই তারা অন্যান্য পাহাড়ী জাতিগুলোর উপর জয়ী হয়। এই সুদীর্ঘকাল ধরে বর্তমান চট্টগ্রাম এলাকার নাম কি ছিলো তা জানবার উপায় নেই।

বলা হয়, মৌর্যরাই প্রথম (৩২৪ খৃঃ পূঃ অব্দ) বাঙলা দেশকে আর্ষাবর্তের সাথে সুদৃঢ়বন্ধনে যুক্ত করে, তবু গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়ের (৩২৪ খৃঃ অঃ) আগে তিপুরার উপর

আর্থাবর্তের সরাসরি আধিপত্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমুদ্রগুপ্ত সমভট ও কামরূপ জয় করেন এবং ত্রিপুরাকে কর দানে বাধ্য করেন। কাজেই, চট্টগ্রাম এলাকা তখন আর্থ প্রভাবে প্রভাবিত হয়, এ অনুমান করা যেতে পারে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শংকরাচার্যের শিষ্যেরা উড়িষ্যায় প্রবল হয়ে উঠলে বৌদ্ধদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু হয়। তখন পূর্বদেশে বালচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র তীরভূক্তি, বাঙলা এবং কামরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। বিমলের পুত্র গোপীচন্দ্রে রাজধানীর ছিলো চট্টগ্রামে।

আনুমানিক নবম-একাদশ শতকে আরাকানে রাজত্ব করতেন চন্দ্রবংশের রাজাগণ। চন্দ্রবংশের ষোলচন্দ্র সিংহ ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তিনি নিজ নামে চট্টগ্রামে পাথর ঘারা একটি জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন এবং তার গায়ে 'চৈন্তগৌং' যুক্ত করা অন্যান্য'—এই কথাগুলো খোদাই করে দেন!

নব শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধধর্ম চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ সময়ের বৌদ্ধ গ্রন্থে চট্টগ্রামকে 'রম্য-ভূমি' ও 'শান্তি বিহার' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে যে এলাকাটি চট্টগ্রাম নামে পরিচিত তা স্থায়ীভাবে মুসলিম দখলে আসার অনেক আগেই এক সঙ্গে আরব দেশের মুসলমানেরা বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। ৮ম ও ৯ম শতাব্দী থেকেই পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সাথে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকে। এই সময়ে পূর্ব ভারতের একমাত্র বন্দর চট্টগ্রাম অতি স্বাভাবিক ভাবেই আরবদের বিশ্রাম স্থান ও উপনিবেশে পরিণত হয়।

সুলায়মান (৮৫৩ খৃঃ জীবিত), আবু জায়দুল হাসান (সুলায়মানের সমসাময়িক), ইবনে খুরদবা (মৃঃ ৯১২ খৃঃ) আল মাসুদী (মৃঃ ৯৫৬ খৃঃ) ইবনে হাওকল (৯৭৬ খৃঃ জীবিত), আল-ইদরিসী (জন্ম একাদশ শতকের শেষার্ধ্বে) প্রভৃতি আরব পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, আরাকান থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগটি খৃষ্টীয় ৮ম শতক থেকে আরব বনিকদের কর্ম-তৎপরতায় মুখর হয়ে উঠে। এ সময় অনেক আরব বনিক চট্টগ্রামে কেউ স্থায়ী ভাবে, কেউবা অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রামে আরবী প্রভাব এতোটা প্রবল হয়ে ওঠে যে, এই সমতলে একটি ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয় বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। শাসন-কর্তার উপাধি ছিলো 'সুলতান'। সম্ভবত মেঘনা নদীর উত্তর

তীরবর্তী সমুদ্র উপকূলবর্তী ভূ-ভাগ এই আরব সুলতানের অধীনে ছিলো। রোসান্ন বা আরাকানের জাতীয় ইতিহাসে এই সুলতানের উল্লেখ রয়েছে। পূর্বোক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজা বোলচন্দ্র (সুলতানই গংচন্দ্র অ) ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে এই 'সুরতন'কেই (আরবী সুলতান শব্দের অপভ্রংশ) পরাজিত করে চট্টগ্রাম জয় করেন। বোলচন্দ্রের বিজয়ন্তরে খোদিত চেন্ডগৌং থেকেই আধুনিক চট্টগ্রাম জেলার নাম উদ্ভূত বলে অনেকের ধারণা। চট্টগ্রাম শহরের নিকট 'সুলুকবহর' নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। এই 'সুলুক বহর' 'আরবী সুলুকুল বহর' থেকেই গৃহীত; এর মানে সমুদ্রপথ। পূর্বভারতীয় দ্বীপগুলোর সাথে আরবদের যে সঙ্ঘ ছিলো তার ফলেই ভারতের পূর্বপ্রান্তবর্তী শেষ বিশ্রামস্থল চট্টগ্রাম 'সুলুকবহর' নামে পরিচিত হয়ে থাকবে। এই 'সুলুকবহরে' নাকি আরবদের জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিলো, এখানে আরবদের একটি পোতাশ্রয়ও ছিলো।

খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দী থেকেই মেঘনা নদীর পূর্বতীর থেকে আরম্ভ করে রোসান্নগদেশ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম বিস্তৃত হতে থাকে ও মুসলমান প্রভাব বর্ধিত হতে থাকে। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতার ভ্রমণ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিবরণ থেকে জানা যায়, তখন পর্যন্ত এ অঞ্চলে 'মূর' বা আরবদের প্রভাব দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১২০৩ খৃঃ অব্দে বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাঙলা দেশকে মুসলিম অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেন, অথচ তার বহু আগে থেকেই বাঙলার এই প্রত্যন্ত প্রদেশটিতে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকে। বাঙলা দেশে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, এই এলাকায় ইসলামের বিস্তৃতি ত্বরান্বিত হয়েছে এবং তা' খুবই স্বাভাবিক।

পূর্বেই বলা হয়েছে চন্দ্রবংশীয় বোলচন্দ্র সিংহ ৯৫৩ খৃঃ অব্দে সুলতানকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম জয় করেন। এরপর সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে প্রথমে তিপ্ৰা ও আরাকানীদের মধ্যে, পরে তিপ্ৰা, আরাকানী ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। সর্বশেষে এসে যোগ দেয় পর্তুগীজেরা। এই সময়ের মধ্যে নয়বার আরাকানীরা চট্টগ্রাম দখল করে। অমর মাণিক্য কর্তৃক ১৬২০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজয় হচ্ছে তিপ্ৰাদের সর্বশেষ বিজয়। এই সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম সাতবার আসে মুসলিম অধিকারে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের হাতে আরাকানীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে এবং চট্টগ্রাম স্থায়ীভাবে বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন আলমগীরের রাজত্বকাল; শারোতা

খাঁর পুত্র বুজর্গ উমেদ খাঁর নেতৃত্বে এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়। তিনি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী বিজয়ীর বেশে চট্টগ্রামের কিদ্বায় প্রবেশ করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আরাকানী, তিপুরা, আরব, মুঘল, পাঠান, তুর্কী ও পর্তুগীজের মধ্যে শধু যে সংগ্রামই চলেছে, তা নয়—বহু আরাকানী, তিপুরা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে, বহু মুঘল, পাঠান ও আরব ইসলামাবদকেই আপন ঘর করে নিয়েছে; এমন কি বহু পর্তুগীজও এদেশের বাসিন্দা হয়ে গেছে। এদের সকলের মিলিত রক্তই গড়ে উঠেছে চট্টগ্রামের জন-সমষ্টি। মুসলিম আমলের আগে মগধ ও গৌড়-তাড়িত বৌদ্ধগণ চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল, এ তো ঐতিহাসিক সত্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষা ও সংস্কৃতি: বৌদ্ধ-হিন্দু আমল

খৃষ্টীয় নবম শতকে মাগধী প্রাকৃতকে অবলম্বন করে বাঙলা ভাষার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়। তার আগে থেকেই সংস্কৃত ভাষার বাঙলার বিষম্বন্ধন ধর্মগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছেন। এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যেও গৌড়ীয় রীতি বলে একটি রচনা-শৈলী দাঁড়িয়ে গেছে।

আনুমানিক ৮০০-১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং তার পরেও বাঙলা ভাষা সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধর্মীয় সাহিত্যে ভাষা হিসেবে বাঙলা দেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ, —এ তিন রকমের ভাষা প্রচলিত ছিলো। সংস্কৃতই ধর্মীয় সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে। প্রাকৃতের চর্চাও বাঙলা দেশে হয়েছে, তার প্রমাণ চতুর্দশ শতাব্দীতে সংগৃহীত প্রাকৃত গৈকল। এ দেশের মহাবানী, বহুবানী বৌদ্ধরাও প্রাকৃত ও অপভ্রংশ মিশ্রিত সংস্কৃতে লিখতেন। এই ভাষাকে বলা হয় বৌদ্ধ সংস্কৃত।

বাঙলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলে যে চর্যাপদগুলোকে ধরা হয় তার রচনা কালও বৌদ্ধপাল যুগ। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বখ্তিয়ার খিলজী লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বংগ বিজয় করেন, তখন লক্ষণ সেনের দরবারে সংস্কৃত কবিদের আড্ডা ছিলো; বাঙলার চর্চা হতোনা। বাঙলা ছিলো জনসাধারণের ভাষা, যারা 'ইতর' বলে বিবেচিত হোতো ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক-গোষ্ঠীর কাছে। কাজেই যথার্থ বাঙলা রচনার নমুনা মুসলিম আমলের আগে মেলে না। চর্যাপদগুলো বাঙলা ভাষার রচিত কিনা এ ব্যাপারেও নানা মূনির নানা মত।

মৌর্যযুগ থেকে বাঙলা দেশে উত্তর ভারতীয়দের বসতি আরম্ভ হয়। সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরে জৈন, বৌদ্ধ ও (বৈষ্ণব) শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, এ সব ধর্মমত কত প্রসারিত। পাল ও সেন রাজারা সেই আর্থ সংস্কৃতির বিজয় সুদৃঢ় করেন। কিন্তু তথাপি বিজিত সাধারণ বাঙালী সমাজ এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার নিয়ম সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে উঠতে পারেনি; তারা তাদের আদিম তন্ত্র-মন্ত্র, যোগ-প্রক্রিয়া,

বৌদ্ধিক সেব-সেবী ছাড়েনি। তাই বাঙলা দেশ ব্রাহ্মণ্যবাদ অপেক্ষা মহাযানীতন্ত্রের ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। লৌকিক ভাষায় ধর্মপ্রচার এই সিদ্ধাচার্যদের কীর্তি, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নয়। এই বাঙলা রচনাই এদের বিদ্রোহের একটি প্রমাণ। সেন যুগে বৌদ্ধ জাতিগুলোর কোন মর্বাদ বা অধিকার ছিলোনা। উৎপীড়িত, নির্বাচিত বৌদ্ধেরা মুসলমানদের বিজয়ের পরে সহজেই মুসলমান হয়, “নিরঞ্জনের রুম্মা” ভারই ইংগিত বহন করে। যারা তারপরেও বৌদ্ধ ছিলো তারা নিত্যনন্দ ও গোস্থামীদের প্ররাসে নেড়া-নেড়ীরূপে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হয়।

ভাষার মুক্তি : মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতা

প্রাচীন ভারতীয় পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মতো বাঙলা ভাষা ব্রাহ্মণ্য সমাজের গভীর বাইরে জন ও প্রসার লাভ করে। মুসলিম আমলেই বাঙলা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলো প্রথম। “ইসলাম কোনো জাতির ধর্ম নয়,—প্রচারশীল ধর্ম; এ অন্যাকে জয় করে ক্ষান্ত হয় না; কোলে টেনে লয়।” মুক্তির পয়গাম নিয়ে প্রচারকেরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে; শাসকেরা প্রসারিত করলেন ভ্রাতৃত্বের হস্ত। ফলে নিপীড়িত বাঙলার জনমানব অতি সহজেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে হাঁক ছেড়ে বাঁচলো। বৌদ্ধ সম্প্রদায়তো সানন্দে বরণ করে নিলো এই সর্বগ্রাসী মতবাদকে। “শেখ গজেন্দর” ও “নিরঞ্জনের রুম্মা” এ ব্যাপারে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামের সরল বলিষ্ঠ তওহিদবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্য-দৃষ্টি ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট সাধারণ জনতার মুক্তির পয়গাম নিয়ে আসে। কলে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটে। দেবভাষা সংস্কৃতির জগদল পাখরের চাপ থেকে রেহাই পেলো মানুষ; সাধারণের মুখের ভাষাই ক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠলো।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর আগে বাঙলা সাহিত্যের সার্থক কোনো নজীর-ই মেলেনা। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকে রচিত বলে মনে করা যেতে পারে, অমন একছত্র বাংলা রচনারও সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে না বলে সুকুমার বাবু মুসলিম বিজয়কে দায়ী করেছেন। কিছু, সেন বংশ বা তাঁদের পূর্বে বহু শতকের মধ্যেও কেন একছত্র বাঙলা রচিত হলোনা, তার জবাব দেবে কে? এ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর উক্তি উল্লেখযোগ্য—

“ব্রাহ্মনগণ প্রধানতঃ ভাষা গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইহারা সর্বমুখে উপাধি দান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকরণের জন্য

ইহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গোড়েশ্বরগণের (সেনরাজদের) সভাতে সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও 'ললিত-মবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল-মলয় সমীরে'র ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইত। সেখানে তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল' প্রভৃতি ন্যায়ের কূট মীমাংসা হইত, এবং নৈষাদাধি কাব্যের অলংকার রহস্য ও দর্শনের সূক্ষ্ম গ্রহি মোচনের জন্য বুদ্ধিজীবীগণ সর্বদা তৎপর থাকিতেন। এই সমৃদ্ধ সভাগ্রহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? ব্রাহ্মানগণ ইহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি কারণে এই ভাষার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন? আমাদের বিশ্বাস,—মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই, বঙ্গ ভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।”

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম চতুর্থীর রাজনৈতিক ও

সাংস্কৃতিক পটভূমি

বাঙলা দেশের উপর দিল্লীর সুলতানদের আধিপত্য বরাবরই একটা অনিচ্চিত ব্যাপার ছিলো। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খল্জী বাঙলা জয় করেন। অবশ্যি সারা বাঙলা দেশ জয় করতে আরো শতাধিক বছর লাগে। দিল্লীর প্রভুত্ব অধীকারের ব্যাপারে বাঙলাকে অন্যতম অগ্রণী প্রদেশ বলা যেতে পারে। ইলতুতমিশ এবং বলবনকে বাঙলার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা পোহাতে হয়। বলতে গেলে বলবনের বংশধরদের অধীনে বাঙলা দেশ দিল্লীর প্রভুত্ব থেকে সম্পূর্ণ আজাদই ছিলো। গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সময় আবার দিল্লীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহকে পরাজিত করে বাঙলাকে তিনটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগে বিভক্ত করেন,—লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও। তখ্তে বসেই মুহম্মদ বিন তুঘলক কদর খানকে লখনৌতিতে, ইজুদ্দীন আজমুল মুলুককে সাতগাঁয় এবং গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহকে সোনার গাঁয় প্রতিষ্ঠিত করেন। (১৩৩০)। শীঘ্রই গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি নিহত হলে, বাহরাম খান সোনার গাঁয় একচ্ছত্র শাসক হন। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁরই অল্পবাহক ফখরুদ্দিন, 'ফখরুদ্দিন মুহম্মদ শাহ' নামে বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৪০ খৃঃ)। তিনি ত্রিপুরাকে পরাজিত করে নোয়াখালীর পথে অগ্রসর হয়ে আরাকানীদের নিকট থেকে চট্টগ্রাম দখল করে নেন। তিনি চট্টগ্রাম হতে গৌড় পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।

আরাকান রাজ মেহদি ১৩৫৩ খৃঃ অব্দে সম্ভবতঃ উত্তরে মাতামুড়ির তীর পর্যন্ত পুনরায় চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে নরমিখলা আরাকানের সিংহাসনে আরোহন করেন। এই সময় আভার রাজপুত্র আরাকান আক্রমণ করলে নরমিখলার রাজধানী 'লৌঙ-এত্' এর পতন হয় এবং নরমিখলা গৌড়ের সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় শামসুদ্দিন তখন গৌড়ের সুলতান (১৪০৬-১৪০৯)। নরমিখলা ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সুলতানদের আশ্রয়ে বাস করেন।

সুলতান জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৪-১৪৩১) সুলতানের সাহায্যে নরমিখলা আবার রোসাঙ্গ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। (১৪৩০)। স্বরাজ্য ফিরে পেলেও তিনি গৌড়ের করদ রাজ্যে পরিণত হলেন। জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা থেকে জানা যায়, তিনি চট্টগ্রামসহ সারা বাঙলা দেশের অধীশ্বর ছিলেন। নরমিখলায় সঙ্গে যে সব মুসলমান আরাকানে আসেন তাঁরা 'ত্রোহাঙ' নামক স্থানে 'সন্ধিকন' মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন।

নরমিখলা চার বছর গৌড়ের সুলতানের করদরাজরূপে রাজত্ব করেন। রোসাঙ্গ রাজ্য ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু এঁদের উপর মুসলিম প্রভাব এতো বেশী গভীরভাবে পড়ে ছিলো যে, এ সময় থেকে এঁরা এঁদের বৌদ্ধনামের সাথে একটা করে মুসলমানী নাম ব্যবহার করতে থাকেন এবং তাঁদের মুদ্রার এক পিঠে ফারসী অঙ্করে ইসলামী কলেমা ও মুসলমানী নাম লেখার নিয়ম চালু করেন।

নরমিখলার পরবর্তী রাজারা স্বাধীনতা অবলম্বন করলেন বটে, কিন্তু তাঁরাও এই প্রথা অব্যাহত রাখেন। নরমিখলার ভাই মেনখরী (১৪৩৪-১৪৫৯) স্বাধীনতা অবলম্বন করেও আলী খাঁ নামে নিজের পরিচয় দেন। 'মেন-খরী'র রাজত্বকাল থেকে আরম্ভ করে রোসাঙ্গ-রাজ্য নরপিদিগির (১৬৩৮-১৬৪৫) রাজত্বকাল পর্যন্ত দুশো বছরেরও অধিক কাল ধরে রোসাঙ্গ রাজ্যেরা মুদ্রায় মুসলমানী নাম ব্যবহার করতে থাকেন। এই দুশো বছর ধরে বাঙলার মুসলিম শক্তির সঙ্গে আরাকান রাজাদের সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিলোনা। অঞ্চল দেশে তারা মুসলমানী রীতি ও আদব-কায়দা অনুসরণ করেছেন; এর কারণ মুসলমানদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব, তাদের রাষ্ট্র ও শাসননীতির উৎকৃষ্টতা এবং তাদের সংস্কৃতির উদারতা। সপ্তদশ শতকের বাঙলা সাহিত্য থেকে জানা যায়, বাঙলার মুসলমান রাজ-শক্তির সাথে আরাকানের রাজশক্তির সম্পর্ক মোটেই সম্ভোষণক ছিল না। তবু মুসলমান জাতির প্রতি আরাকানের রাজাদের বিদেহ নেই, বরং তাঁরা ছিলেন মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাবান।

সৈন্য বিভাগের প্রধান কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট বিভাগের প্রধানদের পদ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিচ্চি ছিলেন। গৌড়ের মুসলমান শাসক, শাসন-ব্যবস্থা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড় পরিচয়ের ফলে বৌদ্ধ আরাকানে পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। পঞ্চদশ শতক থেকে রোসাঙ্গ রাজসভায় মুসলিম প্রভাব প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী কালে তার সঙ্গে যুক্ত হলো সাধারণ মুসলমানের প্রভাব; এর সোনালী ফসল ফলে সপ্তদশ শতকে—এই শতকের বাঙলা সাহিত্যে সে ফসলের পূর্ণ বিবরণ মেলে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম আমলের কবি ও কাব্য পরিচয় (১)

পঞ্চদশ শতক

(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর

১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে হাজি ইলিয়াস (আলাউদ্দিন আলী শাহের সৎভ্রাতা) শায়সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নামে (সারা দেশে) বাঙলা দেশের স্বাধীন সুলতান রূপে নিজেকে ঘোষণা করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে তুর্কী শাসনের অবসান ঘটে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিলো আন্তরিক। তাঁর বিশেষ পৃষ্ঠ পোষকতায় গৌড়ের শাহী দরবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৩৫০ থেকে শুরু করে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সোয়া দুশো বছর ধরে গৌড়ের মুসলিম শাহী দরবারে একটানা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এই পৃষ্ঠ পোষকতা চলতে থাকে।

ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহের আমলে দিল্লীর বংগ জয়ের চেষ্ঠা বারবার ব্যর্থতায় পর্ববসিত হয়। সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আবম শাহের আমলে বাঙলার সাথে বহির্বিদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্র স্থাপিত হয়।

১৪০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি চীন সম্রাট 'হইতির প্রতিষন্ধী ম্যনলা'র দরবারের এক রাজদূতকে গ্রহণ করেন এবং ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজের দূত পাঠান। তিনি জগদ্বিখ্যাত পারস্য কবি হাকিমের সাথে পত্রালাপ করতেন। তিনি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন বাঙলা দেশে। মিছিলার কবি বিদ্যাপতি এবং মুসলিম বাঙলার কবি মুহম্মদ সগীরেরও তিনি ছিলেন সমরদার ও পৃষ্ঠপোষক। এ জন্যই বিদ্যাপতি তাঁকে “প্রভু গ্যাসদেব সুরতান” বলে উল্লেখ করেছেন এবং শাহ মুহম্মদ সগীর লিখেছেনঃ

—“রাজ রাজেশ্বর মণ্ডে ধার্মিক পণ্ডিত
দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত

মনুষ্যের মধ্যে জেহু ধর্ম অবতার
মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার।
যাবৎ জীবন মুক্তি দেখিলু হিঁ কাম
তান ভক্তি বিনা ধিক্ নাহি আর ধাম।”

শাহ মুহম্মদ সগীর বাঙলার মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম। তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘যুসুফ-জুলিখা’। এই কাব্যের তিনখানি অনুলিপি মরহুম সাহিত্য বিশারদ সাহেব আবিষ্কার করেছেন। একখানি সাম্প্রতিক অনুলিপিতে ডক্টর এনামুল হক ‘ইছুপ-জুলিখা’ পৃথিবী রাজবন্দনা অংশ পেয়েছেন। এই রাজবন্দনার অংশটি নিম্নরূপঃ

পরার ছন্দ

তিন তিএ পরনাম করো রাজ্যক ঈশ্বর
বাঘ ছাগে পানি খায় নিভয়, নিডর
রাজ-রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত
মনুষ্যের মধ্যে জেহু ধর্ম অবতার
মহানরপতি ‘গ্যেছ’ পৃথিবীর সার
ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজা আপন বিজ্ঞএ
পুত্র শিষ্য হস্তে ভেঁহ মানে পরাজয়
মোহাজন বাক্য ইহা পূরণ করিয়া
লইলেন্ত রাজ্যপাট বাংলা গৌড়িয়া
করুণা হীদএ রাজ পুন্যবস্ত তর
পুল্লিমার চান্দ জেহু বচন সোন্দর
মধুর মধুর বানী কহন্ত সোসর।—ইত্যাদি।.....

সুলতান ‘গ্যেছ দেবে’র বন্দনা-ই রাজবন্দনায় স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর পিতা সিকান্দারকে যুদ্ধে পরাজিত করে গৌড় সিংহাসন দখল করেন। “পুত্র শিষ্য হস্তে ভাঁহ মানে পরাজ্ঞএ”—এই ছন্দে, ডাঃ এনামুল হকের মতে, কবি বলতে চানঃ ‘গ্যেছ দেবে’র পিতা যেন পুত্র ‘গ্যেছ দেবে’র কাছ থেকে পরাজয় কামনা করেছিলেন।—পুত্রের হাতে পরাজয়েই যেন গৌরব। গিরাসউদ্দিন আযম শাহের হাতে পিতা সিকান্দার শাহ-এর পরাজয়ের ইঙ্গিতই আছে এখানে। এ কাব্যের কোনো অনুলিপিতেই কবির ব্যক্তিগত

পরিচয় নেই। তবে এতে এমন কতকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আজও চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে। এ জন্য কেউ কেউ অনুমান করেন তিনি চট্টগ্রামের বাসিন্দাও হতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চয় করে বলার মতো কোনো মাল-মশলা এখনও আমাদের হাতে নেই। অবশ্যি তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, তা' বোধ হয় মেনে নেয়া যেতে পারে, কারণ তাঁর পুঁথির সবক'টি অনুলিপি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলেই পাওয়া গেছে।

'আল কোরআনে' বর্ণিত হযরত ইউসূফের কাহিনী: অবলম্বনেই এ কাব্য রচিত; ইউসূফ-জোলায়খার প্রেম কাহিনীই এ কাব্যের মূল কথা। তবু শুধু কাহিনী বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য নয়। তাঁর শাহ্ উপাধিতে মনে হয় তিনি কোনো দরবেশের বংশোদ্ভূত ছিলেন; কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে ধর্মের সত্য প্রচারই কবির উদ্দেশ্য। কবি নিজ উদ্দেশ্য সত্বে দ্বিধাশূন্য। দেশী ভাষায় মুসলিম কাহিনী বর্ণনাই কবির অন্যতম লক্ষ্যঃ-

“কহে শাহা মোহাম্মদ ইচ্ছাপ জ্বলেখা পদ
দেশী ভাষা পয়ার রচিত।”

কবি যেহেতু সত্যিকার কবি এবং জীবনরসিক তাই তাঁর রচনা ধর্ম কাহিনীকেও রসস্বিষ্ট করে তুলেছে। ফারসী ভাষায় 'জামী'র বিখ্যাত কাব্যের নাম—“ইউছূফ-জোলায়খা”। কাহিনী একই; কিন্তু 'সগীরে'র রচনা 'জামী'রও পূর্ববর্তী। মহাকবি ফেরদৌসিরও এই নামীয় একটি কাব্য আছে; কিন্তু তাঁর প্রভাব সগীরের উপর পড়েছে কিনা তা পন্ডিভদের গবেষণা সাপেক্ষ। সগীরের কাব্যের পরিবেশ অনেকখানি বাঙলারই পরিবেশ এবং কাহিনীতেও কতিপয় বাঙালী চরিত্র স্থান পেয়েছে।

(খ) মুজম্বিল

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে যে ক'জন মুসলিম কবির সাক্ষাৎ মেলে কবি মুজম্বিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর দু'টি পুঁথি পাওয়া গেছে। পুঁথিগুলির কোনো নাম দেয়া নেই, তবে বিষয়বস্তু অনুসারে পুঁথির নাম “সায়াত্‌নামা” বা “নীতিশাস্ত্রবার্তা” হতে পারে। তৃতীয় আরেকটি পুঁথি পাওয়া গেছে যাতে গ্রন্থকার হিসেবে মুজম্বিলের সঙ্গে হুসূফের নাম উল্লিখিত হয়েছে। হুসূফ গ্রন্থকার না হয়ে লিপিকারও হতে পারেন। যাই হোক তিনটি পুস্তকের বিষয়বস্তু প্রায় একই।

“নিতি শাস্ত্র বার্তা জ্ঞান পাসাণের রেক
এ সব জানিলে লোকে জ্ঞান বাড়িবেক।”

গৃহ-নির্মাণ, ঋক্ষন দর্শন, নববস্ত্র পরিধান, স্থান, স্বপ্নফল, শুভাশুভযোগ প্রভৃতি বিষয় এ পুঁথিগুলোতে যেমনি আলোচিত হয়েছে, তেমনি ভূমিকম্প, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ, স্বপ্ন বৃত্তান্ত, গৃহদাহ, নহহ আকবর, ইত্যাদির আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ইসলামী 'জ্যোতিষ ও নিত্য কৃত্যের,'— এই পুঁথিখানার রচনাকাল— ১৬৭৯ শকাব্দ (১৭৫৭ খৃঃ অঃ)। কিন্তু সাহিত্য বিশারদ সাহেব মনে করেন মুজম্বিল সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের কবি। ডঃ এনামুল হক এই দুই মতের কোনোটাই গ্রহণ করেন নি। 'সায়্যাতনামা'র শেষে মুহম্মদ "হুসী" গ্রন্থ রচনার যে তারিখ দিয়েছেন, তাই সুকুমার সেনের উল্লিখিত তারিখ, মুজম্বিলের রচনার তারিখ নয়। কবি মুজম্বিলের প্রথম উল্লেখ মেলে 'গোলে বকাউলী'র কবি 'মুকীমের কাব্যে। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী চট্টগ্রামের কবিদের একটা তালিকা দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে মুজম্বিলের নামও উল্লেখ করেছেন। মুকীমের 'গোলে বকাউলী' রচনার তারিখ নেই, কিন্তু তাঁর 'ফায়দুল মুকতদী' গ্রন্থের তারিখ আছে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি রচিত। তাহলে কবি মুজম্বিল সম্ভবতঃ ১৬শ শতকের পরের কবি হতে পারেন না, একথা ধরে নেয়া যেতে পারে। 'সায়্যাতনামা'র ভাষা বিচার করেও ডঃ হক এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এর ভাষা সম্ভবতঃ ১৬শ শতকের নয়, আরো প্রাচীন। এবং তার প্রমাণ স্বরূপ ডঃ হক কবির নিজেরই উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ-

“শাহা বদরুদ্দিন পীর কৃপাকুল হরি
শত মুখে সে বাখান কহিতে না পারি
তাহান আদেশ মাল্য শিরেতে ধরিয়া
রচিলেন্ত মোজাম্বিলে মন আকলিয়া।”

বিহারের পীর বদরুদ্দিন বদর-ই-আলম ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে ইজিকাল করেন। চট্টগ্রামের বদর পৌতিতে তাঁর নকল সমাধি রয়েছে। তিনি বিহারেই দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি যে ধর্ম প্রচারার্থে চট্টগ্রামে এসেছিলেন তার বহু প্রমাণ আছে। অনেকে মনে করেন, চট্টগ্রামের বদর শাহ (প্রাচীন পুঁথির বদর আলম) ও বিহারের পীর বদর-ই-আলম একই ব্যক্তি। তিনি যখন চট্টগ্রামে অবস্থান করেন তখন কবি তার মুরীদ হয়ে থাকবেন, ডঃ হক এমনি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এ কথা সত্য হলে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের আগেও কবি মুজাম্বিল জীবিত ছিলেন। এ হিসাব অনুযায়ী তিনি ১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি। কবি মুকীমের জবানীতে আমরা আরও জানতে পেরেছি কবি মুজাম্বিল চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

কবির নিজের জ্বানীতে বোঝা যায়- 'সায়ানামা' আরবী থেকে তর্জমা করা হয়েছে। আরবী ভাষা সকলে বোঝেনা বলে তিনি তা' বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে অনুবাদ করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ দেশী সংস্কারেরও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। এই পুঁথির একটি প্রাচীন প্রতিলিপির যে একটি মাত্র পাতা পাওয়া গেছে তার পাঠ নিম্নরূপ :

'নব গৃহ কোন মাসে নিরসিবেক নরে ।
সে ঘর বাঙ্কিব আর কোন্ কোন্ বারে॥
ভালামন্ড জানিবারে মনুষ্য উচ্চিত
কহিব পয়ার ছন্দে উপদেশ হিত॥
কার্তিক, আশনে যদি কেহ বাঙ্কে ঘর ।
সুভক্ষণে সুভদিনে বাঙ্কিব সম্বর॥'

কবির ভাষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্রকাশভঙ্গীর এই স্বচ্ছতা। বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলার এই ক্ষমতাই সে কালের কাব্যের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

পঞ্চম অধ্যায়

কাব্য পরিচয় (২)

ষোড়শ শতক

(ক) আফজল আলী

আফজল আলীর একটি পদে ছৈয়দ কিরোজ শাহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই কিরোজ শাহ খুব সম্ভব গৌড়ের স্বাধীন সুলতান ছৈয়দ হোসেন শাহের পৌত্র ও নসরত শাহের পুত্র কিরোজ শাহ (১৫৩২-৩৩)। পদটিতে কবি বলেছেন :

ছৈয়দ পেরোজ শাহা সুধাময় অবগাহা

ভজ সয়ধি সুরংগচরণ ।’

এই ছৈয়দ ‘পেরোজ শাহ’ যে কবির পীর নন তার প্রমাণ কবির পীরের নাম শাহ রুমতম। এক ব্যক্তির দুই পীর থাকে না। তাছাড়া সমকালীন রাজা-বাদশাহদের নাম প্রাচীন কাব্যে যেভাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে এখানে ছৈয়দ পেরোজ শাহ’র নাম সেভাবেই উল্লিখিত হয়েছে—এই যুক্তিতে ডঃ এনামুল হক অনুমান করেছেন—এই ছৈয়দ পেরোজ শাহ হচ্ছেন গৌড়ের ছৈয়দ বংশীয় সুলতান ছৈয়দ হোসেন শাহের পৌত্র ও নসরত শাহের পুত্র। এই অনুমান অপ্রাস্ত হলে কবি আফজল আলী ষোল শতকের দ্বিতীয় দশকে বর্তমান ছিলেন। কাজেই তিনি বাঙলার প্রাচীন কবিদের অন্যতম। তবে জনাব আহমদ শরীফ মনে করেন, ‘নসিয়ত নামা’র রচয়িতা আফজল আলি ও পদকর্তা আফজল আলি ভিন্ন ব্যক্তি। তার ধারণা ‘নসিয়ত নামা’র লেখক আফজল আলি আঠারো শতকের লোক। তবে পদকার সৈয়দ আফজাল ও পদকার আফজাল আলি অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন। তার দু’টো পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

‘নসিয়ত নামা’য় কবি আফজল আলীর যে আত্মপরিচয় আছে, তা’ থেকে জানা যায়, কবি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার মিলুয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কবির পিতা

‘ভাংগু’ ফকির আলেম ও দরবেশ ছিলেন। কবির পীরের নাম শাহ্ রুস্তম। পীরের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :-

“চাট্টিগ্রাম মধ্যে ক্ষুদ্র এক গ্রাম।
মিলুয়া করিয়া আছে সে গ্রামের নাম ॥
সেই গ্রামে ছিল এক ফকীর আদ্বার।
এ চারি মঞ্জিল ভেদ দিল করতার ॥
শাহা সে রুস্তম করি ছিল তার নাম।
আদ্বার হৈল কৃপা গুণে অনুপাম ॥
গায়েরী মর্তবা প্রভু তাহানে যে দিলা।
গায়েরীর ভেদ যত কহিতে লাগিলা ॥
গায়েরী ফকির বলি দেশ দেশান্তর।
তান খ্যাতি একে একে হইল প্রচার ॥”

সাতকানিয়ায় শাহ্ রুস্তমের নামে ‘রুস্তমের হাট’ ও হাটের কাছেই শাহ্ রুস্তমের মাযার আছে বলে ডাঃ এনামুল হক লিখেছেন। স্থানীয় লোকেরা মনে করে তিন চারশো বছর আগে শাহ্ রুস্তম জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ নিছক অনুমান মাত্র। ‘নসিয়ত নামা’র পাতুলিপির অনুলেখক—১২২৪ মসীতে, অর্থাৎ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে পুঁথিটি নকল করেন। একে ১১২৪ মসী, অর্থাৎ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের নকলও মনে করা যেতে পারে বলে ডাঃ হক অনুমান করেছেন এবং তাঁর অনুমানের সপক্ষে তিনি পদকর্তা আফজল আলির পূর্বাধৃত পদটি উদ্ধৃত করে কবির প্রাচীনত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

‘নসিয়ত নামা’র বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত কাব্যের মধ্যেই নিহিত। মুর্শিদ শাহ্ রুস্তম স্বপ্নে কবিকে কতকগুলি নির্দেশ দান করেন। এই উপদেশগুলোর মূলে রয়েছে ‘আল কোরআন’ ও ‘হাদীসে’র শিক্ষা। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি প্রাধান্যযোগ্য :-

‘শাহা রুস্তম পদে মাগি পরিহার।
যতক কহিলা গুরু সব বাক্য সার ॥
দিনে দিনে বুঝি পাইলু বচন তোমার।
হেন বুঝি না দেখি আখের হইতে পার ॥

অধম আফজল আলী অতি গুনাহগার ।

পদ বন্ধে যত স্বপ্ন দেখিলু তোমার ॥

* * * *

উপহাস্য করে বুঝি মোনাফেকগণ ।

আয়েত হাদীছ লেখিয়াছি তে কারণ ॥

খোয়াব বলিয়া শাহা রম্ভম কঁহিল ।

খোয়াব বলিয়া তবে পদবন্দী কৈল ॥

লেখকের উদ্দেশ্য কাব্য রচনা নয়, ধর্মোপদেশ প্রচার । কবির কাল সম্পর্কে ডঃ হকের মত স্বীকার করে নিলে, কাব্যটি নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে । ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সামান্যই । এদিক দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে গ্রন্থটির একটি বিশেষ স্থান আছে ।

আফজল আলীর খন্ড কবিতাগুলির ভাষা সহজ ও প্রাজ্ঞল । পদাবলীর রচনারীতির আদর্শে রচিত এই কবিতাগুলিতে সাধক কবির ব্যাকুলতা মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে । বসন্তের বর্ণনায় কবির ভাষা উদ্ভাসিত :-

“সব ঋতু সঙ্গে আইল রসরংগ সহিত
বিরহিনী স্নীগতনু মদনে চিন্তিত
আইল বসন্ত ঋতু লইয়া নব নব
মনোজ্ঞ সারথি লইয়া সঙ্গে ...
তরু সব হরষিত, সতত যে পুলকিত
দশদিক শোভে নানা রঙে ।
নানা তরুলতা ফুলে শিরীষ চামর দুলে
যঠপদ যত্নের বন্ধার ।”

কবির প্রার্থনার ভাষা :

হামে অলস গুরু ভুঞি কল্পতরু
তছপরে সাজি সুখ চাহি
আদি অন্ত মোহে করো ফলোদয়
মুঝে না কর নৈরাশি ।

খাক্ পাক্ করি তাহে জিউ ধরি
তমরজ সত্ সাক্শিপুৰা
সোহি দয়াময় আফজলে ভাবয়
মুখে গৌরব কর খোড়া॥

(খ) সাবিরিদ খান

সাবিরিদ খানের তিনটি পুঁথিই পাওয়া গেছে খণ্ডিত আকারে। কোনো পূৰ্ণ পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পুঁথিগুলি হচ্ছে—(১) বিদ্যাসুন্দর, (২) রসুল বিজয়, (৩) হানিকা ও কয়রা পরী। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটির মাত্র অল্প কয়েকখানি পাতা পাওয়া গেছে।

পীয়ার মল্লিক সূত বিজ্জবর শাস্ত্রযুত
উজ্জীয়াল মল্লিক প্রধান
তানপুত্র জি ঠাকুর তিনসিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুসা খান।
তান সূত গুণাধিক নানুরাজ ময়ল্লিক
জগত প্রচার যশখ্যাতি
তান সূত অল্প জ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদ বন্ধে রচিত ভারতী।

কবি যে খান বা পাঠান বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা এই বংশ বিবরণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। কবি বংশের সকলেই মহল্লিক অথবা সরকার পদে কাজ করতেন। ফটিকছড়ি ধানার ইছাপুর পরগণার নানুপুর গ্রামে কবির নিবাস ছিলো। কথিত আছে, এই গ্রামটি কবির পিতা নানুরাজা কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই গ্রামে কবির বংশধরেরা এখনো আছেন বলে জানা যায়।

কবির খণ্ডিত কাব্যগুলিতে কবির সময় সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এসব কাব্য যে ভাষায় লিখিত হয়েছে তাতে কবির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ মেলে। 'রসুল বিজয়,' 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'হানিকা-কয়রা পরী'র ভাষা ও ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতেরা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঐ ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের ভাষা। ডঃ সুকুমার

সেন অবশ্যি অনুমান করেন—সাবিরিদুখান সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। কিন্তু কবির রচনায়, যে সব ভাষা-ভাটিক ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তা' ষোড়শ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের গ্রন্থে দেখা যায়। কাজেই ডঃ হকের মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। —অর্থাৎ সাবিরিদ খান ষোড়শ শতকের শেষের দিকের কবি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

বিদ্যাসুন্দর ঃ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অতি পুরোনো। এ কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবি কোনো সংস্কৃত কাব্য বা কবিতা অনুসরণ করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর প্রমাণ—কবি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে তারই ব্যাখ্যা করেছেন পয়ার ত্রিপদীতে।

ষোড়শ শতকে দ্বিজ শ্রীধর ও কবি কঙ্ক আরো দু'খানি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। সপ্তদশ শতকে বিদ্যাসুন্দর কাব্য লেখেন গোবিন্দ দাস ও কৃষ্ণরাম দাস। এঁদের কারো ভাষাই সাবিরিদ খানের ভাষার মতো প্রাচীন নয়। কাজেই তিনি এঁদের সকলের থেকে প্রাচীন কিনা তাই বা কে বলবে।

সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরকে কাব্য না বলে একটা নাট্য-কাব্য বলাই সংগত। তাঁর প্রত্যেকটি বর্ণনাই যেন এক একটি দৃশ্যের চিত্র। কবি নিজেও তাঁর কাব্যের নাট্য গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।—

“এ নাট গীতেত ভাল না করিয়া ভঙ্গ

এক মনে শুনিলে বাড়িবে মনোরঙ্গ।”

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী সুপরিচিত হলেও সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দরে' নতুনত্ব আছে। এ কাব্যে সুন্দরের পিতা হচ্ছেন গুণসাগর, আর মাতা—কলাবতী। গুণসাগর হচ্ছেন বিজয়নগরী রাজ্যের রত্নাবতী পুরীর রাজা। জ্ঞানে ও কাব্যকলায় অসাধারণ পারদর্শী পুত্রের নাম রাখলেন—'বিদ্যাসুন্দর'।—আর বিদ্যার পিতার নাম কখনও বিক্রম কেশরী, আর কখনও বা বীর সিংহ; মাতার নাম শিলাদেবী। সর্বশাস্ত্রে বিদুষী বিদ্যার নাম হলো—'বিদ্যাবতী'। তার পণ—বিদ্যায় যে তাকে হারাতে চাইবে সে বরণ করবে পতিত্বে। এই কথা শুনে 'বিদ্যাপতি সুন্দর' এলো কাঞ্চীপুর। সুচরিতা মালিনীর কাছে সে আশ্রয় চায় রাতের মত। কাব্যের এই অংশের ভাষার প্রাচীনত্ব ও প্রাজ্ঞলতা সংশয়াতীতঃ-

“আক্ষাজ্ঞান বৈদেশী নিচ্ছিত
দ্বিজবর তনয় পঞ্জিত
পাঠ পড়ি ভ্রমি এ নগর
পণ্ডিতানী করিতে বিচার ।
বেলাশেষে অস্ত যায় সুর
বাসাখানি মাগি তোক্ষা পুর
পালহ বচন সুনয়নী
প্রেম চিন্তে দাও বাসাখানি ।”

উত্তরে মালিনী বল্ছে ৪-

“জবে আর ভিন্ন দেশী পাই
যদু করি তাহাক রহাই
মনে ভীত বাসি তোক্ষা দেখি
মহারাজ সূত হেন লখি ।”

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি আপাতঃ দৃষ্টিতে একটি প্রেম কাহিনী মনে হলেও আসলে এ হচ্ছে একটি রূপক কাব্য—ইহাই ডঃ হকের ধারণা। তাঁর মতে সুন্দর হচ্ছে— শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতীক এবং বিদ্যা মানুষের জ্ঞানের প্রতীক। মূল রূপক কাব্যটিকে সাবিরিদ্দ খান রূপক নাট্যের রূপ দিয়েছেন, এখানেই কবির কৃতিত্ব।

কারো কারো ধারণা এ রূপকের মূলে আছে দেহমনের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী। তত্ত্বটির মতে সুন্দর সুডোল, সুগঠিত দেহে যখন মার্জিত, উন্নত রুচি, সৌন্দর্যবরসিক সুন্দর মনের বিকাশ ঘটে, তখনই হয় মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। মনুষ্যত্বের এই পূর্ণতার আদর্শই বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ। শারীরিক সৌন্দর্যের সাথে মানসিক সৌন্দর্যের মিলন দেখানোই এই শ্রেণীর কাব্যের উদ্দেশ্য। কবির রচনা কতো প্রাজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী পূর্বের উদ্ধৃতিতেই তা প্রমাণিত হয়। সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত; অলংকার ও উপমা প্রয়োগে তিনি অব্যর্থ। এ প্রসঙ্গে বিদ্যার রূপ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ৪

মুখ বিধু পূর্ণ হলো কিএ অরবিন্দ ।
মৃগবৎস নেত্র কিবা নীল মস্ত ভৃগুগা

বালেন্দু জিনিয়া ভাল সীমন্ত উজ্জ্বল ।
 বান্দুলি প্রস্ন নিন্দি অধর যুগল ॥
 রদ শীতি স্মৃতি জ্যোতি বাচি সুমধুর ।
 ভূক্ভংগে কামশর নিঃসরে প্রচুর ॥
 কণ্ঠরেখা দেখি কনু জলধি মজ্জিল ।
 কমল কলিকা কুচ হৃদয়ে উগিল ॥

রসূল বিজয় :—সাবিরিদ খানের এই খণ্ডিত পুঁথিটির ২১-৩২ পর্যন্ত মাত্র ১২টি পাতা পাওয়া গেছে। কাব্যটির বিষয়বস্তু কাব্যের নামেই স্পষ্ট; অর্থাৎ রসূলের জীবন বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য। রসূলের দেশ বিজয় উপলক্ষে কবি তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। ‘রসূল-বিজয়’ নামক আরেকখানি কাব্যের রচয়িতা হচ্ছেন—জৈনুদ্দিন। সুপণ্ডিত সাবিরিদ খানের কবি প্রতিভা ছিলো জৈনুদ্দিনের কবি প্রতিভার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। নিম্নের উদ্ধৃতিতে কবির পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কিছু পরিচয় মিলবে :

“প্রমোদিত পাএগামুর প্রশংসি বুলিলা
 মিত্রভাবে আন্বাএ তোমাকে জএ দিলা
 আন্বার কেসারী তুমি না থাকিত জদি
 তবে তাকে ধরি আনি কে করিত বন্দী
 আলিক বাখানি নবী কৈলা আশীর্বাদ
 আনন্দ উদ্বাসে সব জএ জএ বাদ
 ছালার হৈলা বন্দী সর্ব সৈন্য জ্রাস
 নৃপতি দেখিয়া শোকে হৈলা হতাশ ।
 সাবিরিদ খানে কহে রসূল বিজএ
 সুনি বধু কর্ণ পুরি সুখা বরিষএ ।”

পুত্রের বন্দীত্বে কাতর নৃপতির উদ্ভাস আমাদের ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যে পুত্রশোকে কাতর রাবণের শোকোদ্ভাসের কথা স্বরণ করিয়ে দেয় :

“ছালার বিচ্ছেদের ক্রেশ পাইলা ।
 কেন নবিদরে বস্তু হিয়া ॥
 অবসেস মোহর কুঞ্জর ।
 সঙ্ঘামে রক্তম সমসরা ॥

ভূবন-বিখ্যাত ধনুর্ধর ।
 রণে দক্ষ প্রতাপে ডাকুর ॥
 দেখিলু প্রত্যক্ষ নয়ানে ।
 হেন পুত্র বান্ধি রিপুগণে ॥
 এত দুঃখ সহিব কার প্রাণ ।
 অপমানে তেজিনু পরাণ ॥
 হাহা পুত্র ছিপাহু ছালার ॥
 জগত বিজয়ই বলি আর ॥”

নৃপতির বীরপুত্র সিপাহু-সালার আলী কর্তৃক বন্দী হওয়ার পর সিপাহু-সালারের ভ্রাতা মুলুক সাহা প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে রণসাজে সজ্জিত হয়। এই রণসজ্জা বীরবাহুর মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা মেঘনাদের রণসজ্জারই অনুরূপ।

‘রসুল বিজয়’ কাব্যটিতে একটি বিবাহের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় কবির সমকালীন বিবাহোৎসবের একটা মোটামুটি চিত্র মেলে। সেমাপতি খবাইলের সংগে জয়কুন রাজকন্যার বিয়ে হয় হযরতের আদেশে। সে বিয়েতে—“ঘরে ঘরে সুগন্ধি তাম্বুল বণ্টিত হয় এবং সব মহাজন সে বিয়েতে আসেন। আনন্দ আর ধরে না; নাচ-গান-বাজনায় একেবারে হুলস্থূল ব্যাপার। এমনকি :-

“বেশ্যানারীগণ নাচএ ঘন ঘন

মোহাম্মদ রাজপুরে”!—কনের গায়ে হলুদ কস্তুরী চন্দনের প্রলেপ, মাথায় সিন্দুর, কুঞ্চিত চুলের সু-উচ্চ কবরী, তার সদে

—“সগুদিন রাত্তি তেলে আই নিতি

নারী সবে দিলা রঙ্গে ।’ —কল্পনার কি বাহাদুরি?

— রসুলের ঘরে বিয়েতে “বারবণিতা” আমদানী ইসলাম সম্পর্কে কবির সীমাহীন অজ্ঞতাই প্রমাণ করে।

কবি সাবিরিদ খানের ‘হানিফ ও কয়রাপরী’ ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে নূতনত্বের দাবী করতে পারে। এ গ্রন্থের ভাষা প্রাক্কলতর এবং বিষয়বস্তু স্ব-কপোল কল্পিত—যদিও ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবলম্বন করেই কবি কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। হানিফের সাথে সহিরাম রাজার যুদ্ধে পরাজিতা বীর কন্যা জৈতনের বিয়ে,

সহিরাম রাজার সঙ্গে যুদ্ধে হানিফার আহত হওয়া এবং শাহা পরীর কন্যা কয়রা পরীর নজরে পড়া ও প্রেমাঙ্গু কয়রা পরী কর্তৃক হানিফার হরণ; পরে কয়রা পরীর বিরুদ্ধে জৈন্তা বিবির যুদ্ধাভিযান, দুর্মিক রাজার পরাজয় ও ইসলাম গ্রহণ—ইত্যাদি বর্ণনার পর পুঁথিখানি খণ্ডিত।

(গ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর : মহাভারতের অনুবাদ

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট হোসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের সুলতান। হোসেন শাহের সময় কামরূপ বিজিত হয়; চট্টগ্রামে মগেরা পরাস্ত হয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যও ভীত হয়ে পড়েন। 'রাজমালা'র লেখক বলেন—আরাকানীরা পরে হোসেন শাহের নিকট থেকে চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। এই হোসেন শাহের দরবারেই, শ্রীযুত গোপাল হালদারের মতে 'বাঙলা কাব্য ভূমিষ্ঠ হয়'। হোসেন শাহ ছিলেন জ্ঞানী, গুণীর পৃষ্ঠপোষক, বাঙলা সাহিত্যের ভক্ত ও উৎসাহদাতা। হোসেনী বংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়টা সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতার জন্য বাঙলাদেশ অবিস্মরণীয়। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতা, মর্যাদা দান, অনুশীলন ও বিস্তৃতির জন্য হোসেনী বংশের তুলনা এদেশের ইতিহাসে মেলে না।

হোসেন শাহ ছিলেন খাঁটি আরব বংশজাত। ইসলামের উদার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আদর্শের সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো প্রত্যক্ষ; তাই তিনি ছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তিনি বাঙালী মহিলাকে বিয়ে করায় বাঙলাদেশের সঙ্গেও তার পরিচয় হয় নিবিড়তর। বাঙলাদেশ ও আরবের মিলনের ফলেই সৃষ্টি হোলো বাংলা কাব্যের। বরিশালের কবি বিজয়গুণ্ড (অনুমান ১৪৯৫ খৃঃ) এবং চক্ৰবর্তী পরগণার কবি বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর কাব্যে হোসেন শাহের প্রশংসা কীর্তন করেছেন। বাঙলায় ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনার রেওয়াজ হয় হোসেন শাহের-ই আমলে। হোসেন শাহের বর্ণনাকারী শ্রীখণ্ডের কবি যশোরাজ খান একাধারে তাকে 'জগৎসুখ' এবং 'বিদগ্ধজন' বলে উল্লেখ করেছেন। বৈদম্ব্য বা রসজ্ঞানই বাঙলা সাহিত্যের প্রতি হোসেন শাহের পোষকতার একটি কারণ। ধর্ম সাহিত্যের বাঙলায় অনুবাদ হোসেন শাহের অন্যতম কার্তি,—তার প্রমাণ পরাগলী 'মহাভারত'। তাঁর আমলের আরেকটি স্বরণীয় ঘটনা চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫০৩) আবির্ভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রতিষ্ঠা। তাতে করে বৈষ্ণব সাহিত্যের বুনয়াদ স্থাপিত হয়।

হোসেন শাহের সভাসদ ছিলেন রূপ সনাতন, পুরন্দর খাঁ। তাঁর দরবারে হিন্দু শাস্ত্রের চর্চা হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবেই করেছেন। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মা পুরাণে' তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। পদাবলীতেও হোসেন শাহের উল্লেখ বহু; যেমন :

“শ্রীযুক্ত হুসন জগৎচূষণ, সেহ এ রস জানে,
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশোরাজ খানে।”

পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ পর্বে ছত্রে ছত্রে হোসেন শাহের গুণগানু কীর্তিত হয়েছে।

হোসেন শাহের দরবার থেকে মগী-দমনের জন্য স্বয়ং শাহজাদা ভাবী সত্ৰাট নুসরত শাহ্ এবং সেনাপতি পরাগল খাঁ চট্টগ্রামে প্রেরিত হন। পরাগল খাঁ ছিলেন হোসেন শাহের বিশ্বস্ত সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা। কেণী নদীর তীরে চট্টগ্রাম জোরতারগঞ্জ খানার অধীনে পরাগলপুর এখনো বর্তমান। সুবৃহৎ পরাগল দীঘির পানি আজও ব্যবহৃত হয়। পরাগল খাঁর প্রাসাদ আজ ধ্বংস রূপে পরিণত। মগী-সৈন্য বিজয়ী মহাবীর পরাগলের কথা বিশ্বস্তির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু পোকায় খাওয়া একখানা তুলোট কাগজের পুঁথি সেই লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধার করে। পুঁথিখানা হচ্ছে—পরাগলী ভারত বা কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারত। পরে পরমেশ্বর দাসের নির্ভরযোগ্য পুরোচনা পুঁথি কয়েকখানাই পাওয়া গেছে। পুঁথিটির ভূমিকা নিম্নরূপ :

‘নৃপতি হুসেন শাহ্ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি।
অল্পে শত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার।
নৃপতি হুসেন শাহ্ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লঙ্কর।
লঙ্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ষ কনক পাইল অশ্ব বায়ুগতি।
লঙ্করী বিষয়ে পাই আইবস্ত চলিয়া।
চাট্টগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া।
পুত্র-পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুকন্ত নীতি হরষিত মতি।”

পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ, পুত্রের নাম ছুটি খাঁ। এই পুঁথিটিতে তাঁদেরও উল্লেখ আছে। স্বীয় পৃষ্ঠশোষক পরাগল খানের গুণকীর্তন কবীন্দ্র প্রতি পাতায় পাতায় করেছেন; ভাবাতিশয্যপূর্ণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় কবির কৃতজ্ঞতা-রসের অভিব্যক্তি ঘটেছে :

“কৌণী কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ
পুণ্য কীর্তি, গুণাস্বাদী পরাগল খান।”—কিংবা
“শ্রীযুক্ত পরাগল পদ্মিনী ভাস্কর।”
“লঙ্কর পরাগল খান গুণের নিধান
অষ্টাদশ ভারতে যাহার অবদান
দানে কল্পতরু সে যে মহাগুণশালী
কুতূহলে করাইল ভারত-পাঞ্চালী।”

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০ শ্লোকে রচিত। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত কবি স্থানে স্থানে মূলের অঙ্করে অঙ্করে অনুবাদ করেছেন। সেকালে এ ধরনের অনুবাদ কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই অনুবাদে চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থানে স্থানে খুবই জটিল হয়ে পড়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। অপেক্ষাকৃত সহজ অংশ থেকেও কবীন্দ্রের কবিত্ব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে।

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা

সত্য কহ আক্ষাতে কপট পরিহরি
কি নাম তোমার কহ কাহার বর নারী
দুই উরু গুরু তোর অতি সুললিত
নাভি গভীর তোমার বাক্য সুললিত
দশন ডালিষ বিজ্জুলি নয়ন
রাজার মহিষী যেন সব সুলঙ্কণ।
* * * *
নারী সব তোম্বা দেখি পাশরিতে নারে
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্ষ রাধিবারে
রাজাএ দেখিলে তোম্বা মজ্জিবেক মন
বল করি ধরিতে রাধিবে কোন জন?

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা

পরিধান পীতবাস কুসুম বসন ।
নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কোমল শোচন॥
মেঘের বিদ্যুত তুল্য হসিত মুখেত ।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এ চারি করেত॥
শিরেতে বান্ধিয়ে চূড়া মালাতি মালাএ ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যায়॥

ক্রোধের বর্ণনায়ও কবি সিদ্ধহস্ত । ভীষ্ম পর্বে, যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ-

দেখহ সাত্যকি মুঞি চক্র লইনু হাতে ।
ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব করিমু সংহার ।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক দিমু রাজ্যভার॥
এ বলিয়া সাত্যকিরে করি সম্ভাষণ ।
হস্তেতে লইল চক্র দেব জনার্দন॥
সূর্য সমান জ্যোতি সহস্র বজ্র সম ।
চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম॥

পরাগল খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন ।
কবীন্দ্র তাঁর গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

“তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল ।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল॥”

হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ একখানি মহাভারত সংকলণ করিয়েছিলেন ।
পরাগলী মহাভারতে তার উল্লেখ আছে :

“শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান ।
রচাইল পঞ্চাঙ্গী যে গুণের নিধান॥”

(ঘ) শ্রীকরণ নন্দী

ছুটি খানও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তিনি কবি শ্রীকরণ নন্দীকে জৈমিনি-সংহিতার অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করতে আদেশ করেন। কবির কল্পনা সুদূরপ্রসারী; প্রভুর মন তুষ্ট করবার রীতিনীতিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ছুটি খানের প্রশংসা, গুণ-কীর্তন ও মাহাত্ম্য বর্ণনে তিনি একেবারে শতমুখ; তাতে ইতিহাস ভলিয়ে গেছে। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ কবির ভাষায় :

“পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভা খণ্ড মহামতি
একদিক বসিলেক বান্ধব সংহতি
গুনস্ত ভারত তবে অতি পুণ্যকথা
মহামুনি জৈমিনি কহিচে সংহিতা
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রশান্ত হৃদয়
সভামধ্যে আদেশিল খান মহাশয়
দেশীভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার
সঙ্ঘারৌক কীর্তি মোর জগত সংসার
তাহান আদেশ মালা মস্তকে ধরিয়া
শ্রীকরণ নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া।”

কবির পৃষ্ঠপোষক পরাগল খাঁ তনয় ছুটি খানের বর্ণনায় কবি একেবারে উচ্ছসিত :

“লঙ্কর পরাগল খানের তনয়
সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয়
আজ্ঞানুলম্বিত বাহু কমল লোচন
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নিরুখাইল বিধি
দাতা বলি, কর্ণ সম অপার মহিমা
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, গাভীর্য্যে, নাহিক উপমা।

* * * *

ত্রিপুরা স্থপতি যার ডরে এড়ে দেশ
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।”

শ্রীকরণ নন্দী ছুটি খানের আদেশে অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। জৈমিনি ভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্বই পাওয়া গেছে। কারো কারো ধারণা জৈমিনি শুধু অশ্বমেধ পর্বেরই অনুবাদ করেন। এ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। শ্রীকরণ নন্দী জৈমিনী ভারতেরই তর্জমা করেন। যৌবনাস্ব, অনুশাস্ব, নীলধ্বজ-জ্বলা, চণ্ডিকা, সুধয়া, সুরথ, হংসধ্বজ, প্রমীলা-অর্জুন-বক্রবাহন, তাম্রধ্বজ ও চন্দ্রহাস,—এঁদের উপাখ্যানই শ্রীকরণ নন্দীর কাব্যের প্রধান বিষয়। কবির রচনার ঋজুতা ও প্রাজ্ঞলতা লক্ষণীয়। তাছাড়া তাঁর আরেকটা গুণ তাঁর ব্যঙ্গরসিকতা। ভীম ও কৃষ্ণের কথা কাটাকাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

যুবনাশ্বের পুরী থেকে ঘোড়া আনয়নের জন্য ভীম মনোনীত হন; কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তা অনুমোদনযোগ্য নয়; অনেকগুলো যুক্তির মধ্যে একটি হচ্ছে :

“বহু ভক্ষ হএ ভীম স্থল কলেবর
হিড়িয়া রাক্ষসী ভার্যা যাহার সহচর।”

উক্তরে ভীম বললেন ঃ—

“মোকৈ মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল
তোম্মার উদরে যত বসে ত্রিভুবন
আম্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন
সংসার উপালন্ত সব খাইলা তুন্নি
তাহা হৈতে বহু ভয়ঙ্কর বোলে আন্নি
ভল্লুক কুমারী তোম্মার ঘরে জাহুবতী
তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িয়া যুবতী
তুমি নারীজিৎ মা হও আন্নি নারীজিৎ
আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত।”

* পটীয়ার অন্তর্গত জঙ্গল-খাইন গ্রামে নন্দী বংশে শ্রীকরণ নন্দীর জন্ম।

(৬) দৌলত উজ্জীর বাহরাম খান
(১৫৪৫-১৫৭৬ খৃঃ)

কবির কাব্য ‘লায়লী মজনু’তে কবির যে আত্ম-পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে তা বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ। কবির প্রথম রচনা অবশ্য জংগনামা বা কারবালা কাহিনী। উক্ত কাব্যের

চারখানি খণ্ডিত লিপি কুমিল্লার অধ্যাপক আলী আহমদ সাহেবের সংগ্রহে রয়েছে। এগুলির একটির ভণিতায় 'বার-আউলিয়া, 'চাটিআগ্রাম, জাকরাবাদ (ফতেয়াবাদ) ও নূপতি নিজাম শাহার' উল্লেখ আছে। কবি নিজেকে নিজাম শাহার অধীন সেবক বলে উল্লেখ করেছেন। 'লায়লী মজনু'তে লিপিবদ্ধ আত্মবিবরণীতে জানা যায় গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ প্রধান উজীর হামিদ খাঁকে চট্টগ্রাম দখল করতে পাঠান। তিনি চাটগাঁ দখল করে এখানেই বসবাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে গৌড়ের রাষ্ট্র বিপ্লবের অবসান হলে শূর বংশীয় নিজাম শাহা চট্টগ্রামের অধিপতি হন। পূর্বোক্ত হামিদ খানের অধস্তন পুরুষ মোবারক খান তখন জীবিত :

“ঐ যে হামিদ খান	আদ্যের উজীর জান
তাহান বংশেত উৎপতি	
মোবারক খান নাম	রূপে গুণে অনুপাম
সদা ধর্মে কর্মে তান মতি	
তান প্রতি মহীপাল	খিতাব অধিক জ্বল
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজীর	
সাধু সং লোক সঙ্গে	জনম বঞ্চিলা রঙ্গে
ধর্মরূপে ত্যজিলা শরীর	
তান সূত মুঢ় সম	নাম মোর বাহরাম
মহারাজ গৌরব অন্তরে	
পিভাহীন শিশু জানি	দয়া ধর্ম অনুমানি
বাপের খেতাব দিলা মোরে।”	

চট্টগ্রামের শাসনাধ্যক্ষ নিজাম শাহ এই মোবারক খাঁকে দৌলত উজীর বা রাজস্ব মন্ত্রী উপাধি দান করেন। মোবারক খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অল্পবয়স্ক বাহরাম খানের প্রতি করুণাবশে নিজাম শাহ দৌলত উজীর উপাধিটি প্রদান করেন।

কবি প্রদত্ত এই বিবরণ ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড খানার অন্তর্গত 'নিজামপুর পরগণার প্রতিষ্ঠাতা দৌলত উজীর বাহরাম খানের কাব্যে উল্লিখিত নিজাম শাহ শূর ছাড়া আর কেউ নন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নিজাম শাহ শূরের নিকট থেকে বাহরাম খান 'দৌলত উজীর' উপাধি গ্রহণ করেন। তখন তিনি ১৫/১৬ বছরের তরুণ। যদি ধরে নেয়া যায়, ১৫ বছর বয়সেই কবি এ

কাব্য রচনা করেছেন তাহলে রচনার কাল পড়ে ১৫৭৫ খৃঃ-এর দিকে। উঃ হক এ অনুমানের ভিত্তিতে ‘লাইলী মজ্নু’ ১৫৬০ খৃঃ-১৫৭৫ খৃঃ এর মধ্যে রচিত হয়েছে বলে ধারণা করেন।

কবির পূর্ব পুরুষ হামিদ খান বসতি স্থাপন করেন চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ নামক স্থানে। কবির সময়ে চট্টগ্রাম শহর ফতেয়াবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো বলে মনে হয়। বিখ্যাত পারস্য কবি আব্দুর রহমান জামীর একটি জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে—‘লায়লী মজ্নু’।—দৌলত উজ্জীরের গ্রন্থ তারই সারানুবাদ। কিন্তু কবি ক্ষমতাবান, তাই অনুবাদও কাব্য হয়ে উঠেছে :

“বিনি শ্রুতি সুনএ ছামিউ ধরে নাম
বিনি আঁখি দেখএ বসিআ অনুপাম
কর নাহি পদ নাহি নাহি কাএ ছায়া
কামক্রোধ নাহি তান নাহি মোহছায়া।”

আব্দাহর বন্দনায় ইসলামের আব্দাহর ধারণা যেমন চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তেমনি :

“গুণের ঈশ্বরী তুমি জননী বেদনী।
তুমি বিনে নাহি আর দুঃখের দুঃখিনী
ঐ যে মজ্নুবর পরম দুঃখিত
মোহর পিরীতি ভাবে হইছে তাপিত
যখন শরীর তেজি আমি চলি যাই
বারতা জানিব মোর মজ্নুর ঠাই
যার লাগি যেই জনে যত দুঃখ পাএ
এক চিন্তে ভাবিলে সে অবশ্য তারে পায়॥

এ ছত্র ক’টিতে মজ্নুর জন্য লায়লীর যে আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, তাতেও চিরকালের প্রেমিকার ক্রন্দন উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে। মোট কথা ভাবে ভাষায়, আন্তরিকতা তথা কাব্যের আবেদনের দিক দিয়ে ‘লায়লী মজ্নু’ ষোড়শ শতকের বাঙলা সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি।

(চ) হাজী মোহাম্মদ

'নূর জামাল' নামক কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা হাজী মোহাম্মদ বাহুল্যদেশের প্রাচীন কবিদের অন্যতম। শেখ মুস্তাফিজ 'কেফায়তুল মুসল্লিন' রচনা করেন ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পিতা হচ্ছেন—'নূরনামা' ও 'কায়দানী কেতাবে'র রচয়িতা শেখ পরাগ। শেখ পরাগ তাঁর পূর্ব সূরী হিসেবে দুই কবির নাম করেছেন। তাঁদের একজনের নাম হাজী মোহাম্মদ, অন্যজনের নাম সৈয়দ সুলতান। সূত্রাং তিনি যে শেখ মুস্তাফিজের পিতা শেখ পরাগেরও পূর্ববর্তী কবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ যুক্তিতে বলা যায়—হাজী মোহাম্মদ ষোড়শ শতকের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন।

(ক) ছুরত নামার মধ্যে ইমার ছিকাত।

রচিহস্ত হাজী মোহাম্মদ ভালমতঃ

(শেখ পরাগ, কায়দানী কিতাব)

(খ) ফাতিমাকে বিভা কৈল আলি মতিমান।

নবী বংশ রচিহস্ত ছৈয়দ সুলতানঃ

(নূরনামা, —শেখ পরাগ)

এখানে নিশ্চিতভাবে দেখা যাচ্ছে যে হাজী মুহাম্মদ 'ছুরত-নামা' নামক একটা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। অবশিষ্ট কাব্যটির কোন পাড়লিপি আজো পাওয়া যায়নি।

নূরজামাল একটি অভিশয় দার্শনিকতাপূর্ণ কাব্য। সুগভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এতে অতি চমৎকার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার তওবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে তরীকতের কথা। নূর দু'প্রকারের—জামালী নূর ও জামালী নূর। জামালী নূরের উগ্রতা ও তীব্রতা সকলের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, তাই জামালী নূরই কাম্য। জামালী নূর স্নিগ্ধ চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ ও মোলায়েম। নূর জামাল কাব্যের বক্তব্য হচ্ছে এই জামালী নূরের প্রাণ্ডি-রহস্য :

নূরজামালে কহে বাতিনে অনুক্ষণ।

আল্লা পরে আর কিছু না কল্পএ মনঃ

দুনিয়ার সুখে ভোগে মন নহে ভোলা।

হামিশা গাহেব মনে কর ওলামেলাঃ

হক্কেত ছবিআ মন থাকে অনুক্ষণ ।
আপনারে আপনে হারাএ ততক্ষণ।
এইরূপ হাল যদি হইল বান্দার ।
মলকুত হাসিল তবে হইব বান্দার।

কবি বলতে চান খোদা ও বান্দা অভিন্ন, তবু বান্দাকে খোদা বলা যায় না;—এই
তত্বটি অতি চমৎকার ভাষায় কবি বর্ণনা করেছেন :

“এক হস্তে হইল দুই, দুই হস্তে সকল ।
বীজ হস্তে বৃক্ষ যেন, বৃক্ষ হস্তে ফল।
ফল, বৃক্ষ, বীজ এই তিন নাম হএ ।
একে হএ তিন জানি, তিনে এক হএ।
বীজ, বৃক্ষ, ফল হস্তে কেহ ভিন্ন নহে ।
তথাপি ফলের বৃক্ষ কহন না যাএ।
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কাএ ।
তেন রূপে জানিও সে বন্দা আর খোদাএ।
খোদা আর বন্দা জান কিছু ভিন্ন নহে ।
তথাপি বন্দারে জান ন বোলে খোদাএ।
দরিয়ার পানি যেন গৌরসে উথলে ।
গৌররে দরিয়া কেহ কছু নাহি বোলে।”

বিন্দুক্ক সমুদ্রে ঢেউ উঠে, সে ঢেউ সমুদ্র থেকে উঠে আবার সমুদ্রেই লোপ পায় ।
দরিয়ার বাইরে ঢেউএর অস্তিত্ব নেই । তবু ঢেউকে যেমন কেউ দরিয়া বলে না, তেমনি
মানুষের সত্ত্বা আত্মাহুত্ব সত্ত্বায় নিহিত হলেও মানুষকে কেউ বলেনা খোদা ।

বান্দা আর খোদা যদি অভিন্ন হয়, তাহলে তো বান্দার সংগে সংগে খোদারও মৃত্যু
হওয়া উচিত । কিন্তু তা’ হয়না কেন তার জবাব দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :

“সাগরের হস্তে সর্ব ঢেউ জনমএ ।
ঢেউ মৈলে কবো (কছু) সাগর ন মরএ।

টেউ সাগর জেন কিছু ভিন্ন নহে ।
ভেন মতো জানিও বন্দা আর খোদাএ ।”

* * * *

“ফল মৈলে কভু জান গাছ ন মরএ ।
ভেন রূপে জানিও বন্দা আর খোদাএ॥”

* * * *

“বন্দার আচারে কভু খোদা ন পীড়এ ।
বন্দার মরণে কভু খোদা ন মরএ॥”
আছিল, আছিবে সে যে আছে সর্বক্ষণ ।
জন্য মৃত্যু নাহি তার আওনা গমন ।”

পুঁথিটিতে কবির জন্মস্থানের কোনো উল্লেখ নেই। তবু সাহিত্য বিশারদ সাহেব অনুমান করেছেন যে কবি চট্টগ্রামবাসী ছিলেন।

(ছ) মুহম্মদ কবীর

মুহম্মদ কবীর বাঙলা দেশের প্রাচীন কবিদের অন্যতম। আজ পর্যন্ত তাঁর একটি মাত্র পুঁথির দু’টি খণ্ডিত পাতুলিপির খোঁজ পাওয়া গেছে। পুঁথিটি অধ্যাপক জনাব আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বাঙলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। পুঁথিটির নাম ‘মধুমালতী’। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, এ কাহিনী নিয়ে ছ’জন কবি কাব্য রচনা করেছেন—মুহম্মদ কবীর, শাকির মোহাম্মদ, সৈয়দ হাম্জা, গোপীনাথ দাস, মুহম্মদ চুহর ও জোবেদ আলী। ‘চুহরের কাব্যটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। চুহরের ‘আজর শাহ হমন রোখ’ নামক কাব্যে তাঁর ‘মধুমালতী’র উল্লেখ রয়েছে। মুহম্মদ কবীরই এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম।

কবি এ কাব্যটি যে ফারসী থেকে তর্জমা করেছিলেন তার প্রমাণ কবির ভণিতা :

“মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি ।

আছিল ফারসি হন্দ রচিল পাচালি॥”

* * * *

“মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি ।

আছিল ফারসি কিতাব করিল হিন্দুয়ালি ।।”

কবি মুহম্মদ জায়সীর ‘মধুমালতী’র উল্লেখ থেকে বোঝা যায় কাব্যের কাহিনীটি বেশ প্রাচীন এবং এটি একটি ভারতীয় কাহিনী। কাব্যের নায়কনায়িকার নামও এই মতের পরিপোষক। “সরস্বতী বন্দনা, বাঙলা ভাষা অর্থে ‘হিন্দুয়ালি’ শব্দের প্রয়োগ, ভাষার প্রাচীনতা জ্ঞাপক শব্দাবলীর ব্যবহার, কাজী দৌলতের ‘লোরচন্দ্রানী’ কাব্যে কাহিনীটির উল্লেখ এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অসমাক্ষর প্রয়োগ”—ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে মুহম্মদ কবীরকে প্রাচীন বাংলা কবিদের অন্যতম মনে করা হয়ে থাকে। কাব্যটির রচনাকাল সম্বন্ধে দুটি পাদুলিপিতে দু’রকম লেখা হয়েছে :

- (১) “অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গ রএ সিদ্ধু তার পাছ
পাঙালি ভনিতে গেল হিজরীর পাঁচ।”
- (২) “অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ রস বিন্দু তার কাছে।
পাঙালী ভনিতে গেল হিজরীর পাঁচ।”

ডঃ হক শেষোক্ত তারিখের পাঠতত্ত্বি করেছেন নিম্নরূপ :

“অঙ্গ সঙ্গে রহে রস বিন্দু তার কাছ।
পাঙালী ভনিতে গেল হিজরীর পাঁচ।”

এ দুটি পাঠ থেকে যেসব তারিখ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় কাব্যটি ১৪৮৫ খৃঃ এর মধ্যে কোনো সময়ে রচিত হয়ে থাকবে। ডঃ হক যে পাদুলিপির কথা বলেছেন, তার অনুলিখনের তারিখ হচ্ছে—১১০১ মখী বা ১৭৩৯ খৃঃ অঃ। কাজেই, মুহম্মদ কবীর উনিশ শতকের কবি, ডঃ সুকুমার সেনের এই মত টেকে না।

পাদুলিপিতুলি থেকে কবির বাসস্থান সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অন্য কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে চট্টগ্রামের কবি বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে ; কারণ,—সম্পাদিত পুঁথিটি এবং দুটি পাদুলিপিই চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে। ‘মধুমালতী’ কাব্যে চট্টগ্রামে প্রচলিত ‘বহু বিভক্তি, প্রত্যয় ও শব্দ’র ব্যবহার এই অনুমানকেই জোরদার করে।

‘মধুমালতী’র কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ

মনোহর কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা সূর্যভান ও রাণী কমলাসুন্দরীর একমাত্র সন্তান। মনোহর বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর রাজা রাণী তার উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন। একদিন মনোহরকে বাগানে নিদ্রিত অবস্থায় পরীরা দেখতে পায়; তার রূপ দেখে তারা আচ্ছন্ন হয়ে প্রলাপ বক্তে শুরু করে। এমন সুন্দর কুমারের যোগ্য নারী কোথায় আছে? তাদের তখন মনে পড়লো মহারস রাজ্যের রাজা বিক্রম অভিরাম ও তৎপত্নী রূপমঞ্জরীর কন্যা মধুমালতীর কাথা :

“নৌআলি যৌবনি বালি সাজিছে নবরঙ্গে

সোনার পোতলা বেন সূতিছে পালঙ্কে।”

অপূর্ব সুন্দরী সেই কন্যা। তখন তারা মনোহরের পালঙ্কসূত্র তুলে নিয়ে মধুমালতীর পালঙ্কের পাশে রেখে দিল। ঘুম ভাঙলে দুজনেই ‘মনে চিন্তে প্রত্যক্ষ কিবা দেখি এ স্বপন।’ মনোহর ‘এক শশীমুখ দেখে পালঙ্ক উপর।’ তার রূপের জ্বালা সইতে না পেরে মনোহর বেহঁশ হয়ে পড়লো, মধুমালতী অভিভূতের মত তার মাথা নিজ কোলে নিয়ে বসে থাকে। হঁশ ফিরে এলে মনোহর বললো,—

“তন আএ শশীমুখী কমল নয়ান

তোমার অঙ্গের ছন্দে বাঙ্কিলা পরাণ।”

মনোহর অতঃপর নিজের পরিচয় দিলে মধুমালতীও নিজের পরিচয় দিয়ে বলে :

“রাজার নন্দিনী আঙ্গি সর্বলোকে জানে।

পর্যাণে বধিলা মোরে তুয়া অঙ্গ বাণে।

দরশনে পরাণ মোর ধাএ কিবা রএ।

না জানম পরশিলে আর কিবা হএ।”

এরপর পরম্পরের প্রতি পরম্পরের ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে তারা অঙ্গুরী বিনিময় করে, রত্নরসের পর নিদ্রা গেলে পরীরা আবার মনোহরকে পালঙ্কসূত্র তুলে এনে তার নিজ বাগানে রেখে দেয়। তাদের ঘুম ভাঙার পর দু’জনেই অবাক হয়ে ভাবতে থাকে : একি স্বপ্ন-না বাস্তব? মনোহর প্রায় দীওয়ানা হয়ে গেলো। পিতা সূর্যভান তখন তাকে শোক লঙ্করসহ মধুমালতীর খোঁজে পাঠান। পথে শোকলঙ্কর সব মারা যায় এবং

মনোহর গিয়ে পৌছায় এক বনে। সেখানে এক দৈত্য কর্তৃক বন্দি, জটবহর-রাজ ছত্র সেনের কন্যা পায়মার সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। পরমাসুন্দরী পায়মাকে দেখে মনোহর ভাবে :

‘একরূপ লাগি মুঞি হৈলু দেশান্তরী।
আর রূপ চাহে মোর প্রাণ নিতে হরিণী।’

উভয়ের আত্মপরিচয় দানের পর মনোহর জানতে পায় পায়মা মধুমালতীর সখী। পায়মার সাহায্যে দৈত্যকে বধ করে মনোহর পায়মার পিতৃরাজ্য জটবহরে আসে। এখানে মালতী ও মনোহরের মিলন স্বচক্ষে দেখে রূপমঞ্জরী সুন্দরী মালতীকে একটি শুক-পাখী বানিয়ে ছেড়ে দেয়। সেই শুক ‘মাণিক্য রস’ রাজ্যের রাজা তারা চাঁদের হাতে ধরা পড়ে; মালতীর পিতা রাজা বিক্রম অভিরাম শুক-রূপিনী মালতীকে চিনতে পারেন এবং তারা চাঁদের মুখে মনোহরের সঙ্গে কন্যার প্রণয় কাহিনী জানতে পেরে তাকে আনিয়ে তার হাতে মালতীকে সঁপে দেন এবং তারাচাঁদের সাথে পায়মারও বিয়ে হয়ে গেলো। মনোহর প্রথম দর্শনের পর মালতীকে বলে :

‘তোক্ষা আক্ষা ললাটে লেখিছে পূর্বকালে
তে কারণে তুক্ষি আক্ষি হৈছি এক মেলে।
ন জানম কোন হেতু আইলু তুম্মা পাশ
এক তিল তুক্ষি বিনে জীবন নৈরাশ।’

আর তার জবাবে মধুমালতী বলে :

‘তুক্ষি আক্ষি তুই তনু প্রাণি এক জ্ঞান
সদা এ ইউক প্রেম ইউক কল্যাণ।
এ রূপ বৌবন তোক্ষা পদের নিছন।
তুক্ষি তরু, আক্ষি লতা সর্বাসে জড়ন।’

দু’য়ের পরিণয়ে সেই ললাটের লিখন হলো সার্থক। পুঁথিটির ঘটেছে একটি মিলনান্ত পরিণাম।

ভাষা, চরিত্র সৃষ্টি, বর্ণনা ভঙ্গী ও পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্যে মুহম্মদ কবীর একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পরিমিত বোধ ও সংযম, উপমা

অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ, ঘটনা বিন্যাস, আবেগ অনুভূতির স্থান-কালোপযোগী চিত্রণ— ইত্যাদির বিচারে তিনি সত্যিকার সৃজনী-প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বর্ণনা চিত্রধর্মী, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সংকুত অলংকার শাস্ত্রের ব্যাপক অনুকরণ সুস্পষ্ট।

চর্চাপদ থেকে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত (আঃ ৮ম শতক থেকে ১৮০০ খৃঃ অঃ পর্যন্ত) যত কাব্য কবিতা হিন্দু কবিরা সৃষ্টি করেছেন, তাতে মানুষের কাহিনী গৌণ বা আনুষঙ্গিক মাত্র, দেবতা বা অবতারই কাব্যের নায়ক। মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানেরাই বৈচিত্র্য দান করেন; সব রকমের বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁরা কাব্যরচনা করেন, ধর্মের শাসনমুক্ত নেহায়েত মানব জীবনের চিত্র পরিবেশনের জন্যও মুসলমান কবিরাই দায়ী। মুসলিম কবিদের উৎকৃষ্ট কাহিনী কাব্যগুলো এই সময়েই রচিত। মুহম্মদ কবীরের ‘মধুমালতী’ এগুলির অন্যতম।

(জ) শ্রীধর

একখানি অতি প্রাচীন ‘বিদ্যা সুন্দরের’ রচয়িতার নাম শ্রীধর। তার উপাধি কবিরাজ। তার দু’খানি মাত্র অসম্পূর্ণ পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবু, তাঁর কাল নির্ণয়ে তেমন কোন অসুবিধা নেই। তাঁর রচনার মধ্যে গৌড়ের সুলতান হোসায়ন শাহের পৌত্র এবং নসরত শাহের পুত্র ফিরোয শাহের উল্লেখ আছে। পদকার সৈয়দ আকজলও তাঁর কাব্যে এই ফিরোজ শাহ’র উল্লেখ করেছিলেন। ১৫৩২-৩৩ খৃঃ-এ মাত্র কয়েক মাসের জন্য তিনি তথ্যে বসেন। ফিরোয শাহ কোথাও রাজা, কোথাও বা যুবরাজ বলে এ কাব্যে উল্লিখিত হয়েছেন। সম্ভবতঃ ফিরোয যখন যুবরাজ তখনই শ্রীধর তার কাব্য রচনা শুরু করেন এবং তার সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালেই কাব্যটির রচনা সমাপ্ত হয়। এই যুক্তিতে বলা যায়, ১৫৩৩ খৃঃ-এর মধ্যেই কাব্যখানির রচনা শেষ হয়ে থাকবে।

কবির খণ্ডিত পুঁথি দুটিতে কোনো কোনো ভণিতায় তিনি নিজেকে ‘বিজ্ঞ’ বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই তিনি ব্রাহ্মণ বংশীয় হতে পারেন। আর কোনো পরিচয় কাব্যটিতে নেই। তার পুঁথি দুটিই “চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে : অতএব অনুমান করা যেতে পারে, তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।” —(আবতোষ ভট্টাচার্য)

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী রচনায় শ্রীধর অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করেছেন। শ্রীধরের কাব্যে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার, মাতার নাম কলাবতী। সুন্দরের পিতৃরাজ্যের নাম বিজয়নগরী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতার নাম বীর সিংহ, মাতার নাম শীলা দেবী, রাজধানীর নাম কাঞ্চী। শ্রীধরের রচনায় পাণ্ডিত্য আছে, কবিত্ব নেই। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যার রূপ বর্ণনা, বিদ্যাসুন্দরের কবিদের মধ্যে একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো অনেক আগে থেকেই। শ্রীধর এই প্রথারই অনুসরণ করেছেন :

‘নবীন ঘনের পুঞ্জ যেন কেশভার ।
 ধরশী বিলোচায় সে লম্বিত অপার।
 বিদ্যার বদনশশী যেন অববাহা ।
 খঞ্জন জিনিয়া দুই নয়নের ছন্দা॥
 উহার ললাট যেন আখশশী খন্ড ।
 অধর বাহুলি যেন মুখ রসভাভ।
 দশন মুকুতাপীতি বাক্য মধুপান ।
 ভুরুভঙ্গে কামদেব ধনুর সমান॥
 গ্রীবাখন্ড দেখি শংখ জলধি প্রবেশ ।
 মদনমোহন বিদ্যা যৌবন বিশেষা’

(ক) সৈয়দ সুলতান

(১৫৫০-১৬৪৮)

সৈয়দ সুলতানের জন্ম ও কর্মস্থান নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। বাঙলার প্রাচীনতম কবিদের অন্যতম এই কবিকে কেউ কেউ চট্টগ্রামের আবার কেউ কেউ সিলেটের বলে দাবি করেন। কবির ‘শব-ই-মেরাজ’ নামক গ্রন্থে কবির যে আত্মপরিচয় আছে, তাতে কবি লিখেছেন :

“সকলের পুরখানি আলিম বসতি
 মুক্তি মুখ আছে এক আলিম সত্ততি।”

কেউ কেউ দাবী করেন এই লক্ষেরপুর হচ্ছে সিলেট জেলার হবিগঞ্জের লক্ষেরপুর। 'তারিখ-ই-ইসলামে বর্মা ও আরাকান' নামক উর্দু ঐতিহাসিক গ্রন্থে মোহাম্মদ খলিলুর রহমান হৈয়দ সুলতানকে ক্বাইমের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। ক্বাইম আরাকানের লামেউ নদীর তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। ডঃ এনামুল হক মনে করেন—এই লক্ষেরপুর হচ্ছে লক্ষের পরাগল খাঁর পরাগলপুর। পরাগলপুর তখন উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী স্থান। পীর মুরিদি উপলক্ষে হৈয়দ সুলতান সাময়িকভাবে পরাগলপুরে বাস করতেন। সেখানে থাকাকালেই তিনি 'শব-ই-মে'রাজ' রচনা করেন। ডঃ হক এবং মরহুম সাহিত্য বিশারদ মনে করেন সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালার অধিবাসী ছিলেন। 'তলে-বকাশ্শী'র কাব্যকার মুকিম তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন :

"চক্রশালা ভূমি মধ্যে পীরজাদা ধাম

সৈয়দ সুলতান বংশ শাহাদুয়া নাম"

* * * *

"সবে প্রণমিব আমি পূর্ব কবিজ্ঞান

পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান।"

মুকিমের এই উক্তিতে ধারণা হয় যে কবি চক্রশালার অধিবাসী ছিলেন। 'মুক্তল হসেন' (১৬৪৮) নামক কাব্যের রচয়িতা মুহম্মদ খান সৈয়দ সুলতানের সাগরেদ ছিলেন। এ কাব্যের এজিদের উত্তর নামক অংশটি 'মুজ্জফফর' নামক আর এক কবির রচনা। এতে মুজ্জফফর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :

"ছোলতান দৌহিত্র চক্রশালা ঘর

কহে হীন মুজ্জফফর এজিদ উত্তর।"

কবি মুকিম ও কবি মুজ্জফফরের এই সব উক্তি থেকে ডঃ হক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সৈয়দ সুলতান পটিয়া খানার অন্তর্গত চক্রশালারই বাসিন্দা ছিলেন। পীরী মুরীদি উপলক্ষে মাঝে মাঝে তিনি পরাগলপুর অবস্থান করতেন। কিন্তু সম্প্রতি অধ্যাপক আসফর আলী, অধ্যাপক বতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য ও ডঃ মবহারুল ইসলাম প্রমাণ করেছেন—কবির জন্মস্থান সিলেটের ডরফ পরগনার লক্ষেরপুর।

কবি সৈয়দ সুলতানের 'শব-ই-মে'রাজ' নামক কাব্যটি ১৯১৪ হিজরীতে রচিত হয় বলে ডঃ শহীদুল্লাহ ও ডঃ হকের ধারণা। এর মানে কাব্যটি রচিত হয় ইংরেজি ১৫৮৬ সালে। কবির সাগরেদ মুহম্মদ খান গুরুর আদেশে 'কিয়ামত নামা' কাব্য রচনা করেন ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে। মুহম্মদ খানের প্রথম কাব্য 'সত্য কলি-বিবাদ সংবাদ'-এর রচনাকাল ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ। প্রথম কাব্য রচনাকালে কবির বয়স ৩৫ বছর ধরে ডঃ হক কবি মুহম্মদ খানের জন্ম ১৬০০ খৃঃ বলে অনুমান করেছেন, তখন সৈয়দ সুলতানের-বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। অর্থাৎ এই হিসাব অনুসারে সৈয়দ সুলতানের জন্ম ১৫০০ খৃঃ এবং 'কিয়ামত নামা' রচিত হবার আনুমানিক দু'বছর পরে, ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ধরা যেতে পারে। এতো দীর্ঘ পরমায়ু প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কারো কারো মতে সৈয়দ সুলতান আরো পরবর্তীকালের কবি হওয়া বিচিত্র নয়। সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থসংখ্যা সম্পর্কে আজো নিশ্চিতরূপে কিছু বলবার উপায় নেই। এখন পর্যন্ত তাঁর নিম্নলিখিত রচনাগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে :

(১) 'নবী বংশ' (২) 'শব-ই-মে'রাজ' (৩) 'রসুল বিজয়' (৪) 'ওফাত-ই-রসুল' (৫) 'জয়কুম রাজার লড়াই' (৬) 'ইবলিস-নামা' (৭) 'জ্ঞান চৌতিশা' (৮) 'জ্ঞান প্রদীপ' (৯) 'মারফতী গান' (১০) 'পদাবলী'। জনাব আহমদ শরীফের মতে সৈয়দ সুলতানের মোট রচনা হচ্ছে তিনটি (১) নবী বংশ, (২) জ্ঞান প্রদীপ ও (৩) অধ্যাত্ম সঙ্গীত। সৈয়দ সুলতানের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য হচ্ছে নবী বংশ। কাব্যটি ১৫৮৪-৮৬ খৃঃ-এ রচিত হয়। বিষয় মাহাত্ম্যে ও পরিকল্পনার বিরাটত্বে এ কাব্যটিকে একটি মহাকাব্য বলে অত্যাক্তি হয় না। হজরত আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম ধারার একটি সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করবেন এ ছিলো কবির পরিকল্পনা।

কিন্তু বার্বক্য বশত 'ওফাতই-রসুল' রচনা করার পর কবিকে ক্লান্ত দিতে হয়। কবির সাগরেদ মুহম্মদ খান মুক্তল হোসেন রচনা করে মুর্শিদের আরক্ত কার্য সমাপ্ত করেন। কবি এ কাব্যে আরবী নবী শব্দের তর্জমা করেছেন সংস্কৃত 'অবতার' শব্দধারা। কবি ইসলামের তৌহীদবাদ বা নিরাকার আদ্বাহর নিরংকুশ একত্ববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই অবতার শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাঁর নবী বংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবতার বা নবীরূপে চিত্রিত হয়ে, সাম, বজ্র, ঝক এবং অর্ধ এই চারিটি আসমানী কেতাব লাভ করেছেন—যা বেদ তাই শ্রুতি, তাই আসমানী কেতাব বটে (ডঃ হক)। আল কোরআনে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যাদের মধ্যে ধর্ম প্রবর্তক পাঠানো হয়নি ও প্রত্যেক সমাজেই সতর্ককারী পাঠানো হয়েছে এবং হজরত

মোহাম্মদ (দঃ)-এর আগে আব্রাহাম খ্রিষ্টিয় য়েসব নবী ও পরগণর ধরাধামে এসেছেন তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মমত যে ইসলাম, এ শিক্ষা কোরআনেরই। নতুনত্ব এখানে যে পূর্ববর্তী কেতাবগুলো বিকৃত হয়ে পড়ায় নতুন করে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদকে আল কোরআনসহ পাঠানোর দরকার হয়েছে। মনে হয় কবি যেন এই বিশ্বাসেরই বশবর্তী হয়েই শ্রুতি ও বেদকে আসমানী কেতাব বলে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। সকল বেদেই যে রসুলের কথা আছে এ সম্বন্ধে কবির উক্তি নিম্নরূপ—

‘এই চারিবেদে সাক্ষী দিচ্ছে করতার
অবশেষে মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার।’

হাল আমলের বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডঃ আবদুল হক বিদ্যার্থী ‘Mohammad in the world Scriptures’ নামক একটি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

ইসলামের আদর্শ ও মাহাত্ম্য প্রচারই যে কবির উদ্দেশ্য ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর আক্ষেপের যে—

বুদ্ধদে পরগণর খনন আঙ্কায় শিরে এরি
কবীন্দ্র ভাষাত কথ্য কহিল বিচারি
হিন্দু মুসলমান ওত্র খরে খরে পড়ে
খোসা রসুলের কথা কেহ না পেলেওরে।

খোসা রসুলের কথা প্রচারই ছিলো কবির উদ্দেশ্য। এদের সন্দেহ নবী বংশে রচনা সম্বন্ধে কবি বলছেন :

‘কহে বৈদ্য মূলতান ওত্র এও
এই মত নবী বংশ পুরা দিয়া
আছিল আরবী ওত্র হিন্দুয়ানী বক্ত
বঙ্গদেশি বৃক্ক মত এওত্রিয়ানি দিক
নবুখি আরবির শূদ্র জাতি না পাবন
হিন্দুয়ানি ওত্র এওত্রিয়ানি।’

বোঝা যাচ্ছে কবি কোনো আরবী গ্রন্থাবলম্বনে এ কাব্য রচনা করেছেন। মূল আরবী থেকে ছবছ অনুবাদ যে এ কাব্য নয়—তার প্রমাণ এতে বহু অমুসলিম উপকথা ও কাহিনীর সমাবেশ। কিন্তু কবির লক্ষ্য সঘনো কোনো সংশয় নেই—বাঙলা ভাষার বাঙালী পাঠকদের মধ্যে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারই তাঁর উদ্দেশ্য। জগৎ সৃষ্টির কাল্পনিক কাহিনীতে কাব্যটির সূত্রপাত এবং রসুলের আবির্ভাবে তার সমাপ্তি। নবী বংশের পন্থিকল্পনা সম্পর্কে কবির নিজের উক্তিটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

“যে রূপে সৃজন হৈল এতিন ডুবন
 যে রূপে সৃজন হৈল সুরাসুর গণ
 যে রূপে আদম হাওয়া সৃজন হইল
 যে রূপে যতেক পয়গম্বর উপজিল
 বংগেত এসব কথা কেহ ন জানিল
 নবী বংশ পাঁচালীতে সকলি গুনিল।”

— ‘শব-ই-মে’রাজ্’

নবী বংশের বিষয়বস্তুতে কল্পনার অবাধ লীলার অবকাশ নেই। তথাপি ভাব, কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ ও ছন্দ সুসমার দিক দিয়ে কাব্যখানি মধ্যযুগের সাহিত্যে এক অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আদম হাওয়ার বিচ্ছেদ বর্ণনায় কবি যে ভাষা, উপমা, অলংকার ব্যবহার করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

“জ্যৈষ্ঠ মাসেতে ভেল তাপিত র পন
 কলুরী অঙ্গে লাগে হুতাশন
 দক্ষিণ সমীর ঘোর শমন সমমন
 অনল হৈয়া নিতি সগরে পবন ইত্যাদি—

নবী বংশের তৃতীয় পর্ব—আকারে প্রায় ১৫৮৫-৮৬ খৃঃ এ রচিত হয়। হজরতের মে’রাজ্‌র বর্ণনায় উল্লেখ্য, তব্‌ কাবি হজরতের জন্ম থেকে আরম্ভ করে মে’রাজ্‌ পর্যন্ত বহু ঘটনা কবির কাব্যে স্তম্ভিত করেছেন। ফলে, কাব্যটি বিষয় বৈচিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে জায়েদুল আকবর হাওয়ার মতো বহুদিক দোষ দর্শন, বিভিন্ন আসমানের মতো পর্ব ফেঁসে পড়ার মতো সমস্যা, জিব্রিলের মোলাকাত, ছরী বা বিদ্যাধরীগণের দর্শন প্রভৃতি বর্ণনা

নবী বংশের দ্বিতীয় পর্ব : 'রসুলবিজয়' নামক এই সুবৃহৎ কাব্যটিতে হজরতের ইসলাম প্রচার ও যুদ্ধ বিগ্রহাদির মাধ্যমে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারই হচ্ছে কবির উদ্দেশ্য। জৈনুদ্দীনের 'রসুল বিজয়' নামক কাব্যের সঙ্গে এ কাব্য তুলনীয়। দুটি একই জাতীয় কাব্য।

নবী বংশের চতুর্থ পর্ব হচ্ছে—'ওফাত-ই-রসুল'। এই সংক্ষিপ্ত কাব্যটিতে, ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর রসুলের ভিরোভাব এবং 'খোলাফায়ে-রাশেদা'র চার খলিফার আমলের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সৈয়দ সুলতান ইসলাম ধর্মের বিবরণ ও বিজয় বার্তা প্রচারের জন্য তাঁর কবি কর্মের যে পরিকল্পনা করেছিলেন 'নবী বংশ' 'শব-ই-মে-রাজ' ও 'রসুল বিজয়' প্রসঙ্গে তা আলোচিত হয়েছে। 'ওফাত-ই-রসুল' পাঠে জানা যায়, চার আছহাবের কাহিনী, মহররমের ঘটনা এবং কেয়ামত এই তিন বিষয়ে আরো তিনটি বিশদ কাব্য রচনা তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে ছিলো, কিন্তু বার্বক্য বশত কবির সে স্বপ্ন সফল হয়নি। 'ওফাত-ই-রসুল' পর্যন্ত লিখেই কবি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর কবি জীবন শেষ হয়েছে, তাঁর দৃষ্টি ক্ষমতা নিঃশেষিত। তাই কবি তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সমাধার জন্য তাঁর প্রিয় সাগরেদ মুহম্মদ খানকে নির্দেশ দান করেন। 'ওফাত-ই-রসুলে' পূর্বের কাব্যগুণ না থাকলেও বিষয় মাহাত্ম্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য।

'জয়কুম রাজার লড়াই' নামক পূর্বাংশটি জয়কুম নামক কোন বিধর্মী নৃপতির সঙ্গে হজরত মুহম্মদ মোস্তাফা ও হজরত আলীর লড়াই বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব আছে। 'ইবলিস-নামা' নামক ক্ষুদ্র পূর্বাংশটি আদ্যন্ত পয়ার ছন্দে রচিত। নবী বংশ রচনা করে কবি নবীর মহিমা প্রচার করেছেন, সত্য, পুণ্য ও মঙ্গলের জয় গান করেছেন। আর ইবলিস-নামা রচনা করে শয়তানের 'অবশ' ঘোষণা করেছেন :

“পয়গাম্বর সবে মাহিমা প্রচারিলুং
পাপমতি ইবলিসের অবশ ঘোষিলুং।”

এছাড়া কাব্যটিতে একটি নীতি কথাও আছে। গুরুর মর্যাদা সকলের উপরে, পীর বা গুরুর আচরণ নিন্দনীয় হলেও তিনি শ্রদ্ধা ডঙ্কির পাত্র—আর অহঙ্কার হচ্ছে পতনের মূল—ইবলিস-নামায় কবি এ নীতি কথাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কবির অতি অল্প বয়সের রচনা 'জ্ঞান-চৈতিশা' যোগ কলঙ্কর শ্রেণীর রচনা—এ রচনা অতিশয় অপরিণত। 'জ্ঞান-প্রদীপ'ও একই শ্রেণীর গ্রন্থ, তবে এ গ্রন্থ তাঁর পরিণত বয়সের রচনা—এতে সুকীর্বাদ ও যোগের অঙ্কিত মিশ্রণ ঘটেছে, যে নিজেকে চিনে সেই আত্মাকে চিনে, মুকীদের এই উক্তি 'জ্ঞান প্রদীপে'র ভিত্তি।

এসব ছাড়াও দরবেশ কবি সৈয়দ সুলতান রচিত বহু মারেকতী গান এবং ঋণ কবিতাও রয়েছে। কিছু কিছু ঋণ কবিতা রাগমালা বা গান সংগ্রহে রক্ষিত হয়েছে। সৈয়দ সুলতান ছিলেন একাধারে কবি, দরবেশ, তত্ত্বজ্ঞানী, সঙ্গীতবিদ এবং ইসলামের সচেতন প্রচারক। কবির কাব্যে হিন্দু উপাদান দেখে সমকালীন গোড়াপন্থীরা তাঁকে মোনাফেক মনে করলেও কবি তাঁর লক্ষ্যে অবিচলিত ছিলেন। এদিক দিয়ে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি নজরুলের সঙ্গে তার মিল লক্ষ্যণীয়।

(এ) শেখ পরাণ

শেখ পরাণের দু'খানা ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া গিয়েছে। কবির স্থান ও কাল সম্পর্কে তার নিজ কাব্যে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। কাব্য দুটির একটির নাম 'কায়াদানি কেতাব' আরেকটির নাম 'নূরনামা'। কবির কাব্যে তার কাল সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না থাকলেও তাঁর পুত্রের কাল থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। কবির পুত্রের নাম শেখ মুত্তালিব, তিনিও কবি ছিলেন। শেখ মুত্তালিব 'কিফায়তুল মুসল্লিন' নামক কাব্যের রচয়িতা। এই কাব্যের ভণিতা এইরূপ :

“কিফায়তুল মুছল্লিন শুন দিয়া মন
বঙ্গ ভাষে কহে শেখ পরাণ নন্দন।”

শেখ পরাণের পুত্র কবির শেখ মুত্তালিব তাঁর 'কিফায়তুল মুসল্লিন' রচনা করেন ১০৪৯ হিজরীতে, ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে। কবির কাব্য পাঠে জানা যায় শেখ মুত্তালিব অতি অল্প বয়সেই তাঁর পিতাকে হারান এবং মৌলভী রহমতুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক লালিত পালিত হন। ১৬০০ খৃঃ-এ শেখ মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণ জীবিত ছিলেন, তা বিনা বিধায় অনুমান করা যেতে পারে।

শেখ মুত্তালিবের উক্তি থেকে জানা যায়, কবির বাসস্থান ছিলো চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড গ্রামে।

“সীতাকুন্ড গ্রাম শেখ পরাণ সূজন
তাহার নন্দনহীন মোত্তালিব জান।”

—‘কিফায়তুল মুসল্লিন’

‘কায়দানি কেতাবে’ মুসলমানদের নিত্য আচরণীয় ১৩০ ফরজের বর্ণনা আছে। রসুলের চারি কুর্সি, চারি মজহাব এবং সত্ত্ব ঈমানও আলোচিত হয়েছে। কবির কাব্যে এক জায়গায় পূর্ববর্তী কবি হাজী মুহাম্মদ ও তাঁর ‘সুরত নামা’র উল্লেখ আছে।

“ছুরতনামার মধ্যে ইমার ছিফত

কহিছন্ত হাজী মোহাম্মদ ভালমত।”

শেখ পরাণ এ কাব্য রচনা করেছিলেন ফারসী কেতাব দেখে। ‘নূর নামা’ কাব্যটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। বিষয় সৃষ্টি পশুন; কবির নিজের উক্তি :

“কী উপাএ করিমু নবী কহত আমার
হেতু বুদ্ধি কহ পক্ষ কর্ণ করিবার
আলির এতেক কথা রসুল সুনিয়া
একে একে কহে নবী সমাজে বসিয়া
রসুলে বুলিল আলি সুন তত্ব সার
বিছয়াল কুতুবা পক্ষ কর্ম করিবার
ছুরত ফাতেহা যদি পড় তিনবার
জেহেন করিলা দান একাদশ নর।”

নূরই-মুহাম্মদীর সৃষ্টি এবং তা থেকে অন্য সকল বিষয়ের সৃষ্টিকথা কবিত্বহীন ভাষায় আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম আমলের কবি ও কাব্য পরিচয় (৩)

সপ্তদশ শতক

(ক) মোহাম্মদ নসরুল্লাহ (খাঁ)

এই কবির চারখানা গ্রন্থের খবর পাওয়া গেছে। কাব্যগুলির নাম (১) জংগ-নামা (২) মুসার সওয়াল (৩) শরীয়ৎ নামা ও (৪) হিদায়িতুল ইসলাম।

কবি নসরুল্লাহ প্রাচীন বাঙালী মুসলিম কবিদের অন্যতম। জংগ-নামা ও শরীয়ৎ নামা উভয় কাব্যেই কবির সুদীর্ঘ আত্মবিবরণী রয়েছে। শরীয়ৎনামায় লিপিবদ্ধ আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, কবির পূর্বপুরুষ হামিদুদ্দীন খান গৌড় দরবারের অমাত্য ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর পুত্র বুরহান উদ্দিন রাজরোষে পতিত হন এবং “অষ্ট মিত্র সংগে করে” চট্টগ্রামে আরাকান অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আধুনিক দক্ষিণ চট্টগ্রামের ‘বাহার ছড়াহ’ নামক স্থানে তিনি বসতি স্থাপন করেন।

‘তখন রোসাংগ দেশে

কিবা আদ্য কিবা শেষে

অথ আসোয়ার না আছিল’

বুরহান উদ্দীন প্রথমে লঙ্কর উজীর নিযুক্ত হন। তিনি রোসাংগে সর্বপ্রথম অস্বারোহী বাহিনীর প্রবর্তন করেন এবং তিনি নিজে ও তার অধস্তনঃ কয়েক পুরুষ অস্বারোহী সৈন্যদলে উচ্চপদে নিযুক্ত থাকেন। কবি নসরুল্লাহ ছিলেন নিঃসন্ধান, কিন্তু তাঁর পিতৃব্যের বংশধরেরা আজো বাঁশখালি ধানার জলদি গ্রামে বাস করছেন। তাঁর কাব্যে সন্দীপ বিজয়ী ফতেহ খানের (১৬০৯ খৃঃএ জীবিত) উল্লেখ আছে, বংশতালিকা দৃষ্টে এবং এই উল্লেখ মনে হয়, কবি ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। ৬৪ হকের মতে কবির বাসস্থান ছিলো রাম অঞ্চলে।

‘মুসার সওয়াল’-এ কৃষ্ণ-ই-তুরে হযরত মুসার সংগে আন্তাহর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের ভাষার নমুনা নিম্নে দেয়া হচ্ছে :

“প্রথমে প্রণাম করি প্রাণের ঈশ্বর
ঘটে প্রাণ রাখি ভক্ষ্য জ্ঞোগাএ নিরন্তর
আপনা সখার রূপ সৃষ্টি নিজ গায়
চক্ষু নিজ জ্যোতি দি মুখেত দিলা রায়
জিহ্বা দিলা নাড়ি নিতি লৈতে তান নাম
কর্ণ দিলা শুনিবারে তাঁহার কালাম।”
কাব্যখানি ঐ নামীয় কোনো ফারসী কাব্যের তর্জমা।

জংগনামা কাব্যটি কবির প্রথম জীবনের কাব্য বলে মনে হয়। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও হযরত আলীর বিজয় কাহিনীই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। প্রত্যেক যুদ্ধেই বিধর্মী রাজাদের পরাজয় ও তাদের ইসলাম গ্রহণ প্রদর্শিত হয়েছে। ভাষা কবিত্ব বর্জিত, তাহাড়া বহু অলৌকিক কাহিনীতে পুঁথিটি পরিপূর্ণ। ইসলামে ‘আমর ও নেহী’ পালনীয় ও বর্জনীয় কী কী তারই বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কবির ‘শরীয়ৎ নামায়’। কবির এই পরিণত বয়সের রচনাটিতে একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত মুসলিমের চরিত্র ফুটে উঠেছে :

“মুসলমান মুসলমানী কর্ম না করিলে
মুসলমান নহে হেন শাস্ত্র মাঝে বলে
আমর আর নিহী যত আছে শরীয়তে
সার সব কহি আমি গুন রংগ চিতে
আমার হুকুমে যত আমার বোলয়
মানাষেরে নিহী বলে আরবী ভাষায়।”

‘হিদায়িতুল ইসলাম’ও একই জাতীয় বস্তু। মুসলমানকে অমুসলিম ও শরীয়ৎ বিরোধী আচার অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেয়াই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। লিপিকরের দোষে কাব্যখানি অনেক স্থলেই অপাঠ্য এবং অবোধ্য। সেকালে মুসলমানদের বিয়েতে পাশা খেলা হতো ‘মারোয়া’ তৈরি করে সেখানে দুল্হা দুল্হীনকে গোসল করানো হতো। এসব কাজই এ কাব্যে অনৈসলামিক ও অপকর্ম বলে নিন্দিত হয়েছে।

(খ) মুহম্মদ খান

হেয়দ সুলতানের কাব্যলোচনা প্রসংগে তাঁর সাগরেদ মুহম্মদ খানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নবী বংশের 'ওফাতই রসুল' পর্যন্ত লিখে হেয়দ সুলতান বার্ষিক্যবশত লেখার ক্রান্তি দেন এবং তাঁর শিষ্য মুহম্মদ খানকে কাব্যের বাকী পর্বগুলো লিখতে তাগিদ দেন। কবি মুহম্মদ খান তাঁর 'মুক্তল হোসেন' কাব্যে সুদীর্ঘ আশ্রয় পরিচয় দিয়েছেন। তা'ছাড়া 'সত্যকলি বিবাদ বিসংবাদ' ও 'মুক্তল হোসেন'-এও কবির কাব্য রচনার তারিখ পাওয়া যায়। 'সত্যকলি বিবাদ বিসংবাদ' ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ও 'মুক্তল হোসেন' ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। তাই কবির কাল সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নেই। মুহম্মদ খান সপ্তদশ শতকের কবি এবং তিনি চট্টগ্রামের অধিপতি রাস্তিখানের বংশধর; তাঁর জন্মস্থান খুব সম্ভব হাটহাজারী থানার জোব্বা গ্রাম। জোব্বা গ্রামে রাস্তি খানের মসজিদে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে জানা যায় রাস্তি খান গৌড়ের সুলতান রকনউদ্দিন ওরফে শাহের (১৪৫৯-৭৬) পদস্থ কর্মচারী বা তাঁর চট্টগ্রাম অধিকারের শাসনকর্তা ছিলেন। কবির আদি পুরুষ হচ্ছেন শাহী আসোয়ার (আনুঃ ১৩৩৯-৪৫ খৃঃ)। তিনি আরবের সিদ্ধিক বংশজাত। পীর হাজী খলীলের সংগে তিনিও চট্টগ্রামে আসেন। রাস্তি খান মাহী আসোয়ারের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ এবং মুহম্মদ খান রাস্তি খানের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। সম্ভবত রাস্তি খানের পরাগল খান ছাড়াও মিনাখান নামে আরেক পুত্র ছিলেন, মুহম্মদ খান হয়তো এই মিনা খানেরই বংশধর।

মুহম্মদ খানের প্রথম দুটি কাব্য, 'সত্যকলি বিবাদ বিসংবাদ' ও 'হানিফার লড়াই'- কবির অপরিণত বয়সের রচনা এবং সৈয়দ সুলতানের শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বেই রচিত বলে অনুমিত হয়। এ দুটি কাব্যের ভণিতায় পীরের কোনো উল্লেখ নেই। কবির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মুক্তল হোসেন'। কিয়ামত নামা' মুক্তল হোসেনরই একাদশ পর্ব। 'দজ্জাল নামা' কিয়ামত নামার অংশ; কিন্তু পৃথক গ্রন্থরূপে প্রচারিত। 'কাসেমের লড়াই' মুক্তল হোসেনের অংশ কিন্তু পৃথক গ্রন্থরূপে প্রচারিত। 'আস্হাব নামা' মুক্তল হোসেনের অংশ কিন্তু কোন পৃথক গ্রন্থ নয়।

হেয়দ সুলতান বার্ষিক্যের দরুন নিজের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবার ভার প্রতিভাবান শিষ্য মুহম্মদ খানকে দিয়েছিলেন—এ সম্বন্ধে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্যঃ

“নবী বংশ রচিছিল পুরুষ প্রধান

আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান

রসুলের ওফাতে রচিয়া ন রহিলা
 অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা
 তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলি
 চারি আছাব্বার কথা কৈলু পদাবলি
 দুইভাই বিবরণ সমাণ্ড করিয়া
 প্রলয়ের কথা সব দিনু প্রচারিয়া
 অস্তে পুন বিরচিনু প্রভু দরশন
 ইহা হস্তে ঠিক কথা নাকি কদাচন
 দুই পাঞ্চালিকা যদি একত্র করয়
 আদ্যের অস্তের কথা সন্ধি তবে হয় ।”

(কিয়ামত নামা)

শাহা সুলতান পীর কুপার সাগর
 সেবক বৎসল প্রভু গুনে রন্তনকর
 তাহান আদেশ মাল্য শিরেত ধরিআ
 মুহম্মদ খানে করে পাঞ্চালী রচিয়া ।”

(মুক্তল হোসেন)

‘ওফাত-ই-রসুল’ এবং ‘মুক্তল হোসেন’ এ দুটি কাব্য একত্র করলেই কবির মতে পূর্বাপর একটি সৰ্বক রক্ষিত হয়। কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ‘মুক্তল হোসেন’ বা হোসেন বধ। নামের মধ্যেই বক্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে। মূলত কারবালার হৃদয়-বিদারক কাহিনী বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য কিন্তু কার্যতঃ এতে রসুলের চারি আস্হাব থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে কবির সুদীর্ঘ আত্মপরিচয় আছে। গ্রন্থটির পর্ববিন্যাস সম্পর্কে লেখকের নিজের পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

“আদি পর্বে ফাতিমার বিবাহ কহিব
 দুই ভাইর জন্ম তবে পাছে বিরচিব
 কহিব দুস্তিঅ পর্বে স্তন দিআ মন
 চারি আছাব্বার কথা শান্তের নিধান ।”

কহিব তৃতীয় পর্বে হাছনের বাণী
 জনবকে বিবাহ করলি মনে গুণি
 চতুর্থে মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন
 কহিব পঞ্চম পর্বে জুহু অবসেস
 ষষ্ঠমে হোচন পর্ব কহিব সে পাছে
 সপ্তমেত স্ত্রীপট কহিবাম পুনি
 অষ্টমেত দূত পর্ব শুন দিয়া মন
 নবমে অলিদ পর্ব শুন গুণিগণ
 দশমে এজিদ পট কহিবাম আগে
 একাদশ পর্ব তবে পচাতে কহিব
 প্রলয় হইতে যেন আনন্দ হইব ।”

(মুক্তল হোসেন)

‘মুক্তল হোসেন’ কাব্যটির রচনার তারিখ গ্রন্থ মথ্যেই আছে। এ কাব্যটি ১৬৪৫ খৃঃ
 রচিত ‘জংগনামা’ নামে এই পুঁথিটিই বটতলায় ছাপা হয়ে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মনে
 একটা শোকাবহ করুণ রস বিস্তার করে রেখেছে। কাব্যটি আকারে বৃহৎ এবং মুহম্মদ
 খানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাও বটে। এই বই গ্রামাঞ্চলে আজো ঘরে ঘরে পঠিত হয়।
 ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে অপরিচিত সাধারণ শ্রোতা ও পাঠক সমাজ মুসলিম জাতীয়
 জীবনের একটা অতিশয় শোকাবহ বিয়োগান্ত কাহিনীর সঙ্গে এই পুঁথির মাধ্যমে আজো
 যোগাযোগ রক্ষা করছে।

বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক হলেও কবি ঐতিহাসিকতা রক্ষা করেননি, কল্পিত ঘটনা ও
 দৃশ্যের আমদানী করে কাহিনীতে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা দান করেছেন। করুণ রসের
 এমন কাব্য পুঁথি সাহিত্যে আর নেই। মেঘনাদ কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবি মাইকেল
 মধুসূদন দুঃখ করেছিলেন—কারণ মহররমের মতো কোনো কাহিনী হিন্দুদের নেই,
 মধুসূদনের মতে মহররমের ঘটনাটি একটি প্রকৃত মহাকাব্যের উপযুক্ত বিষয়বস্তু। একে
 অবলম্বন করে যদি একটা সত্যিকার মহাকাব্য রচিত হয় তা সমগ্র জাতির চিত্তকে
 আলোড়িত করতে পারে অনায়াসেই। মাইকেলের জন্মের কয়েক শো বছর আগে সেই
 মহাকাব্যই রচনা করেছিলেন মুহম্মদ খান এবং কাব্যের নামটাও লক্ষণীয়—মকতুল
 হোসেন, হোসেন বধ।

একাদশ পর্বে বিভক্ত এই বিরাট কাব্যটি পরিকল্পনার দিক দিয়ে মহাভারতের অনুরূপ হলেও বিষয়বস্তু, চরিত্র, ঐতিহাসিকতা, আবেগ, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে ইহা একটা পুরোপুরি মুসলমানী কাব্য। কবির কালে হিন্দু রচিত কাব্য, বিশেষ করে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরাগলী মহাভারত মুসলমানেরাও পড়তো, তা ছেয়দ সুলতানের 'শব-ই-মেরাজের' সূচনাতেই জানা যায়। অথচ 'খোদা রাসুলের কথা কেহ নসোহরে।' মুসলমানদের কেছা কাহিনী ও ধর্মকথা আরবী ফারসীতে রচিত তা 'আলিমাানে বুঝে নবুঝে মুর্খসূত।' বাঙলাদেশে, বাঙালী মুসলমান এই অজ্ঞতার দরুন 'পরস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিল।' নিজের ধর্মের কথা কিছুই জানেনা; এ জন্য ছেয়দ সুলতান সেকালে মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কলম ধরেছিলেন এবং তাঁর শিষ্য মুহম্মদ খানকেও অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই সচেতন ঐতিহ্য সৃষ্টি প্রয়াস আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের পক্ষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'মকতুল হোসেন' রচনা করতে গিয়ে মুহম্মদ খান তাঁর মুর্শিদের মতো বলেছেন :

“হিন্দুস্থানে লোক সবে নবুলে কিতাব
নবুলি নতনি নিতি করে মহাপাপ
তে কাজে সংক্ষেপ করি পাঞ্চালী রচিলুং
ভাল মন্দ পাপ পূন্য কিছু নজানিলুং”

'মকতুল হোসেন' থেকে কবির ভাষার কিছুটা নমুনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।
সৌন্দর্য বর্ণনা করতে কবি বলেছেন :

“নব জ্যোতি দেখি চাঁদ হই গেল বিন
সুগন্ধি মাজা দেখি সিংহ বনে প্রবেশিল
বিন মাজা দেখি গজ গুহাতে নামিল।”

কাজির নন্দন 'মোহাম্মদ ও 'ইবরাহীমকে কতল করার পর :

দুই শির কাটি পাপী শরীর দোহার
খেলিলেক কোরাতের কুলের মাঝার
আন্দুস্তাএ বোলে বাসুন কি ঢাকি আনিছ
হারিছে বোলেস্ত তুমি যে আজ্ঞা করিছ।
পাখালি সুবর্ণের ঠালে শির থুইল
রূপ দেখি আন্দুস্তা মোহশিত হইল।

মুহম্মদ খানের 'আসহাবনামার' কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। আসলে 'আসহাবনামা' কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, 'মুক্তল হোসেনের'ই দ্বিতীয় পর্বমাত্র।

কহিব দুতিআ পর্বে সুন দিয়া মন
চারি আছাব্বার কথা শাস্ত্রের নিধান।

(মুক্তল হোসেন)

'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'কে ডঃ এনামুল হক মকতুল হোসেনের অংশ মনে করেন না। তাঁর মতে এটি একটি স্বতন্ত্র কাব্য। কিন্তু সাহিত্য বিশারদের মতে এটিও মকতুল হোসেনেরই একটি অংশ। 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'-এর একটি পাণ্ডুলিপি (ক্রমিক নং পুঁথি ৩৬৭-৬১৯ পুঁথি পরিচিতি) সমাঙ্গিতে কবি বলেছেন :

মকতুল হোসেন কথা অমৃতের ধার
যে পড়ে, যে শুনে হএ পাপ তু উদ্ধার।

(হানিফার লড়াই)

কাজেই হানিফার লড়াইও মকতুল হোসেনের একটি অংশ, এ মত অধিকতরো প্রামাণ্য বলে মনে হয়। পুস্তকের বিষয়বস্তু নুতনত্ব বর্জিত। হানিফা রোকাম শহরে গিয়ে কয়রা পরীকে বিয়ে করেন। এ গ্রন্থে সাবিরিদ খানের 'হানিফা ও কয়রা পরী'র প্রভাব স্পষ্ট।

'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ' মুহম্মদ খান রচিত প্রথম কাব্য। কবির অপরিশ্রুত বয়সের এই রচনাটি মৌলিকতার দিক দিয়ে মধ্য যুগের কাব্যে অভূতনীয়। 'নল দময়ন্তী' 'বিদ্যাসুন্দর' 'গৌরঙ্গ বিজয়' 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যে কাহিনী ভাগই প্রধান, রূপক পরোক্ষ। কিন্তু এ কাব্যে কবির লক্ষ্য ও বক্তব্য সুস্পষ্ট, কবি বলেন :

"উপদেশ পঞ্চালিকা কবির রচন
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ।"

কাব্যটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। একটি সরল কাহিনীর মাধ্যমে, সত্য ও কলির রূপকে সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায় ও পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্ব সংঘটিত ও পরিণাম দেখানো হয়েছে। সত্যের জয়, মিথ্যার ক্ষয়, বা পুণ্যের বিস্তার এবং পাপের ক্ষয় প্রদর্শনই কবির এ রূপক কাব্যটির তাৎপর্য—তবু কাব্যটি যাতে নেহাত তত্ত্বকথা হয়ে না ওঠে সে জন্য

কবি সজাগ। এ জন্য মূল কাহিনী ছাড়াও বেতাল পক্ষ বিংশতির চতুর্দশতম উপাখ্যান চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী উপাখ্যান নামক একটি কাহিনী এবং সূর্য-বীর্য-চন্দ্ররেখা নামক রূপকথা ও কিস্কি রাজার আখ্যানের অবতারণা করেছেন এবং চরিত্রগুলিকে রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ করে তুলেছেন, যদিও তারা প্রত্যেকেই এক একটি গুণের বা দোষের প্রতীক। সত্য পরিণামে জয়ী হলেও সত্যের পথ যে দুর্গম এ কথা কবি সব সময় স্বরণ রেখেছেন। :

কাব্যের পাত্রপাত্রীর নামগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ এবং রূপকাঙ্ক—যেমন কলীন্দ্র, দুঃশীলা, পাপ সেন, ভীত সেন, কপটকেতু, কৃপণ, ভোগী, নারদ, মিত্রকর্ষ, সত্যকেতু, সত্যবতী, বীর্যশালী, ধর্মকেতু, সুখ, সুজাতা, যোগী প্রভৃতি। সত্যের পতাকা সূর্য, কলির পতাকা চন্দ্র। “সূর্য অগ্নিময়, সত্যে দাহ আছে, চন্দ্র নিঃশ্ব ও রমণীয়, পাপ আপাতমধুর (আঃ শরীফ)।”

মুক্তল হোসেনের মতো সত্যকলি উচ্চ কবিত্ব গুণমণ্ডিত না হলেও মধ্যযুগের কাব্যে এ কাব্যের একটা বিশেষ মূল্য ও স্থান আছে। সত্যকলির দ্বন্দ্ব আসলে সত্য ও মিথ্যার, পাপ ও পুণ্যের চিরন্তন প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বেরই প্রতীক এবং এ হিসাবে কাব্যটির আবেদন বিশেষ কোনো যুগে সীমাবদ্ধ নয়।

শেখ মুতালিব

চট্টগ্রামের অন্যতম কবি শেখ পরাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শেখ মুতালিবের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কবি শেখ পরাগের পুত্রের নামই শেখ মুতালিব। কবির কাব্য ‘কিফায়তুল মুসল্লীন’-এ কবি নিজেই তাঁর পিতৃ পরিচয় দিয়েছেন :

“কিফায়তুল মুসল্লীন গুন দিয়া মন
বঙ্গ ভাসে (ভাবে) কহে শেখ পরাগ নন্দন”

কিংবা

“ওয়াজীব কথা কহি তনু জেই হএ
হীন মুতালিব শেখ পরাগ তনএ।”

ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কবির এই কাব্যখানি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। বাঙলা এবং আরবী উভয় হরফেই এ পুঁথির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। রোজা, নামাজ, হজ্জ, জাকাত প্রভৃতি মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য বিষয়গুলি সম্পর্কে ইসলামী হুকুম-আহকামের বিবরণই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। কাব্যটির দুটি পাণ্ডুলিপিতে যে দুটি সাংকেতিক তারিখ পাওয়া গেছে তা হিসাব করে প্রমাণিত হয়েছে এবং রচনাকাল ১০৪৮ হিজরী বা খৃষ্টীয় ১৬৩৮-৩৯ সন। কবির কাব্য থেকে জানা যায়, কবি শেখ মুতালিব অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে মৌলবী রহমতুল্লাহ নামক একজন জ্ঞানী, দয়াবান ও ধার্মিক ব্যক্তি কর্তৃক লালিত পালিত হন এবং পরে তাঁর আদেশেই মুসলমানদের এই অতি প্রয়োজনীয় কাব্যটি রচনা করেন। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য :

“মূলবি রহমতুল্যা তপে দানে হাবিব আদ্বা
চতুর্দশ এলেম অবধান
হাজি হোরমাইন ততি আর করি কেলামতি
ততোধিক হাফেজ কোরআন।”

হাজি হোরমায়েনের পুত্র, দাতা ও মহাজ্ঞানী রহমতুল্লাহ কবিকে বললেন :

“মোহর বচন ধর দলীল বাঙ্গালা কর
শঙ্কা না করহ কদাচন।” কারণ
“আরবীর ভাষে তাকে নবুজএ সর্বলোকে
বুঝিবেক হইলে পত্র আর।”

এই আরবী অনভিজ্ঞ মুসলিম পাঠকের জন্য কবি তাঁর কাব্য রচনায় ব্রতী হলেন :

তাহান আদেশ পাই কৈলুম অঙ্গীকার
মোছলমানি শান্ত কথা কহিতে পয়ার
মহাশয়ে মূলবির বচন ধরিআ
চলিলুম বিকট পঙ্কে আদ্বাকে অরিআ
মূলবি কিভাব চাহি কহন্ত মহত
পয়ার করিতে লাগিলুম .রোসাইত।

রহমতুল্লাহ আরবী থেকে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে মুখে মুখে ইসলামের হুকুম-আহকাম বলতেন আর কবি শেখ মুতালিব তাকে বাঙলা কাব্যে রূপ দিতেন। কবির জন্মস্থান সম্বন্ধে কবির নিজের উক্তি :

“সীতাকুণ্ড গ্রামে সেখ পরাণ সৃজন

তাহার নন্দন হীন মোতালিব জান।”

এই উক্তির ফলে কবির জন্ম ও বাসস্থান সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডেই কবি শেখ পরাণ ও তাঁর পুত্র শেখ মুতালিবের বাসস্থান ছিল। কবির পরিণত বয়সের রচনা ‘কিফায়তুল মুসল্লীন’-এর রচনার কাল থেকে অনুমান করা যায়, কবি ষোড়শ শতকের সমাপ্তির দিকে জনগ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কবি বাঙলা ভাষায় এই কাব্যখানা রচনা করেন। বিশেষ করে ইবাদত বন্দেগীর সাথে যেসব অবশ্য পালনীয় নিয়ম-কানুন রয়েছে সে সব তখন পর্যন্ত আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায় বাঙলা ভাষাভাষী মুসলমানদের পক্ষে নিষ্ঠার সঙ্গে তা অনুসরণ করার সুযোগ ছিলো অতি অল্প। কবি এ কাব্য রচনা করে সে অসুবিধা দূর করতে চেয়েছিলেন।

এ শ্রেণীর কাব্যে কল্পনার বিস্তারের সুযোগ নেই। তখনকার দিনে ধর্ম দর্শন, ইতিহাস, কিসসা-কাহিনীমূলক সব কিছুই পদ্যে লিখিত হতো। বর্তমান ক্ষেত্রেও ফিকাহ শাস্ত্রের কতকগুলি বিষয়কে ছন্দোবদ্ধ রূপ দেয়া হয়েছে। তবু কবি শক্তিশালী, তাই তাঁর ভাষা বহু ক্ষেত্রেই কাব্যগুণ মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যেমন এক আত্মাহ সম্পর্কে কবির উক্তি :

“অনন্ত অলেখ্য রূপ জুড়ি ত্রিভুবন

অলেখ্য লখনরূপ আলক আপন

এক হস্তে আলক যতেক সৃজিয়াছে

তাহান ছিকত যত কিভাবে কহিছে

ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত গুণ এক আত্মাহ সার

যুক্তির দোসর তান কেউ নাহি আর।”

কবির ভাষায় রিজিকের ভারতম্য সম্পর্কে ইসলামের নীতি :

“যার যেই মত ভক্ষ্য দিছে বরাবর
বেশ কম নাহি তাতে মুমিন কাকর
কিন্তু মাত্র বাড়া টুটা রিজিক করিছে
সকলের রিজিক সমান নাহি দিছে।”

বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষায় আরবী শব্দের দেদার ব্যবহারের নমুনা :

‘সপ্তদশ হযজত(তে) এক জবেত(ক) কুরবান
ফিতারা, শোকরানা তিন ছবর করণ
তওবা শোকর জ্ঞান তকবির শরীফ
তিন বিংশ আর নব সকল নিরিখ।”

‘কায়দানী কিতাব’ নামে আরেকখানি কাব্যও কবি মুতালিব রহমতুল্লাহর নিকট শুনে শুনে রচনা করেছিলেন।

(গ) নওয়াজিশ খাঁ

সতেরো শতকে চট্টগ্রামে যেসব কবির আবির্ভাব হয় নওয়াজিশ খাঁ তাঁদের একজন। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া খানার সুখছড়ি গ্রামে কবির নিবাস ছিলো। এখনো কবির বংশধরেরা ঐ গ্রামেই বসবাস করছেন। তাঁরই বংশধর আতাউল্লা পণ্ডিতের কাছে রক্ষিত বংশতালিকা দৃষ্টে জানা যায় কবি হাজার মঘী সনে অর্থাৎ ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি ১৭৬৫ খৃ-এ দেহত্যাগ করেন। এই দীর্ঘজীবী কবি আলাওলের সমসাময়িক হলেও আলাওলের তিরোধানের পরেও বেঁচে ছিলেন।

বিখ্যাত পারস্য উপাখ্যান অবলম্বনে কবি নওয়াজিশ খাঁ গুল-ই-বকাউলি কাব্যটি রচনা করেন। বাণীগ্রামের জমিদার বৈদ্যনাথ রায়ের অনুরোধে পুস্তকখানি রচিত হয়। পুঁথিটিতে কবির একটা সুদীর্ঘ আত্মবিবরণী দেওয়া হয়েছে, সে বিবরণ শুধু নিজের আত্মপরিচয় নয়, তখনকার দিনের সাতকানিয়া ও বাঁশখালী খানার গ্রামগুলি কল্পনা গুণে হয়ে উঠেছে এক একটা শহর এবং জমিদারেরা হয়ে উঠেছেন এক একজন নৃপতি।

‘ছিলিমপুর’ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা গোড় থেকে আগত ছিলিম খাঁ মড়ল হচ্ছেন কবির পূর্ব পুরুষ।

কবির ভাষায় :

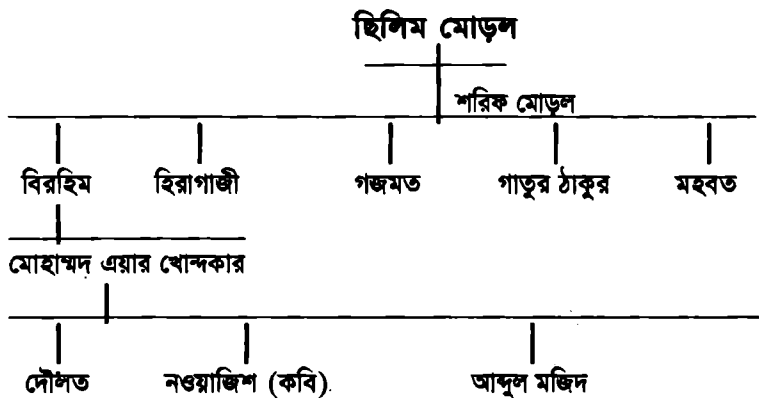
“প্রপিতামোহের পিতা গোড় হস্তে আসি
গোত্র সনে চাট্রিগ্রামে করিল নিবাসি।”

* * *

ছিলিম মড়ল নামে সবে পাএ চিন
তানসূত শরীফ মড়ল গুণধর।।
শরীফ মল্লের গৃহে হৈল পঞ্চসূত
একে একে বলবত্ত অতি অদ্ভুত।
বিরহিম নামে হীরাগাজি গজমত
গাড়ুর ঠাকুর আর নামে মহাবত
বিরহিম ঔরসে বিনানু (গাঁজীমল্লের কন্যা) স্থিতি
মোহাম্মদ এয়ার নাম হইল সন্ততি
তাহান প্রথম সূত নামে দৌলত
শাস্ত্র শিক্ষা পিতা হস্তে লৈল খেলাফত
তাহান কনিষ্ঠ মুই নওয়াজিশ নাম
অল্প শাস্ত্র, অল্প বুদ্ধি, অল্প যত কাম
* * *

মোহের কনিষ্ঠ ভাই, ছিলো বলবত্ত
আব্দুল মজিদ নামে হাফিজ মোহোস্ত।

এই বিবরণ থেকে কবির বংশতালিকাটি এরূপ দাঁড়ায় :



শুল-ই-বকাউলী একটি কাহিনী কাব্য। একে রূপকথা হিসেবে গণ্য করাই অধিকতর সঙ্গত। শর্কাস্তানের রাজার এক পুত্র সন্তান জন্মেছে। একই সংগে রাজার কি সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য! পুত্রকে দেখার পরই রাজা দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। পুত্রের নাম তাজুল মুলুক। রাজার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবার একটি মাত্র উপায়ই আছে। পরী রাজা বকাউলির ফুল-বাগিচায় যে ফুল নিত্য ফোটে সেখান থেকে ফুল চুরি করে এনে রাজার চোখে ব্যবহার করলেই তিনি তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। পিতৃভক্ত তাজুল মুলুক সকল রকম বিপদ উপেক্ষা করে পরী রাজ্যে যাত্রা করে। সে ফুল সংগ্রহ করলো, উপরন্তু ঘুমন্ত বকাউলির সাথে চুপি চুপি আপন হার এবং আংটিও বদল করলো এবং দেশে ফিরে এলো। বকাউলি দিওয়ানা হলো তাজুল মুলুকের জন্য। বহু অনুসন্ধানের পর সে তার সাক্ষাৎ পেলো। তারপর দুজনের বিয়ে হলো।

কবি নওয়াজিশ খুব উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন না, তবু তাঁর কাব্যের স্থানে স্থানে রচনার লালিত্য উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি গতানুগতিক রীতির অনুসারী :

“সে কন্যার রূপের সাগর পরিমাণ
 অল্পমতি এক মুখে কি কহি বাখান।
 শির স্বর্গ, মর্ত্য নাভি, পদ সে পাতাল
 ত্রিভুবনে কন্যা রূপে মোহে সর্বকাল।।
 * * * *
 শিরের উপরের কেশ অতি শ্যাম ভার
 জ্বলে রেবি লাজে এ গর্জিয়া অপার
 অলি পিক চামরিকা গেল বনে বনে
 মহীতলে বাসা কৈল বাসুকী আপনে!
 সৌরভ যা হএ সম আবির কস্তুরী
 অরণ্যে প্রবেশ কৈল মনে কৃপা করি।।
 শিষেতে সিন্দুর যেন প্রভাতের সূর,
 উদিত অরণ্য আরে (আড়ে) দেখিতে প্রচুর।।
 ভুরু জুগ হেরি কামের কোদণ্ড গেল দূর
 কুশল্যা নন্দন ধন বাল ইন্দ্রপুর।।
 অক্ষিযুগ হেরি পদ্ম লাজে গেল জ্বলে
 খঞ্জন গঞ্জন করে সুচালনি পেলে। ইত্যাদি।”

কবির আর দু'খানি গ্রন্থের নাম 'পাঠান প্রশংসা' এবং 'জোরওয়ার সিং কীর্তি'। পাঠান প্রশংসার মাত্র দুটি পাতা পাওয়া গেছে, এতে চট্টগ্রামের দোহাজারীর পাঠান বংশের কোনো পাঠানের কীর্তি প্রশংসিত হয়েছে। আধুর্বার বংশ নামে এই বংশ আজো সুপরিচিত। মরহুম কজর আলী খাঁর পূর্ব পুরুষ হচ্ছেন এ পাঠান সর্দার। কাব্যের তুলনায় রাজ্যপাট ও ধনদৌলত যে অতি তুচ্ছ কবি তা এই কাব্যে চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অমরতা কাব্যেই, ধনে জনে রাজ্যে নয়, এই হচ্ছে কবির বক্তব্য।

“মহাজনে নাম হেতু করে প্রাণ পণ
 কি করিব রাজ্যপাট কি করিব ধন॥
 সংসার পূর্ণিত যার সুনাম কীর্তি
 ধন্য নরদেব কুল ঈশ্বর পীরিতি॥
 সুজনে করিব নিত্য পর উপকার
 না রহিব ধনজন অনিত্য সংসার॥
 না রহে ভাঙার ধন রত্ন লক্ষাবধি
 কবির কবিত্ব রহে প্রলয় অবধি॥
 কবি গণে রচি যদি কহে মিথ্যা কথা
 সর্বলোকে সত্য হেন জানএ সর্বতা॥
 এই লাগি মোহাজনে কবি সন্তোষএ
 কবি হোন্তে আপনা প্রশংসা নাম রহে॥
 কে জানিত বহরম গোর কোথা রহে
 সঙনারী, সঙকার সু-প্রসঙ্গে কহে॥
 আর কত সুপ্রসঙ্গ বহলে রচিল
 প্রলএ অবধি সব পুস্তকে রহিল॥
 লক্ষাবধি নরপতি হইছে সংসারে
 প্রশংসা রচনা বিনু করি আছে কারে॥”

'জোরওয়ার সিং কীর্তি'তে চট্টগ্রামের পটীয়া থানার শঙ্খ নদীর তীরস্থ দোহাজারীর হাজারী বংশের কীর্তি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হাজারী মনসবদার লছমন সিংহের (১৬৬৬) পুত্রের নামই জোরওয়ার সিংহ।

এছাড়াও নওয়াজিশ খাঁ 'বায়ানাত বা ধাব' 'উপক্ষি বা বয়ান' নামক একখানি কাব্য এবং বৈষ্ণব কবিতার চণ্ডে বহুগীতি কবিতাও রচনা করেছিলেন।

(ঘ) কমর আলী (পণ্ডিত)

কমর আলীর জন্মস্থান হচ্ছে চট্টগ্রামের 'করলডেংগা'। এই গ্রামটি খিতাবচর ও সতর পটুয়ার পাশেই অবস্থিত। করলডেংগায় কবির বংশধরেরা এখনো বসবাস করছেন। তাঁরা কমর আলী পণ্ডিতের নামে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। কমর আলী পণ্ডিতের বাড়ীর নামে তাঁর বাড়ীর পরিচয়। সঙ্গীত শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সংগীতের ওস্তাদ ছিলেন। শূদ্র শ্রেণীর হিন্দুরা, বিশেষ করে হাড়ি সম্প্রদায় তাঁর নিকট সংগীত শিক্ষা করতো। সংগীত রচনায় তিনি যেমন ওস্তাদ ছিলেন তেমনি তর্জমায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

কমর আলী ফারসী ভাষা থেকে একটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং ঐ গ্রন্থের নাম করেন 'সরসালের' নীতি, ইহা ছয় রিসালা কিনা কে জানে। মুনাইর মুনশি নামক কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির আদেশে তিনি ফারসী ভাষা থেকে বইখানি তর্জমা করেন।

“এই যে নোচকা জান কারছি আছিল
সবে বুঝিবারে হীনে পাঞ্চালী রচিলা
নোচকা বলয়ে যারে কারছি ভাষায়
তার্ভিব কিভাব বলি বঙ্গভাষে কহোঁ।”

এটি একটি উপদেশমূলক পুস্তক। মুসলমানেরা দৈনন্দিন জীবনে কি কি নিয়ম মেনে চলবে তাই এই কাব্যের বক্তব্য। গ্রন্থরচনার তারিখ হচ্ছে ১০৮৬ হিজরী বা ১৬৭৫ খৃঃ অঃ।

রাধার সংবাদ : ‘ঋতুর বার মাস’ একটি ক্ষুদ্র কাব্য। বারো মাস ছয় ঋতুতে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিরহ-বিধুরা রাধিকার যে সুগভীর বেদনা উচ্ছসিত হয়েছে তাতে একটা অদ্ভুত আন্তরিকতার স্পর্শ বর্তমান :

‘কৈয় কৈয় প্রাণরীত রাধার সাক্ষাৎ
নিমায়্য নিঠুর হে আগো প্রাণনাথ॥
বারমাসে ছয় ঋতু জানিএ নিশ্চয়
এক রাগ ঋতু দুই মাস পাই আছএ॥
পটু মাসেতে ঋতু পড়এ শিশির
কিঞ্চ বিনে চিন্ত মোর হৈল চৌটির
হেমন্তের ঋতু বহে দীর্ঘল রজনী
কিঞ্চ বিনে কিরণে বঞ্চিমু অভাগিনী ।।

কমর আলীর কিছু কিছু খণ্ড কবিতা ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত মুসলমান বৈষ্ণব কবি গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ছাপা হয়েছে। গীতিকবি হিসেবে কমর আলীর কৃতিত্ব সংশয়াতীত। বিরহের বর্ণনায় কবির রচনা আন্তরিকতার স্পর্শে মধুর হয়ে ওঠে—যেমনঃ

প্রাণনাথ ব্রজে না আইল
 এইরূপ যৌবন বইল। ধূয়া
 এই ভরা যৌবন কালে শ্যাম ব্রজে নাই
 বিরহিনী একাকিনী কাঁদিয়া গোমাই।
 শ্যামের লাগি ভাবি ভাবি
 সদাই তনু শেষ হৈল
 শতদল কমল মোর হৈল বিকাশ
 হেনহি সময়ের হরি নাহি মোর পাশ।
 সোনার মন্দির শূন্য, আমার বৃথা জন্ম গেল।
 যত ব্রজবাসী নারী পতি করি সংগ
 যার যেই মনোবাঞ্ছা পুরে মনোরংগ।
 মোর পিয়া নাই ঘরে বিচ্ছেদ মনে রইল।

(ঙ) আব্দুল নবী

কবি আব্দুল নবীর একটি মাত্র কাব্যই পাওয়া গেছে—কাব্যটির নাম 'আমির হামজা'। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর চাচা আমীর হামজার খ্যাতি জগত বিদিত। বীরের বীরত্ব কাহিনী চিরকালই কবি কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে এবং তারি ফলে সৃষ্টি হয়েছে জগতের প্রত্যেকটি মহাকাব্য। আমীর হামজার কীর্তিকলাপ নিয়েও এমনি কাব্য ফারসী এবং বাঙলা ভাষায় রচিত হয়। কবি আব্দুল নবীর 'আমির হামজা' মৌলিক কাব্য নয়, ফারসী কাব্যের তর্জমা। এদেশের লোকেরা যথেষ্ট পরিমাণে ফারসী জানতো না বলেই কবিকে বাঙালী পাঠকদের জন্য এই মহাবীরের বীরত্ব কথাকে ফারসী ভাষা থেকে বাঙলায় তর্জমা করতে হয়।

তাই কবি বলেছেন :

“আমীর হামজা জিন্মা ফারসী কিতাব
 ন বুঝিরা লোকের মনেত পাই তাব (তাপ)।

বহুগেতে ফারসী ন জানএ সব লোকে ।
 এহি হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার
 নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অংগীকার
 মুসলমানি কথা দেখি মনেহ ডরাই
 রচিলে বাঙালী ভাষে কোপে কি গৌসাই।
 লোক উপকার হেতু তেজি সেই শুএ
 দরবারে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ ।”

‘আমির হামজা’ মোট আশী পর্বে বিভক্ত বিরাট এক মহাকাব্য। কাব্যের এই বিরাট কলেবর নিঃসন্দেহে কাব্যটিকে এক অনন্যসাধারণ মহিমা দান করেছে। কবি নিজেই বলেছেন এতোবড় কাব্য আর কেউ লিখবে তা দূরের কথা, পড়তেই ভয় পাবে। “ধাক্কুক লেখক কেহ পড়িতে লাগে ডর।” কাব্যটি ১০৯৬ হিজরী বা ১৬৮৪ খৃঃ-এ রচিত হয়। কবির পিতার নাম মোহাম্মদ শরীফ।

“মোহাম্মদ শরীফসূত মুঞি হীন মানি
 হীন আব্দুল নবী কহে এসব বাখানি ।”

কবির জন্মস্থান চট্টগ্রামের ‘ছিলিমপুর’।

“চাট্টগ্রাম রাজ্য মাঝে ছিলপুর (ছিলিমপুর) স্থান
 স্বর্ণ অবতারি সব সুচারু-নির্মাণ।
 পূর্বে কর্ষেতিস গিরি পশ্চিমে সাগর
 মৈক্রে যেন গড় যেন মক্কা সমসর।
 সেই স্থানে আছে মোর খুদ্র এ উআরি
 বিরচিত পঞ্চালিকা তথ্য ধর্ম স্বরি।

কবি আব্দুল নবী ছিলিমপুর গ্রামে সিদ্দিকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি মুকীম আখ্‌বিবরগীতে পূর্ববর্তী চট্টগ্রামের কবিদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে আব্দুল নবীরও নাম উল্লেখ করেছেন। এতে কবির প্রাচীনত্বেরই শুধু প্রমাণ মেলে না, কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠারও স্বীকৃতি মেলে। তিনি শক্তিমান এবং জনপ্রিয় কবি ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুহম্মদ নকী (১৬৭৫-১৭৬৫)

মুহম্মদ নকী কবিবর নওয়াজিশ খানের শিষ্য ছিলেন। কবির একটি মাত্র গ্রন্থ ‘তুতি নামা’র দুটি লিপি পাওয়া গেছে। ‘তুতি নামা’য় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :

“প্রণাম কমর এবে গুরুর চরণে
বিজ্ঞ নওয়াজিশ নাম প্রচার ভুবনে ।।
প্রভু দিয়াছিল তাঁর কাব্য রত্নভাণ্ড
ডেকারণে কবি শক্তি আছিল অখণ্ড ।।
জ্ঞান বলে রচিলা পুস্তক বকাঅলি
কহিছন্ত নানা ভাবে মনেত আকলি ।।

কবি ওয়াজিশের কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁর বংশধরদের দ্বারা রক্ষিত বংশ তালিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে আমরা দেখেছি কবি ১৬৩৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭ বছর বয়সে ১৭৬৫ খৃঃ-এ দেহত্যাগ করেন। মোহাম্মদ নকী তাঁর শিষ্য, তাই সমসাময়িক। তাই, নকী ১৬৭৫ হতে ১৭৬৫ খৃঃ অঃ মধ্যে জীবিত ছিলেন”—এ অনুমান করা চলে। খুব সম্ভব কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ায় ‘জয়রাম নরপতির’ প্রপৌত্র শঙ্করাম।

রাজ রাজচক্রবর্তী ছিল শত্রুকুল বিনাশিল
দর্পে যেন শত্রু সমসর ।
নিজ করে অস্ত্র ধরি হস্তি, গণ্ডা, ব্যাঘ্র মারি
বেসাইল ‘চরখানগর’।

এই ‘চরখান’ স্থাপয়িতা শঙ্করামের পুত্র জাহিরামের আদেশে কবি ফারসী ‘তুতিনামা’ কাব্য বাঙলায় তর্জমা করেন—ফারসী “তুতিনামা জাহিরাম রোজ্ঞ সনতেন এবং উপভোগ করতেন। একদিন রসজ্ঞ জাহিরাম

“বলিলা না বুঝে সবে ফারসী কিতাব
দেসি ভাসে রচি কহ এই পরস্তাব ।।”

কাব্যটি উপদেশমূলক। কবি খুব উচ্চ কবিত্ব শক্তির অধিকারী নন; তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর প্রকাশ ভঙ্গীর ঋজুতা পাঠককে চমৎকৃত করে—যেমন :

“সর্বভূতে স্ব ইচ্ছাতে যে কৈল সৃজন
 সপুটে প্রমাণ করো সেই নিরাঞ্জন ।
 সর্ব সৃষ্টি কর্তা হর্তা সেই সে ঈশ্বর
 সম্বোধে সকল জীব নাহিক দোসর ।।
 হেন ধনী হেন দানী কোথা আছে আর
 নিতি প্রতিদান করে না টুটে ভাঞ্চার ।
 সকলের শরীরেত দিয়াছ স্বভাব
 ক্রোধ মূলে সর্বনাশ, ক্ষোমা মূলে লাভ ।।
 আর এক অপূর্ব দেখহ সর্বজনে
 নৈরাশ্যের স্থানে আশা রাখে জীবগণে ।।”

এরপর কবি আব্দাহর হাবিব হযরত মুহাম্মদ (দঃ--এর স্তুতি করছেন :

“তোমর (আব্দাহর) স্তুতি করি ওর না পাইলুঁ যবে
 কৃপাকর তুআ মিত্র স্তুতি করোঁ এবে
 যার প্রেম ভাবে প্রভু সৃজিলা জগৎ
 সর্বশাস্ত্রে লিখে নাম নূর মোহাম্মদ ।”

‘যুবরাজ’ ‘শাহা সূত’ ঘরে নেই । তাঁর অবর্তমানে তরুণী স্ত্রী কোনো এক
 ‘নৃপসূতে’র জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে । সে তুতির নিকট গিয়ে জানায় তাঁর মনোবাহার
 কথা । তুতি অমন চমৎকার এক কাহিনী ছুড়ে দিলো যে

“রসবাক্য শ্রুতিগত রাত্রি পোসাইল
 নৃপ সূত্র দর্শিবারে কুমারী নারিল
 কিন্তু ‘কুমারী তাতে দ্বন্দ্ব হওয়ার নয়’—সে
 আর নিশি বলে আসি অএ পক্ষীর
 আঞ্জা দেখ দর্শি গিয়া নৃপতি কুঞ্জন—

কিন্তু তুতি বড় চালাক—

পুনিহ লাগিল তুতি প্রসংগ কহিতে
 নিশি অবশেষ ভেল শুনিতে শুনিতে

এমনি করে তিনশো ষাট দিন অভিবাহিত হলো—

দিনেক প্রসংগ তুতি শুনাএ নবীন
বুদ্ধি বলে কুমারীকে ভ্রমাই রাখিলা
অবশেষে যুবরাজ গৃহেতে ফিরিলা॥
শাহা সূত গৃহে যদি করিল প্রবেশ
নৃপ সূত চলি গেল আঁপনার দেশ॥”

(ছ) শমশের আলী

‘রিজওয়ান শাহ’ নামক একখানি মাত্র কাব্যের লিখক শমশের আলীর জন্মস্থান হচ্ছে চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রাম। কবির সময়ে এই এলাকাটা ছিলো হাটহাজারীর অন্তর্গত। এই গ্রামেই বিখ্যাত কবি দৌলতকাজি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবির কাব্য পাঠে জানা যায় :

‘জিলে চট্টগ্রাম মধ্যে হাটহাজারি থানা।
সে সাকিনে শমশের মহা কবিবর।।
* * * *
সুলতানপুর মৌজা বলে সর্বজনা
প্রথম প্রসঙ্গ কাব্য রিজওয়ান ইশ্বর।।”

(রিজওয়ান শাহ)

শমশের আলী—“কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস” বাক্যটির কোনো হস্ত লিখিত প্রতিলিপি পাওয়া যায়নি; বটতলায় ছাপা হয়েছে; এ কাব্যের বারো আনা অংশ রচনা করেই কবি শমশের আলী ইনভেকাল করেন এবং বাকী এক চতুর্থাংশ ‘আহলম’ নামক অন্য কবি রচনা করেন। দৌলত কাজির মতো শমশের আলীও নিজ ভাগ্যের অনুসন্ধানে আরাকানে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ‘রোসাজে’ অবস্থান কালেই তিনি ‘রিজওয়ান শাহ’ রচনা করেন।

‘রিজওয়ান শাহ’ একটি কাহিনীমূলক কাব্য। সুপণ্ডিত কবি শমশের আলীর কাব্যের পটভূমিকা খোরাসান পারস্য প্রভৃতি দেশ হলেও এতে বাঙ্গালী উপাদান যে নেহায়েৎ কম নেই হীরামাল সাধু, তর্কা বণিক, চিত্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে

তার প্রমাণ মেলে। শমশের আলীর ভাষা সংস্কৃত প্রধান, রূপ বর্ণনা গতানুগতিক এবং অস্পষ্টতা দোষে দূষ্ট। যেমন-

“হেমভঙ্গ উর্ধ্বভাগে শ্যামকাল গিরি।

শ্যামময় ভৃগানুর পূর্ণ গন্ধ ধরি।।

মৃগমদ গন্ধ সদা সৌরভ বিষ্টিত।

শুভ গন্ধ ঘ্রাণ হেতু সকলের বাঙ্খিত।।

- “সেই শ্যামাকুর হইতে শ্যাম নেত্রমণি
সেই কালে কালনাগ জর্মে কালসিনী।”

রূপের ব্যাখ্যা বা বিবরণ কোনো বিশেষ রূপকে আমাদের চোখের সামনে রূপময় ও প্রত্যক্ষ করে তোলে না। শমশের নামক জটনৈক কবি পদাবলীর চণ্ডে যেসব খণ্ড কবিতা রচনা করেন সেগুলিও গতানুগতিক। দু’জন অভিন্ন ব্যক্তি কি-না তা বলা দূর।

(জ) মুজাফ্ফর

কবি মুহম্মদ খানের ‘মজুল হোসেন’ নামক বিখ্যাত কাব্যের একটি খণ্ডের নাম ‘হানিকার পত্রপাঠ’। এই ‘হানিকার পত্রপাঠ’ খণ্ডে ‘এবীদের উত্তর’ নামে একটি অংশ সংযোজিত হয়েছে; এই অংশটি মুজাফ্ফর নামক এক কবির লিখিত। কবি মুজাফ্ফর তাঁর আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :

“ছোলতান দৌহিত্র চক্রশালা ঘর
কহে হীন মুজকরে এজিদ-উত্তর।”

এই ‘ছোলতানই মহাকবি পীর মীর হৈয়দ সুলতান বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই অনুমান সত্য হলে কবি মুজাফ্ফর হচ্ছেন হৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র এবং চক্রশালা হচ্ছে তাঁর নিবাসস্থল।

কবি মুজাফ্ফরের নামে ‘ইউনান দেশের পুঁথি’ নামক একটি গ্রন্থের তিনটি হস্তলিখিত প্রতিলিপি পাওয়া গেছে। ‘এবীদের উত্তর’-এর রচয়িতা মুজাফ্ফর এবং ‘ইউনান দেশের পুঁথির’ গ্রন্থকার একই ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষের জ্ঞান ও শক্তি যে তুচ্ছ এবং আত্মাহই যে সর্বশক্তিমান, কবি এ পুঁথিতে তাই বলতে চেয়েছেন। কবি এ কাব্যে গ্রীক পণ্ডিতগণের জ্ঞানের অহংকার ও দাস্তিকতার পরিণাম দেখিয়েছেন। কবির রচনা ক্ষমতা ও ব্যংগ-রস-রসিকতার নমুনা নিম্নের উদ্ধৃতিতে মিলবে :

কবির পীরের নাম হামিদ; ‘শাহা সুলতানের পুত্র কাজি মনসুর’—কবি যদি কাজি মনসুরের তনয় হন তাহলে তিনি ‘শাহা সুলতানের’ই অন্যতম পৌত্র। তাঁর নিবাস চট্টগ্রামের চক্রশালা হওয়াই স্বাভাবিক।

গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নের উদ্ধৃতিটি উল্লেখযোগ্য :

“সয়মুল মুলুক কিসসা পড়ে একজন
 কেতাবের দরমিয়ান দেখি অপূর্ব কখন।
 সেই মহাশয় যদি কেতাব পড়িল
 যত দোস্তগণ শুনি হরষিত হৈল।
 সর্বলোকে এইসব মধুরস বাণী শুনি
 প্রচার করিতে যুক্ত এ সব কাহিনী।
 * * * *
 কহেস্ত শরীফ হীনে মনেত ভাবিয়া
 এ সকল কথা আমি দিমু প্রচারিয়া।
 মুরশিদ চরণ শিরে করিআ বন্দন
 লালমতি কিসসা লিবি করিয়া যতন।”

কাব্যখানি একটি ফারসী উপাখ্যানের তর্জমা। কবির ভাষা প্রাজ্ঞ; আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহার নগণ্য। কোন্ মাসে নারী প্রথম স্বভূবতী হলে তার ফল কিরূপ হয়ে থাকে কবি নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন :

“প্রথমেত নারী যদি হইল বিকশিত
 কোন্ ভাল কোন্ মন্দ শুন তার ভিত।
 বৈশাখে জৈষ্ঠেতে যদি হএ বিকশিত
 সোআমি সঙ্গে পীরিত বাড়এ বহু।
 লতাতে তরু বেন থাকএ জড়িয়া
 তেন মতে সোআমি সঙ্গে থাকএ মজিয়া।
 আষাঢ়েতে রজস্বলা হৈলে নারীগণ
 ধনে পুত্রে বাড়িবেক সম্পদ নিপুণ।
 শ্রাবণেতে রজস্বলা হইলে কামিনী
 ব্যাধিএ পীড়িত হয় সে সব রমনী।।
 ভাদ্র মাসে রজস্বলা হএ নারীগণ
 শিশু প্রসবিত্তে নারী হইব নিধন।।”

রুতি দেব

সপ্তদশ শতকের হিন্দু কবি রচিত প্রায় সমস্ত কাব্যই হয় দেব দেবীর মাহাত্ম্যমূলক মঙ্গল কাব্য, না হয়, রামায়ন-মহাভারতের অনুবাদমূলক কাব্য। হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থান কালে শৈব ধর্মই মাথা তুলে দাঁড়ায় বলে দীনেশবাবুর ধারণা। শৈব ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনের জন্য কোনো বৃহৎ কাব্য রচিত না হলেও সপ্তদশ শতকে কয়েকটি ক্ষুদ্র রচনায় শুধু শিব চতুর্দশীর উপাখ্যানটি অবলম্বন করে শিবমঙ্গল বা 'শিবায়ন' কাব্য রচিত হতে থাকে। চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রুতিদেবের 'মৃগলুক' নামক পুঁথিতে শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ১

'মৃগলুক' পুঁথিতে কবির নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় :

‘পিতা গৌপীনাথ বন্দ্য মাতা মধুমতী
জন্মস্থান সূচক্রদত্তী চক্রশালা খ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দ্য রাম নারায়ণ
ধরণী লোটাইয়া বন্দ্য জন্য গুরুজন।
অনুপূর্ণা স্বাশুড়ি বন্দ্য মহেশ স্বশ্বর
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর।”

চট্টগ্রামের চক্রশালার অন্তর্গত সূচক্রদত্তী গ্রাম সাহিত্য বিশারদ জনাব আব্দুল করিমেরও জন্মস্থান। এই গ্রামে রুতিদেবের বংশধরেরা আজো বসবাস করেন কিনা, জানা যায়নি। রুতিদেব তাঁর কাব্য রচনা করেন 'রস অংক বায়ু শশী শাকের সময়'। অর্থাৎ ১৫৯৬ শকাব্দে বা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মৃগলুক' রচিত হয়।

‘শিবরাত্রি চতুর্দশী ব্রত উপবাস।
যেন মত অবনীতে হইল প্রকাশ।’
তার বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য। শিব হচ্ছেনঃ

“সেবক বৎসল হয় আদি নিরঞ্জন
ভক্তিভাবে সেব যদি তরিবা শমন।

* * *

পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়ে ঠাকুরাল
অন্তকালে স্বর্গবাস থাকে চিরকাল।”

‘মনসার ধূপাচার’ নামক আরেকটি কবিতার ভণিতায় দেখা যায় :

“ধূপাচার লৈয়া মা মাগম তুয়া পায়
বিজ্ঞ রত্নিদেব রাখ বিবহরি মায় ।”

‘মৃগলুক্কে’র রচয়িতা এবং ‘মনসার ধূপাচারে’র রচয়িতা অভিন্ন বলে মনে হয় ।

(ট) বিজ্ঞ রামদেব

‘অভয়া মঙ্গল’ নামক কাব্যের রচয়িতা বিজ্ঞ রামদেবের দুখানি মাত্র প্রতিলিপি কিছুকাল আগে আবিকৃত হয়েছে এবং পুঁথিটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে কবির কোনো আত্মবিবরণী নেই, ভণিতায় প্রায় সর্বত্র কবি নিজেকে ‘বিধুসূত’ বলে উল্লেখ করেছেন। ‘কবি বিধু’ কবিচন্দ্র হওয়া অসম্ভব নয়। কবির নিজের প্রদত্ত কাব্যরচনার কাল নিম্নরূপ :

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ শক নিয়োজিত
রচিলেক রামদেব সারদা চরিত ।’

মঙ্গল কাব্যের রচনার কাল নির্দেশক পদ থেকে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা বাম দিক থেকে পড়তে হয়। একে বলে ‘অংকস্য বামা গতি’। এই নিয়ম ভঙ্গ করে অংকগুলি রামদেবের উল্লেখিত পদে যেভাবে লিখিত হয়েছে, সেভাবেই পড়ে গেলে আমরা ‘সারদা চরিত’ বা ‘অভয়া মঙ্গল’ কাব্য রচনার কাল পাই—১৫৭৫ শকাব্দ বা ১৬৫৩ খৃঃ অঃ। গ্রন্থমধ্যে কালকেতুর নগর পশ্চিম উপলক্ষে মগ কিরিসীদের আগমনের কথাও আছে; কিন্তু বিজ্ঞ মাধবের কাব্যে তা নেই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকেই মগ কিরিসীদের মিলিত উৎপাত বাড়াপী জীবনে চরম আকর ধারণ করে। “রামদেব তাঁর কাব্য মধ্যে নিজের কোনো পরিচয় দিয়ে যাননি। তবে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গল রচনার ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন এবং সর্ব বিষয়ে বিজ্ঞ মাধবকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই লোক ছিলেন, তা অনুমান করা অসংগত হবে না।”
—(আততোষ ভট্টাচার্য্য)।

রামদেব যেভাবে পদে পদে তাঁর পূর্ববর্তী কবি বিজ্ঞ মাধবের অনুকরণ করেছেন, কোনো কবিই সেভাবে প্রাক্তন অন্য কোনো কবির অনুকরণ করেন না। বিজ্ঞ মাধবের

কাব্যের নাম 'সারদা চরিত'। দ্বিজ রামদেবও কোনো কোনো স্থলে তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছেন—'সারদা চরিত'। দ্বিজ মাধবের মতো তাঁরও কাব্যের আরও সূর্যবন্দনা দিয়ে। বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় তিনি শুধু দ্বিজ মাধবের ছন্দেরই অনুকরণ করেননি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করেছেন। ফলে, তাঁর রচনার কোথাও মৌলিকতার প্রকাশ ঘটেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বিজ মাধব লিখেছেন :

“ধনপতি বোলে প্রিয়া শুন মোর বাণী
তোম্মার আঞ্জা পাইলে বিহা করিব খুলনী॥
যেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ।
লহনার মুণ্ডে যেন পড়িল আকাশ॥”

সেখানে দ্বিজ রামদেব লিখেছেন :

“ধনপতি বোলে প্রিয়া শুনিছ কাহিনী
বিবাহ করিমু তোমার খুলনা ভগিনী॥
এইমাত্র শুনে রাজা সাধুর বচন
লহনার মুণ্ডে যেন ঠেকিল গগণ॥

সপ্তম অধ্যায়

আরাকানের রাজদরবারে চর্ছামের কবি

আরাকান রাজ্যের সীমা মুঘল আমল পর্যন্ত বার বার বদলেছে। কয়েকবার হাত ছাড়া হলেও সমগ্র চর্ছাম বিশেষ করে উত্তরে কর্ণফুলী নদীর তীর পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মুঘল আমলের সমাপ্তি কাল পর্যন্ত আরাকান অধিকারেই ছিলো। আরাকানীরা ছিলো মগ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবু আরাকান রাজ নরমিখলার রাজত্বকাল থেকেই আরাকানে গৌড়ীয় মুসলিম প্রভাবের সূচনা হয়। আরবী মুসলিমদের সাথে আরাকানীদের পরিচয় ঘটে আরো আগে থেকেই। এই প্রভাব এতোটা সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো যে ১৪৩৪ খৃঃ থেকে ১৬৪৫ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় দুশ বছরেরও অধিক কাল ধরে আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা তাঁদের বৌদ্ধ নামের সাথে একটি করে মুসলিম নাম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মুদ্রায় ইসলামের কলেমা মুদ্রিত করেছেন। মুঘল পাঠান রাজশক্তির সংগে তাঁদের সম্পর্ক হৃদয়তামূলক না হলেও তাঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শাসন ব্যবস্থা ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁরা ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাবান। ইসলামের সাম্যবাদ, ন্যায়নীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানব শ্রেমের আদর্শ অতি সহজেই তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা-দীক্ষায়, রণ কৌশলে উন্নত মুসলমান পারিষদ ও মন্ত্রীবর্গ অল্প দিনের মধ্যেই আরাকান রাজসভা কার্যতঃ কুক্ষিগত করে ফেলেন। এমনকি, রাজাদের অভিষেক ক্রিয়াও মুসলিম প্রধান মন্ত্রীর দ্বারা সম্পন্ন হতো। তাঁদের প্রধানমন্ত্রী, (মহাপাত্র, মুখপাত্র, মহামাত্য) অমাত্য (পাত্র) সমর সচিব (লঙ্কর উজীর) কাজী (দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারক) প্রভৃতি উচ্চ পদগুলি মুসলমানদের দ্বারাই পূর্ণ হতো। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত আরাকান রাজদরবারে এই প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিলো এবং এই শতকেই আরাকান রাজসভা কার্যতঃ মুসলিম রাজসভা হয়ে ওঠে।

আরাকানে এই মুসলিম প্রভাব আসলে বাঙালী মুসলিমেরই প্রভাব। তার ফলে বাঙলাদেশের বাইরে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এহেন প্রসার সম্ভব হয়েছিলো। আরাকান রাজ্যের মুসলমান সভাসদরা ছিলেন বাঙলা ভাষাভাষী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাই আরাকানের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির কারণ।

আরাকান রাজ খিরি খুধম্মার (১৬২২-১৬৩৮) লঙ্কর উজীর বা সমর সচিব আশরাফ খানের নাম সর্বাত্মে উল্লেখ করতে হয়। আশরাফ খান ছিলেন চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামের অধিবাসী। এই গ্রামে তাঁর দালান-কোঠার ধ্বংসাবশেষ ও একটি দিঘী এবং রাউজান থানার কদলপুর গ্রামে লঙ্কর উজীরের দিঘী এখনো টিকে আছে। এই আশরাফ খানের আদেশেই কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না' নামক বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। খিরি খুধম্মার রাজত্বকালের আরেকজন চট্টগ্রামী কবির নাম হচ্ছে মরদন এবং তাঁর কাব্যের নাম 'নাসিয়া নামা'।

খিরি খুধম্মার পর সরপদিয়গি (১৬৩৮—১৬৪৫ খৃঃ) এবং তারপর খদোমিস্তার আরাকানের সিংহাসনে বসেন। খদো মিস্তারের মুখ্যপাত্র কবি বহু ভাষাবিদ মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকবি আলাওল তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। খদোমিস্তারের পুত্র চন্দ্রসুধম্মার রাজত্বকালে (১৬৫২—১৬৮৪ খৃঃ) তাঁর সমর সচিব ছৈয়দ মুহাম্মদের আদেশে 'হুগু পয়কর', নবরাজ মজলিসের আদেশে 'সিকান্দর নামা' ও পাত্র (মন্ত্রী) ছৈয়দ মুসার আদেশে কবি 'সয়ফুল মুহুক বদিউজ্জামাল' রচনা করেন।

দৌলত কাজি

(আঃ ১৬০০-১৬৩৮)

দৌলত কাজির জন্ম চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে। অল্পবয়সে তিনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু দেশে তাঁর বিদ্যাবত্তা পাণ্ডিত্যের কদর না হওয়ায় তিনি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য সুদূর আরাকানে গিয়ে পৌছান। আরাকান রাজসভায় তখন বহু কবি, জ্ঞানী ও গুণীর ভীড়। দৌলত কাজী কি করে আরাকান রাজসভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁর কাব্য 'সতী ময়না' থেকে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানতে পারা যায় না। তবে তাঁর একটি উক্তি থেকে জানা যায়, রাজার প্রধান উজীর আশরাফ খান মজলিশ মুশায়েরা করে কাব্যলোচনা করতেন। এই ধরনের কোনো এক মজলিশে আশরাফ খান একদিন 'সাধন' নামক কোনো এক কবি কর্তৃক অবধি হিন্দী ভাষায় রচিত 'সতী ময়না'র কাহিনী শুনতে ইচ্ছা করেন। তখন দৌলত কাজী পাঞ্চালীর হন্দে ময়নার কাহিনী গুনিয়ে আশরাফ খানের ইচ্ছা পূরণ করেন। এতে করেই তিনি রোসাজ রাজ দরবারে কবিদের মধ্যে গৃহীত হন।

কবি দৌলত কাজী স্ফাঙ্ক কাজী বংশে সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খিরি খুধম্মার (১৬২২—১৬৩৮ খৃঃ) লঙ্কর উজীর আশরাফ খানের আদেশে কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন তা জানা যায় তাঁর কাব্যের শুরুতেই খিরি খুধম্মা ও আশরাফ খানের অজ্ঞপ্র প্রশংসা কীর্তনে :

“কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
 রোসাক নগরী নাম স্বর্গ অবতারী ।।
 তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে যুদ্ধাচার
 নাম শ্রী খুধম্মা রাজা ধর্ম অবতার ।।
 প্রতাপে প্রভাত জানু বিখ্যাত ভুবন ।
 পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ।।
 পুণ্য ফলে দেখে যদি রাজার জীবন ।
 নারকিহ স্বর্গপাত্র সাফল্য জীবন ।।”

* * *

“মুখ্য পাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান
 হানাফী মোজাহাব ধরে চিত্তিয়া খান্দান ।

* * *

শ্রীযুক্ত আশরাফ খান লঙ্কর উজীর
 যাহার প্রতাপ বন্ধে চূর্ণ অরি শির । (সতীময়না)

কবি অল্প বয়সেই মারা যান। ‘সতীময়না’ রচনা কালে তাঁর বয়স অনধিক চল্লিশ হতে পারে। ৬৪ হকের অনুমান মতে ১৬০০ খৃঃ এ কবি জন্মগ্রহণ করেন এবং সে শতকের দ্বিতীয় পাদে পরলোক গমন করেন। কাব্যখানি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি; তাঁর মৃত্যুর প্রায় একুশ বছর পরে মহাকবি আলাওল তাঁর অসমাপ্ত কাব্যখানি সমাপ্ত করেন।

“বাঙলায় হিন্দী, ফারসী রোমান্টিক কাব্য ধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাক দরবারের দুজন সভা কবি—দৌলত কাজী ও আলাওল” (সুকুমার সেন)। দৌলত কাজীর একমাত্র কাব্য ‘সতীময়না’ মোট তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কাব্যের নায়ক-নায়িকা এবং তাঁদের স্বভাবগত দোষগুণ গুলির সংগে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে কাব্যের নায়িকা ময়নাবতী বিরহের আগুনে পুড়ে বিষাক্ত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ময়নাবতীর বিরহের অবসান হলো এবং সে সংগে তাঁর স্বামী সৈয়দ ও সতীন চন্দ্রানীর

মিলন হলো। দ্বিতীয় খণ্ডের বারোনাসী এগারো মাস পর্যন্ত লিখেই কবি ইন্তেকাল করেন এবং কবির ইংগিত মত কাব্যটিকে মিলনান্তক করে কবি আলাওল দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

এ কাব্যের কাহিনী অংশ সাধারণ। নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য জীবনের একটি মাত্র দিকই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। এতে কোনো অবাস্তব ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ নেই। দৌলত কাজী ময়নার সতীত্ব ও বারোনাসী বর্ণনার ব্যাপারে সাধনের মৈনাসত'কে অনুসরণ করলেও লোর চন্দ্রানীর রোমাঞ্চ ও সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপ, মণ্ডলানা দাউদের 'চান্দাইন' (প্রথম হিন্দী অবধি রোমান্টিক কাব্য) কাব্য থেকেই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। 'চান্দাইন' কাব্যের ঘটনাগুলির সাথে 'চন্দ্রানী' কাব্যের প্রথম খণ্ডের ঘটনাবলীর যথেষ্ট মিল আছে। দৌলত কাজীর কাব্যের প্রথম খণ্ডের ঘটনাগুলি দাউদের 'চান্দাইন' ছাড়া আর কোথাও সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন কাব্য থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে দৌলত কাজী তাঁর কাব্যটিকে সমৃদ্ধতরো করেছেন ও ময়নার সতীত্বমূলক কাহিনীটি সাধনের 'মৈনাসত' থেকেই গৃহীত।

কবি মূল কাহিনীর ঘটনাকে সংক্ষেপ করে কাহিনীর সংহতির দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন এবং বাঙলাদেশের প্রকৃতির সংগে খাপ খাওয়াতে গিয়ে দাউদের কাহিনীর অনেকগুলি অংশ বাদ দিয়েছেন।

লোরক চান্দার গীতিকা বা কাহিনী আসলে একটা লোক গীতিকা। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের আধীরদের মধ্যে এবং মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় এলাকায় প্রচলিত এই কাহিনীটির সংগে মণ্ডলানা দাউদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিলো। লৌকিক সংস্কৃতির সংগে দাউদের এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং লোক গীতিকার কাব্যিক রূপায়ন তাঁর গণচেতনারই দর্শিল। ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অবধি ভাষায় দাউদের রোমান্টিক কাব্য রচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমির খসরু "লায়লী মজনু" "শিরী করহাদ" জাতীয় প্রেম কাহিনীর মাধ্যমে রূপক কাব্যের যে ইরানীয় ধারা এদেশে প্রচলিত করেছিলেন ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও দাউদ সেই ধারার সংগে বিশেষ কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করে দেশী ভাষায় দেশী প্রণয় গাঁথাকে কাব্যিক রূপ দিলেন। এই ঘটনা সে যুগের মুসলিম সমাজের একটি বিশেষ মানসিক প্রবণতার পরিচয় দেয়। চান্দাইন ও মৈনাসতের উপর ভিত্তি করে কবি দৌলত কাজী যে কাব্য রচনা করেছেন তা যে শুধু সার্থক চরিত্র চিত্রণেই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে একটি অনন্য সাধারণ কাব্য তা নয়, বাঙলা কাব্যে সর্বপ্রথম ধর্ম ও তত্ত্বকথা বর্জিত

কাব্যাদর্শেরও স্থাপিয়তা। এ কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ময়নাবতীর সতীত্ব, লোরের যৌবনচাঞ্চল্য ও কামনা, চন্দ্রানীর নটীপনা ও অসংযম, ছাতনের লাম্পটা, রওনা মালিনীর ধূর্ততা ও চাতুর্য সবই মানবিক স্বাভাবিকতায় ফুটে উঠেছে।

আল্লাহ্ ও রসুলের বন্দনাতে কাব্যটির শুরু। তারপর কবি রোসাংগ রাজের প্রশস্তি ও ফকির পৃষ্ঠপোষক ধর্ম-পাত্র লঙ্কর উজীর আশরাফ খানের গুণগান করে “লোরকরাজ ময়নার ভারতী” শুরু করেছেন। রাজকন্যা ময়নাবতী অপূর্ব সুন্দরী, তাঁর অংগের শীলায় অনঙ্গ বন্দী হয়ে আছে, তাঁর কাঞ্চন কমলের মতো মুখের কাছে পূর্ণশশী শরম পায়, চঞ্চল যুগল আঁখির কাছে নীলোৎপলও লজ্জিত—আর সে

“প্রিয়বাদী, পজিব্রতা সূলাস সুমতি
প্রত্যক্ষ শংকত সম সেবে নিজপতি
সর্বকলা যুতা সতী নূতন যৌবন
স্বামীর লোরক নাম নৃপতি নন্দন।।”

তাদের প্রেম ভালবাসা এতেই গভীর যে, ‘তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে দোহান আকুল।’ কিন্তু অমন প্রেম বেশীদিন স্থায়ী হলো না। লোরের চরিত্রেই অন্তর্নিহিত ছিলো অসংযম ও ভোগের স্পৃহা। আসলে স্বভাবের দিক দিয়েই তো পুরুষ বহু ভোগী—একনারী নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। সেই আদিম অতৃপ্তিতে লোর ময়নাবতীর প্রতি বিমুখ :

“যুবান পুরুষ জাতি নিঠুর দুবাস্ত
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শাস্ত।।”

লোর কিছু দিনের জন্য ময়নাবতীর হাতে রাজ্যপাট তুলে দিয়ে কুঞ্জ বিহারে চলে গেল। এই সময় পশ্চিমের গোহারী দেশের মোংরা নামক রাজার চন্দ্রানী নামক অপূর্ব সুন্দরী কন্যার খবর পায় লোর। বামন নামক এক বীর পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে গোহারীরাজ রাজ্যভার জামাতার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিয়েতে চন্দ্রানীর দুঃখের অবধি রইলো না। কারণ তার স্বামী মহাবীর হলে কি হবে, সে যে নপুংসক :

“সর্বগুণ যৌবনে সম্পূর্ণ বীর্যবল
রত্নিসর হীন মাত্র কিংগুক কেবল।।”
“মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি
নারী সঙ্গে রত্নিসরহীন মুঢ় মতি।।”

নিরুপায় চন্দ্রানী নানা কাব্যরস আলোচনা করে সময় গৌমান্ত (কাটায়) কিন্তু দূরন্ত যৌবন বন্যায় যার সারা সত্ত্বা বিক্ষুব্ধ কাব্য রসে তার সাত্ত্বনা কোথায়?

“শীতল মন্দিরে কন্যা নাহি রহে স্থির
মদন বেদনা চিন্তে আঁধি বরে নীর
হিততত্ত্ব উপদেশ না শুনে শ্রবনে
ক্ষণে আলাপএ ক্ষণে বিলাপে আপনে।”

কয়েকবার নপুংসক স্বামী প্রেম লাভের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে চন্দ্রানী প্রতিজ্ঞা করলো :

“এমত না হয় যদি স্বামী ব্যবহার
সহজে করিব শঠে শঠ সাধ সমাচার।”

নপুংসক স্বামীর সম্পর্ক ত্যাগ করে চন্দ্রানী পিতার আদেশ মতো তাঁরি জন্য নির্মিত এক সুরম্য প্রাসাদে দেবসেবায় আত্মনিয়োগ করতে গেলো—কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো, কারণ :

“যৌবন কালেত কন্যা বড় চিন্তা পাএ
অনঙ্গ ভুঞ্জঙ্গ বিষ সর্বাক্ষে বেড়াএ।”

যৌবনচঞ্চলা চন্দ্রানীর চিন্তে হাহাকার। একজন হৃদয়বস্ত্রভের সন্ধানে তার চিন্ত উনুখ। বছরে দু'বার করে চন্দ্রানী নগর ভ্রমণে বেরোয়, তখন তাকে উৎসবে সমাগত নানা দেশের রাজ কুমারেরা দেখে। এমনি এক উৎসবে চন্দ্রানীকে এক যোগী দেখতে পায়। সে শোরের কাছে চন্দ্রানীর বার্ভা নিয়ে যায়। সব কিছু বর্ণনা করে যোগী বললো:

“পুরুষের মধ্যে তুমি রূপে সুরপতি
স্ত্রীর মধ্যে চন্দ্রানী শচী কলাবতী
চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোহরম
বিদ্যাসংগে সুন্দরের যেন সমাগম।”

চন্দ্রানীর বর্ণনায় বিচলিত-চিন্ত শোর যোগীকে সঙ্গে নিয়ে গোহারী দেশে গেলো। ছয় মাস কেটে গেলে চন্দ্রানী দর্শনার্থী রাজাদের যখন ডাক পড়লো তখন তাদের সঙ্গে শোরও সাজসজ্জা করে রাজসভায় গেলো। চন্দ্রানী প্রাসাদের গবাক্ষ থেকে তাকে দেখে একদম মুর্ছিত হলো। পরদিন আবার সভা আহত হলে এবার মুর্ছিত হলো শোর।

এরপর লোর যোগীর বেশে চন্দ্রানীর মন্দিরে গিয়ে চন্দ্রানীর সাথে মিলিত হল। মন্দিরে চন্দ্রানীর নিজে গলার মালা ছিড়ে লোরের গলায় পরিয়ে দিয়ে পিতামাতা ও নপুংসক স্বামীর অগোচরে লোরকে স্বামীত্ব বরণ করে নিলো। এরপর প্রতি রাতে রশি বেয়ে উঠে লোর চন্দ্রানীর শয়ন গৃহে প্রবেশ করে চন্দ্রানীর সাথে মিলিত হতে লাগলো। কিছুদিন পর যখন স্তনলো স্বামী মহাবীর বামন তার নিকট আসবে তখন লোর চন্দ্রানীতে মিলে পরামর্শ ঠিক হয়ে গেলো:

“সেই ভালো তুমি আমি যাই দেশান্তর
এড়াইনু বামন ক্রোধ কলঙ্ক দুকর।”

যেমন কথা তেমন কাজ। লোর ও চন্দ্রানী পালিয়ে গেলো। বামন রেগে মেগে অস্থির হয়ে বেরোলো চন্দ্রানীর খোঁজে—তারপর গভীর অরণ্যে একদিন লোরের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলো—বামন তীব্র ভাষায়, “পরনারী অপহরণকারী, অধর্মী, মৃত্ অবোধ লোরকে আক্রমণ করলে লোর ব্যঙ্গ করে বললো—

‘খর্ব কাপুরুষ যেই নপুংসক ক্রিয়া
পুরুষ উত্তম স্থানে ত্যজে তার প্রিয়া,
পুরুষ ভমরা জান মধু যথা পাএ
সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলাএ
* * * *
আমারে বলসি চোর না করি বিচার
ভার্য্যা না ইচ্ছএ স্বামী কপাল তোমার।”

কথা কাটাকাটির পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বামন নিহত হলো, বনে সর্পাঘাতে চন্দ্রানী হতচেতন হয়েও এক মুনির বনৌষধিতে বেঁচে গুঠে। বৃদ্ধ গোহারীরাজ এবার নিজেই কন্যা চন্দ্রানীকে তুলে দিলেন লোরের হাতে :

“কুলের চন্দ্রিকা তুমি কুমারী চন্দ্রানী
সেই ভাল হৈল হৈছে তোমার রমনী।”

নব দশতিকে নিয়ে এসে গোহারীরাজ রাজ্যভার লোরের হাতে তুলে দিলেন। কাব্যের প্রথম খণ্ড এখানেই শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নাবতীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বামী-প্রেম ও বিরহবেদনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লোর যখন চন্দ্রানীকে নিয়ে সজোগ সুখে নিমগ্ন, বিরহিনী ময়নাবতী তখন

সতত দেব পূজা, পতির মঙ্গল চিন্তা ও প্রজ্ঞা সাধারণের মঙ্গল সাধনে নিরতা। স্বামী ও সতী সঙ্গীতের সব কিছু শুনে তার চিত্ত বিকারশূন্যই রয়ে গেলো, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা একটু কমলো না। পতি-বিরহিনী ময়নাবতীর রূপ গুণের কথা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। নরেন্দ্র নামক কোনো এক নৃপতির পুত্র ছাতন ময়নাবতীকে পাওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে রওনা নামক এক মালিনীকে ময়নাবতীর কাছে পাঠায়। ময়নাবতীর নিকট গিয়ে নিজেকে ময়নার ‘দুগ্ধদাত্রী ধাইমা’ রূপে সে পরিচয় দেয়। ময়নাবতী ময়নাবতী তাকে তার দুগ্ধদাত্রীরূপে বিশ্বাস করে অনেক আদর যত্ন করে। রওনা ময়নাবতীর বেশভূষার দৈন্য ও তার চেহারার মলিনতার কথা তুলে বললো :

“নয়নে অঙ্কন নাহি সীথেত সিন্দুর
ত্রিভঙ্গ খোপার লাস না দেখি তোহোর।”

* * * *

“কোন দুগ্ধে সুখ ভোগ ত্যজ ময়নাবতী
আজ্জ্বল জনক তোর আছে ছত্রপতি।”

কিন্তু তাতেও ময়নাবতীর মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য এলো না। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সংগে সতী ময়না বললো :

“এক এক করি মুখিঃ নিমু নিজ প্রাণ
জগতে দোসর নাম না লইনু জ্ঞান।
কাটউক সে নারীর হৃদয় দারুন।
এক ছাড়ি ভাবএ যে দোসরক পুন।
মোহর ভ্রমরা স্বামী জগত পূর্জিত
গোধরের কীট কোথা ভ্রমরা তুলিত।”

ধনে, বচনে, কিছুতেই যখন লোরবণিতা ময়নাবতীর মন পাওয়া গেলো না, তখন ছাতনের সাথে তার মিলন ঘটিয়ে দেবার উপায় কি? অনেক ভেবে চিন্তে রওনা এবার তাঁর মোক্ষম অস্ত্র নিক্ষেপ করলো, ময়না কি জানে না, সংসারে সবই মেলে, কিন্তু যৌবন একবার চলে গেলে আর কিরে পাবার উপায় নেই?

“জীবন যৌবন রূপ চলএ নিমেষে
নারী বৃদ্ধ হৈলে তারে না পুছে পুরুষে।
যৌবন চলিয়া গেলে বিফল জীবন
সংসারে না রৌক যার বিফল জীবন।”

দুর্লভ বৌবন জান লোকের কুশল
 যদি গেল কুশল কোথাতে কুতুহল
 ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপার্জনে পাএ
 অগ্নি শেষ হৈলে পুনি পাথরে জন্মাএ ।
 চক্রসূর্য অস্ত গেল পুন উগীয়াএ
 বৌবণ চলিয়া গেল পলটি নপাএ
 কৃপণের ধন যেন মুর্খের বৌবন
 কালে না খাইলে শেষে শোকের ভাজনা ॥”

ময়নার মুখে কোনো কথা নেই । তার নীরবতায় রওনা ভাবলো ময়নাবতীর অন্তরে
 তার কথা কারি করেছে । উৎসাহিতা রওনা তাই বার মাসে বিরহিনীদের দুঃখ এক এক
 মাস করে বলতে শুরু করে । ময়নার নীরবতা “প্রলয় ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন”—

তারি প্রমাণ পাওয়া গেলো ময়নাবতীর বিস্ফোরণে । প্রত্যেক মাসের পর ময়নাবতী
 এক একবার নির্মম উত্তর দিতে থাকে । তার কপালে যদি দুঃখ থেকেই থাকে তার
 জবাব—“লাখ উপাএ মেটিতে কো পারএ, জো বিধি লিখিল ললাট?” আষাড় ও শ্রাবণ
 মাসে বিরহিনীদের দুঃখযাতনা যখন রওনা বর্ণনা করলো—ময়নাবতী বললো :

“মোহোর সূনাগর গুণের সাগর
 মধুর মুরতী বেস
 সো মধু ভেজিতে কৈছনে বিখ পানাও
 ভাল খাঞ্জি কহ উপদেশ ।”

কারণ :

লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ
 কোথাএ গোঘর কীট কোথাএ মহপ,
 গরল সদৃশ পর-পুরুষ সংগা
 ডংসিআ পলাএ হেন কাল ভুজংগা ।”

রওনার সমস্ত ছলাকলাই নিষ্ফল হলো । ময়নাবতীকে সে কিছুতেই বিচলিত করতে
 পারলো না । ইত্যবসরে ময়না রওনার স্বরূপ ধরতে পেরেছে—তার উপদেশে ময়নার
 সখীরা :

“কুটনীর বেশ ধরি বহুল ছাড়াইল
 বিস্তর মারিখা হেটে কোমাইল দৌলি
 মস্তক মুড়াই মুখে দিল চুল কাশি
 ভ্রমাইল নগরে গর্ভজ হুড়াইয়া
 প্রাণে না মারিল খাঞ্জি বধ বিবেচিয়া।”

কাহিনীটির দ্বিতীয় খণ্ডে এখানেই শেষের এক লক্ষ্যে ছুটিয় খণ্ডটি রচনা করেন মহাকবি আলাওল। এই খণ্ডে তিনি যেসব অবতারের গল্পের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে রওন মল্লিকা ও মদন মঞ্জুরীর প্রসঙ্গ এবং আনন্দ বর্মার কাহিনীই মুখ্য। সতী নারী ধৈর্যশীলা হলে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন অবশ্যজ্ঞাবী—এ সত্য প্রচারের জন্য এ কাহিনীগুলির অবতারণা। আলাওল লোরের সাথে ময়নাবতীর মিলন ঘটায় কাহিনীটির উপসংহার করেছেন।

দৌলত কাজীর একটি বাক্যেরই পাণ্ডা গোছে তাও অসমাপ্ত কাব্যটিতেই কবি তাঁর প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা সে যুগের বিচারে বিস্ময়কর। আলাওল পাণ্ডিত্যে অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ দৌলত কাজী থেকে কিন্তু রচনার দৃষ্টিতে, ভাষার মাধুর্যে এবং অল্পকথায় বা একটি ক্ষুদ্র উপমায় অধিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতায় তিনি আলাওল থেকে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। স্বভাবজাত কবিত্ব শক্তির দিক দিয়ে দৌলত কাজী সপ্তদশ শতকের কবিদের মধ্যে অতুলনীয়।

(৩৫) চকুর্ডা নগর শিচ্যাকা (১৫)

সম্রাট তিচাক্রব : নতানর কবর দী (খ) সম্রাটদলীক বিচাক্র জাতকভার মারবো
 চকুর্ডা নগর চকুর্ডা নগর (আঃ ১৬০০-১৬৪৫)
 দৌলত কাজীর সমসাময়িক কবি মরদানের জনস্বাম চাম্বামের রাউজান গ্রামের সুলতানপুর গ্রাম। এই গ্রামে দৌলত কাজীও জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দৌলত কাজীর কর্মক্ষেত্রের মতো মরদানেরও কর্মক্ষেত্র হয়েছিলো বোসাল। মরদানের একমাত্র কাব্য ‘নসিবা নামা বা নসিরা নামা’ পাঠে জানা যায়, তিনিও জায়াকানবাজ গুধম্বার অনুগ্রহ লাভে ধনা হয়েছিলেন। তিনি তখন বোসালের ‘কাজী’ নামক স্থানে বাস করতেন বলে ডঃ হক অনুমান করেছেন। বোসালে কাজী নগরের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :

“সে রাজ্যেতে আছে এক কাঞ্চী নামে পুরী
 মুমিন মুসলমান কত বৈসে সে নগরী।
 আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কোরান
 কায়স্থ বয়সে শিখ সৈয়দ পাঠান।
 ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বসয়ে পণ্ডিত
 নানা কাব্য রস কহ এ পুরিত।

কবি এই মৌলিক কাহিনী কাব্যটিতে অদৃষ্টের অমোঘতা গল্পের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কাহিনীর চরিত্রগুলো মুসলমান। দুই বন্ধুর মধ্যে প্রতিজ্ঞা- ভাষ্যক্রমে এক বন্ধু প্রচুর মাল-মান্তার অধিকারী হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, কিন্তু পরে আবার বিস্ময়জনক হয়ে প্রতিজ্ঞা পালনে বাধ্য হয়। অদৃষ্টের লিখন যে খঞ্জনো যায় না তাই প্রতিপাদিত হয়েছে এই গল্পের মাধ্যমে। এ কাব্যে বর্ণিত কাহিনীগুলি যে পূর্ব থেকেই এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ছিলো তা কবির জবানী থেকেই জানা যায়। কবি এই সুপরিচিত কাহিনীগুলির সাহায্যেই মানব জাণের একটা দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। সম্পূর্ণ স্থানীয় উপাদানে কাব্যটি রচিত বলে সাহিত্যের ইতিহাসে এর একটা বিশিষ্ট মর্যাদা চিরকালই থাকবে।

(গ) কোরেশী মাগন ঠাকুর (১৬)

রোসাস রাজসভার বাঙালী কবিদের মধ্যে কবি মাগন অন্যতম। ‘চন্দ্রাবতী’ নামে মাগনের একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে। চন্দ্রাবতীর ‘মাগন’ আর আলাওলের আশ্রয়দাতা ‘মাগন’ যে একই ব্যক্তি এ হচ্ছে ডঃ হক ও সাহিত্য বিশারদ সাহেবের অভিমত। এ জন্য তাঁরা চন্দ্রাবতীর বিভিন্ন কবিতা বিশ্লেষণ এবং আলাওলের বিভিন্ন কাব্যে মাগনের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে “আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগনের সহিত “চন্দ্রাবতীর” কবি মাগনের অনেক বিষয়ে ছবছ মিল রহিয়াছে। আকস্মিকভাবে দুই একটি বিষয়ের মিল হইতে পারে, এতগুলি বিষয়ের একত্র সমাবেশে স্বতঃই মনে হয় দুই ব্যক্তি এক; সম্ভবত কবির স্বরচিত আত্মকাহিনী আবিকৃত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অনুমান অসত্য হইবার কোনো কারণ দেখি না।”

এ ব্যাপারে ডঃ সুকুমার যেন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, “আলাওলের আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।” মাগন ঠাকুর ছিলেন আরাকানের রাজপুত্র, অতএব মগ। মগেরা হিন্দু না হউক, মুসলমান ছিলো না। ঠাকুর নাম মাগনের “অমুসলমানত্বের বশেষ্ট প্রমাণ বলে ডঃ সেনের ধারণা। অথচ ‘সয়ফুল মুদ্দক ও বদিউজ্জামাল’ গ্রন্থে ও পদ্মাবতীতে আলাওল তাঁর আশ্রয়দাতা মাগনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :

“সিন্দীক বংশেত জন্ম, শেখজাদাজাত
কুলে শীলে সৎকর্মে ভূবন বিখ্যাত ।
এক মহা পুরুষ আছিল সেই দেশে
মহাসত্য মুসলমান সিন্দীকের বংশে ।” (পদ্মাবতী)

কাজেই মাগন যে মগ ছিলেন না, আরব বংশজাত অভিজাত মুসলমান ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি যে “কোরেশী শেখ বংশজাত সিন্দীকী গোত্রভুক্ত মুসলমান ছিলেন, সাহিত্য বিশারদ ও ডঃ হকের এই বক্তব্য অনেকখানি যুক্তি নির্ভর। নিঃসন্দান মা-বাপ আল্লাহর কাছে বহু কান্নাকাটি করে মেগে পেয়েছিলেন তাঁকে, তাই তাঁরা পুত্রের নাম দিয়েছিলেন মাগন। রোসাঙ্গরাজ খিরি ঋধম্মার রাজত্বকালে মাগন এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। রোসাঙ্গরাজ খদেমিস্তার (আলাওলের পৃষ্ঠপোষক সাদ্ উমেদা) যখন মারা যান (১৬৪৫—১৬৫২) তখন তাঁর পুত্র খিরি ঋধম্মা একেবারেই শিশু। এহেন শিশুর পক্ষে রাজ্য চালানো সম্ভব নয়—খিরি ঋধম্মার বিধবা জননীর এ ব্যাপারে কোনো সংশয় রইলো না। তাই প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য তিনি নিজেই চালাতে থাকেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য মাগন ঠাকুরকে প্রধান উজীর পদে বহাল করেন। মাগনের পিতা বড় ঠাকুর রোসাঙ্গরাজের সমরসচিব ছিলেন।

আরবী, ফারসী, বর্মী ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত, সংগীত, নাট্য-কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী, ভৈষজ্য, যাদু ও অন্যান্য বিদ্যায় পারঙ্গম কোরেশী মাগন ছিলেন উদার, দানশীল, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক ও পোষক। তাঁর জন্মস্থান সন্দেহে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি, কবি ছিলেন রোসাঙ্গ প্রবাসী। তাঁর কাব্য চন্দ্রাবতীর ভাষা আলোচনা করে তাতে খাস চট্টগ্রামী চলতি বুলির এমন কতকগুলি ব্যবহার পাওয়া গেছে যা একমাত্র চট্টগ্রামী লোকের পক্ষেই সম্ভব। এই যুক্তিতে ডঃ হক ও সাহিত্য বিশারদ সাহেব অনুমান করেন—কবির বাড়ী চট্টগ্রামেরই কোথাও হওয়ার

স্বল্পবর্ণাধারী অক্ষরসমূহ বিক্ষিপ্তবর্ণিত বলে মনে হয় না। যাই হোক কবির কর্মস্থল
রৌপ্যবর্ণিত।

কর্তব্যে গান করি চন্দ্রাবতী : ১৭২ চন্দ্রাবতী
চন্দ্রাবতী একটি মিলনাস্তক কাহিনী কাব্য। 'বীরভান এবং চন্দ্রাবতীর মিলন
চন্দ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভান ও
দেখানোই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। চন্দ্রাবতী নামের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভান ও
নামে নয়, কাজেও বীর পুরুষ। চন্দ্রাবতী সিংহল বা সরদীপের রাজা সুরপালের কন্যা।
রূপে-গুণে অনন্যা কন্যা চন্দ্রাবতীর কথা শুনেই বীরভান যেমন দেওয়ানা হলো,
চন্দ্রাবতীও তেমনি বীরভানের কথা শুনে তার প্রতি গভীর আসক্ত হয়ে পড়লো।
'জালিয়া' 'গোরাব' প্রভৃতি হাজার ডিংগা সাজিয়ে বীরভান সিংহলে যাত্রা করে, তার সঙ্গী
হলো প্রধান মন্ত্রীপুত্র, তার প্রিয় বন্ধু 'সূত'। পথে অনেক ঝড়তুফানের সাথে সংগ্রাম করে
বীরভান সরদীপ পৌছে পৌঁতে পেলো চন্দ্রাবতীর জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। যাই হোক
শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব বানচাল হয়ে গেলো এবং বীরভানের সাথেই চন্দ্রাবতীর বিয়ে হলো।

চন্দ্রাবতী নামের রাজা
কবির ক্ষমতা
উৎসাহের
স্বল্পবর্ণাধারী
সামুদ্রিক দৃশ্য এবং বর্ষার বর্ণনায় বাস্তব এবং
অন্যদের
একটি জনপ্রিয় রূপকথা
কবির মৌলিকতার প্রমাণ।

১৭ চন্দ্রাবতী ভাষার নমুনা স্বরূপ বর্ষার বর্ণনা উদ্ধৃতিযোগ্য :

ভাষার

"বরিষার মেঘে যেন বরিষয়ে ধারা।

চন্দ্রাবতী

বসন ভিড়িল নিত্য নয়নের ঝারা।

বসিয়া চাতক বৃক্ষে বলে পিউ পিউ।

৮

বান হানে তার স্বরে দেহা প্রাণ জিউ।"

বীরভানের রূপ বর্ণনা :

"সিংহল দীপেতে যে কুমার বীরভান

নিশি অন্ধকারে যেন তানু দীপ্তিমান।"

চন্দ্রাবতীর বীরভানের কথা শুনে :

"প্রতিদিন চন্দ্রাবতী কন্যা সূচরিতা,

কুমারের রূপ ধ্যান করে গুণযুতা।"

আলাওল

আরাকান রাজদরবারে বাঙালী কবিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন মহাকবি আলাওল। মধ্য যুগের হিন্দু-মুসলিম বাঙালী কবির মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে, সৃষ্টির অজস্রভায়ে, পরাময়ুর দীর্ঘতায় নিঃসন্দেহে তিনি মধ্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি।

কিন্তু অতো বড়ো কবি হওয়া সত্ত্বেও আলাওলের জনস্বান^১ ও সমাধিস্থান নিয়ে আজো বিতর্কের অবসান হলো না। মরহুম আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদ, ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো এবং ডঃ এনামুল হক তাঁকে চট্টগ্রামের কবি বলে দাবি করেছেন। সুদীর্ঘ তিনশো বছর ধরে চট্টগ্রামে আলাওলের কাব্যের যে ব্যাপক চর্চা হয়েছে এবং সারা চট্টগ্রামে তাঁর যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে, তাতে কবিকে চট্টগ্রামের কবি মনে করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আলাওলের গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি প্রধানত চাটগাঁয়েই পাওয়া গেছে। এ যুক্তিও উপরোক্ত দাবীকেই জোরদার করে। ১৭৫৬ খৃঃ অঃ পর্যন্ত শংখ নদ থেকে রামু পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ চট্টগ্রাম আরাকান রাজারা শাসন করতেন। রাজধানী রোহাং বা রোসানের নামে এই এলাকাকেও রোহাং বা রোসাঙ্গ বলা হতো। রোসাঙ্গ রাজধানীর সাহিত্য এই অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সে জনপ্রিয়তা উত্তরাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। আলাওলের জনাভূমি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ এই কারণেই ঘটেছে যে; কবি তাঁর কর্মক্ষেত্র এবং পৃষ্ঠপোষকদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সত্ত্বেও নিজের জনাভূমি ও পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে নীরব। কবি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে বলেছেন :

“মুলুক কতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান

তাহাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান

* * * *

মজলিস কুতুব তথতি অধিপতি

মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি।”

‘সন্নকুল মুলুক বদিউজ্জামাল’ কাব্যেও একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাইঃ

“গৌড় মধ্যে প্রধান কতেয়াবাদ দেশ

* * * *

মধ্য ভাগে বহে তার গঙ্গা ভাগিরথী।

মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর

তাহান অমাত্য সুত মুজি সে পামর।”

মহাকবি আলাওল কবি দৌলত কাজির অসমাণ্ড কাব্য “সতী ময়না লোর চন্দ্রানী”র অষ্টম খণ্ডটি রচনা করেন। এখানেও কবির মুখে একই উক্তি :

“গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ

* * * *

মধ্যে ভাগিরথী ধারা বহে অনুকণ
মজলিস কুতুব এখানেে অধিপতি
তাহান অমাত্যসূত মুই হীন মতি।”

অন্যতম কাব্য ‘সেকান্দার নামার’ও অনুরূপ উক্তি দেখতে পাই :

“গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ ভূম

* * * *

ভাগিরতী গঙ্গাধারা বহে মধ্য রাজ্য
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়
মুই ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়।”

আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি কর্তৃক বার বার গৌড়, ফতেয়াবাদ, জালালপুর, মজলিস কুতুব এবং গঙ্গা (নদী অর্থে) ভাগিরথীর উল্লেখ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ডঃ এনামুল হক বলেন— “১৬০৭ খৃঃ-এর কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জোবরা নামক গ্রামে আলাওলের জন্ম হয়। এই গ্রামে আলাওলের দীখির পাড়ে আলাওলের মসজিদ ও কবর এখনো তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্যপুত্র ছিলেন। এই ফতেয়াবাদ করিদপুর জেলার ‘সরকার ফতেয়াবাদ’ নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। হালদা ও শংখ নদীর মিলন স্থলে অবস্থিত ‘ফতেয়াবাদ’ই কবির উল্লেখিত ‘ফতেয়াবাদ’ বলে ডঃ হক মনে করেন। ডঃ হকের এই যুক্তি খুবই দুর্বল মনে হয়। জনাব আহমদ শরীফ বলেন— ‘জালালপুর, মজলিস কুতুব ও ভাগীরথী বিশেষত শেখোক্ত নামটিই নিশ্চিত প্রমাণ যে, আলাওল করিদপুরস্থ ‘ফতেয়াবাদ রাজ্য’ ও রাজা মজলিস কুতুবকেই নির্দেশ করেছেন।’ এই ফতেয়াবাদ (আধুনিক করিদপুর) ছিলো ‘মজলিস কুতুবের রাজ্য’। ঈসা খানের পুত্র চুইয়া সর্দার মুসা খানের সঙ্গে মজলিস কুতুবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মজলিস কুতুব সঞ্চার করেও শেষ পর্যন্ত মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিত্তির ১৬০৮-১৩ খৃঃ) নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আকবরের আমলে করিদপুর,

যশোহর বা বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালী— এ কয়টি জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিলো ক্ষতেন্নাবাদ পরগণা। মজলিস কুতুবের আমলে এর আয়তন অনেক সংকুচিত হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। এই ক্ষতেন্নাবাদ পরগণার জালালপুরেই আলাওলের পিতার কর্মভূমি ছিলো। কিন্তু এ তাঁর পিতার জন্মভূমি কিনা এ ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না। হতে পারে জালালপুরেই কবির জন্ম হয়, কিংবা এও হতে পারে, পিতা কর্মব্যাপদেশে যখন সপরিবারে জালালপুরে আসেন, তখন বালক আলাওলও মা-বাপের সাথে জালালপুর আগমন করেন। এ সবই অনুমান মাত্র। একবার কার্যহেতু কবি তাঁর পিতার সঙ্গে নৌকাযোগে বেড়িয়েছিলেন। বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল তখন মগ দস্য ও হার্মাদদের (পর্ভুগীজ দস্যুদের) উপদ্রবে বিপর্যস্ত—কবিও এদের হাতে পড়লেন—

“দৈবগতি কার্যহেতু যাইতে নৌকা পছে
 দরশন হইল হার্মাদ সহিতে
 শহীদ হইল বাবা খুনি বহুতর
 রণক্ষেত্রে রোসাদে আইলু এসর
 নিজ দুঃখ কথেক কহিমু বিরচিয়া
 রাজ-আসেয়ার হেলু এখাত আসিয়া।”

আলাওল ‘রাজ আসোয়ার’ তথা রাজার দেহরক্ষী অন্নারোহী বাহিনীতে যোগদান করলেন। মহাকবির প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্মেছেন, তিনি হলেন সৈনিক। কিন্তু কঠিন বর্মের আড়ালেও প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখা যায় না। আলাওলের কবি প্রতিভার কথাও জাহির হয়ে পড়ে। আরাকানের দু’জন নৃপতি সদস্য কেওদার (খন্দো মিস্তার, ১৬৪৫-১৬৫২ খৃঃ) এবং খিবিসাজ খুদম্মার (চন্দ্র সুধর্মী, ১৬৫২-১৬৮৪ খৃঃ) রাজত্বকালে মাগন ঠাকুর, সোলায়মান, সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহম্মদ খান ও নব রাজের আদেশে আলাওল ‘পদ্মাবতী’, ‘রতন-কলিকা আনন্দ বর্মা উপাখ্যান’, ‘সয়কল মুহুক বদিউজ্জামাল’, ‘সও পয়কর’, ‘তোহফা’, ‘সেকান্দর-নামা’ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। ১৬৬০ খৃঃ শাহ সূজা যখন মগ রাজা কর্তৃক সবংশে নিহত হন তখন কবির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। মীর্জা নামক জনৈক মন্দ স্বভাব লোকের ষড়যন্ত্রে কবিকে কিছুকাল কারাবাস ভোগ করতে হয়। পিতৃতুল্য মাগনের তিরোধানের কয়েক বছর পর থেকে তাঁর আশ্রয়দাতার অভাব ঘটেনি কখনো। তথাপি কবি জীবনে সুখী ছিলেন না। এদের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর কাছে ভিক্ষাতুল্য মনে হয়েছে। দীর্ঘজীবী কবি রোসাদেই দেহত্যাগ করেন, জোবরা গ্রামে নয়,

এ ব্যাপারে জনাব মাহবুবুল আলম স্থিরনিশ্চিত। সেকালের রোহাং বা রোসাজ শহর চট্টগ্রামবাসীদের নিকট 'শাখুরে কিছা' নামে পরিচিত। রোসাজ নগরীর ধ্বংসস্থাপ নিয়ে এই এলাকা। 'কৈদার ভগ্নাবশেষ এখনো বিদ্যমান, এখানে আলাওলের কবর আছে এবং এখানকার সাতটি মসজিদের একটি নাম 'আলাওলের মসজিদ'। চট্টগ্রামে আলাওলের জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে জনাব আহমদ শরীক বলেন— "চিরকাল চাটগাঁবাসীরা যে আলাওলের পুঁথির পাঠক ও ধারক, তা তাঁর চাটগাঁয় বাড়ি বলে নয়, চাটগাঁ আরাকান সংলগ্ন ও আরাকান অধিকারে ছিল বলে। ১৫৮৬ থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান ও গোটা চট্টগ্রাম নিয়েই ছিল রোসাজ রাজ্য।" কলকাতার সাহিত্যকে যেমন বাঙলা দেশের সাহিত্য বলা যায় ঠিক তেমনি একই যুক্তিতে রোসাজের সাহিত্যকেও চাটগাঁর সাহিত্য বলে অভিহিত করা যায়।

এ পর্যন্ত মহাকবি আলাওলের চারখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ও একটি আংশিক কাব্য পাওয়া গেছে। 'সতী ময়না লোর চন্দ্রানী'র সমাপ্তি বন্দ আলাওলের রচনা, একথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কাব্যগুলির নাম 'পদ্মাবতী', 'হকত পয়কর', 'তোহফা', 'সয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল' ও 'সিকান্দর নামা'।

আলাওলের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদমাবৎ' নামক রূপক কাব্য অনুসরণে এ কাব্যটি রচিত। খেদোমিশ্তারের রাজ্যাভিষেকের কিছুকাল পরে সম্ভবত ১৬৪৭ খৃঃ-এ আলাওল বন্দী হিসেবে রোসাজে আনীত হন, তখন কবি ৪২/৪৩ বছরের প্রৌঢ়। তিনি যখন ১৬৫১ খৃঃ-এ 'পদ্মাবতী' রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ৪৬/৪৭ বছর। মাগন ঠাকুরের আজ্ঞা পেয়ে তিনি 'পদ্মাবতী' পুস্তক রচনা করেন। কাব্যখানি যে মুহম্মদ জায়সীর কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ, সে সম্পর্কে আলাওলের উক্তি নিম্নরূপ :

“এই সূত্রে কবি মোহাম্মদে করি ভক্তি

স্থানে স্থানে প্রকাশিলুং নিজ মন উক্তি।”

আসলে কবি জায়সীর কাহিনীকে ইচ্ছা মতো ভেঙ্গে গড়েছেন। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর পত্নিনী হরণের কাহিনীক কাহিনী অবলম্বনে জায়সীর রূপক কাব্যটি রচিত। এই কাহিনী ভিত্তিহীন জনশ্রুতি বদে প্রমাণিত হয়েছে। কাব্যের উপসংহারে জায়সী 'পদ্মাবতী' কাহিনীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটুকু নিজেই খোলাসা করে দিয়েছেন— “চৌদ্দ ভুবনের সব কিছু আছে মানুষের ঘটে। চিতোর হচ্ছে মানবদেহ, রাজা রত্নসেন

মন, সিংহল হৃদয়, পদ্মাবতী (পদ্মিনী) বুদ্ধি, শুক পথনির্দেশকারী গুরু, রত্নসেনের প্রথমা পত্নী নাগমতী দুনিয়া-খান্না, রাঘব চেতন শয়তান, আলাউদ্দিন সুলতান মায়াদ।” আলাওলের হাতে এই অধ্যাত্ম তত্ত্বের রূপক কাব্যটি একটি খাঁটি রোমাঞ্চে পরিণত হয়েছে। মূলের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে কাব্যানুবাদ খুবই কঠিন কাজ; মহাকবি আলাওল এ কঠিন কাজে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন; বহুক্ষেত্রে তাঁর রচনা আন্তরিকতা, প্রাঞ্জলতা ও বলিষ্ঠতার গুণে মূলের সৌন্দর্যকেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে কবি যে সুপণ্ডিত, নানা শাস্ত্রে, নানা ভাষায় তাঁর জ্ঞান যে সুগভীর, তাঁর কাব্য পাঠকালে এ সত্যটি কখনো বিস্মৃত হওয়া যায় না, এই তাঁর রচনার দুর্বলতার দিক। অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের ভারে কাব্যরস অনেক সময় চাপা পড়ে গেছে এবং চিত্রগুলি ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

আলাওল ১৬৬০ খৃঃ-এ আরাকানের রাজসচিব হৈয়দ মুহম্মদ মুসার আদেশে পারস্যের মহাকবি নিজামী গজাবীর ‘হুগু পয়কর’ নামক কাব্যের অনুবাদ করেন। ‘হুগু পয়কর’ নিজামী গজাবীর ‘খামস’ বা পঞ্চরত্ন কাব্যের অন্যতম। তাঁর পাঁচটি কাব্য হচ্ছে ‘মখজানুশ আসরার’, ‘বশরু ও শিরি’, ‘লায়লী ও মজনু’, ‘হুগু পয়কর’, ও ‘সিকান্দর নামা’। ‘হুগু পয়কর’ সাতটি গল্প বা কাহিনীর সমষ্টি। নিজামীর অপর কাব্য ‘সিকান্দর নামা’, ‘নবরাজ’ উপাধিকারী মজলিস নামক রাজ আমাত্যের নির্দেশানুযায়ী অনূদিত। এ কাব্যের রচনা শুরু হয় আরাকান রাজকর্তৃক রাজা নিহত হওয়ার ১০/১১ বছর পরে অর্থাৎ ১৬৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে।

মাগন ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে আলাওল ‘সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল’ কাব্যটি কোনো এক ফারসী গ্রন্থ অবলম্বনে রচনা শুরু করেন। ১৬৫৯ খৃঃ-এ শূজা আরাকানে আশ্রয় নেবার পূর্বেই মাগন ঠাকুর লোকান্তরিত হলে কবির উৎসাহ ভঙ্গ হয়। শূজা হত্যার প্রায় নয় বছর পরে সৈয়দ মুসার আদেশে আলাওল এ কাব্য সমাপ্ত করেন। সৈয়দ মুসা সিলেট থেকে আরাকানে এসে আরাকান রাজ্যের বন্ধুত্ব অর্জন করেন। পরী ও মানুষের প্রেম কাহিনী নিয়ে ‘সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল’ নামক কাব্যটি রচিত। কাব্যটি প্রায় রূপকথা ধরনের। তবু আলাওলের রচনার গুণে এ কাব্য বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়। আলাওলের বর্ণনা খুবই সুন্দর। তবু ‘পদ্মাবতী’ কাব্য হিসাবে এ কাব্য থেকে উৎকৃষ্টতরো।

‘রতন-কলিকা আনন্দ বর্মা উপাখ্যান’ কাজী দৌলতের (১৬২২-৩৮) অসমাণ্ড ‘সতী ময়না লোর চন্দ্রানী’ গ্রন্থের সমাপ্তি খণ্ড। শ্রীমন্ত সোলায়মানের আদেশে মহাকবি আলাওল এ খণ্ডটি রচনা করেন। মূল কাব্যের সঙ্গে এ কাব্যটি রচনা ও পরিকল্পনার দিক

দিয়ে ঠিক খাপ খায়নি, এর কারণ দু'জনের কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। সহজ কবিত্ব শক্তির বিচারে কাজি দৌলত আলাওল হতেও শ্রেষ্ঠ।

আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, ইসলামী ও হিন্দু শাস্ত্রে এবং সঙ্গীত ও যুদ্ধ বিদ্যার অভিজ্ঞ ও পারদর্শী, মহাকবি আলাওলের সমগ্র রচনায় যেমন বৈদগ্ধ্যের ছাপ অংকিত হয়েছে, তেমনি রাগ-তাল-সঙ্গীতের অধ্যাপনা ও ঋণ কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও আলাওলের প্রতিভা ছিলো সৃজনধর্মী।

হুগ পয়করের পরেই আলাওল ফারসী কবি সুফী সাধক গদা শেখ দেহলভীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তোহফাতুল নেসায়ের' বাংলায় তর্জমা করেন 'তোহফা' নামে। শেখ ইউসুফ তাঁর পুত্র আবুল ফতেহ-এর শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে আরবী কেতাব অবলম্বনে ফারসী কাব্যটি রচনা করেন। আলাওল আবার এই ফারসী কাব্য বাঙলায় ভাষান্তরিত করেন। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী 'ফরাজ, সুন্নত ও শিষ্ঠাচার' সম্বন্ধে আলোচনাই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বাঙলা ভাষায় মুসলিম ধর্মীয় কাব্যের ইতিহাসে এ কাব্যের ঐতিহাসিক ও আদর্শিক মূল্য সংশয়াতীত। চট্টগ্রামের কবি শেখ মুতালিবের 'কিফায়তুল মুসল্লিন' (১৬৫১ খৃঃ-এ রচিত) এ দিক দিয়ে পথিকৃৎ এবং শ্রেষ্ঠতরো গ্রন্থও বটে। তোহফা মধ্য যুগের বাঙলা কাব্যে আমাদের ধর্ম বিষয়ক দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

(৬) সপ্তদশ শতকের আরও কতিপয় কবি :

সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রামে আরো কতিপয় কবির আবির্ভাব ঘটে, এঁদের মধ্যে মুহম্মদ ফসিহ, মীর মুহম্মদ শফী, আশরাফ, পরাগল, আবদুল আলিম ও ছৈয়দ আইনুদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের জন্ম ও নিবাসস্থান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না; তবে এরা যে চট্টগ্রামের কবি এ সম্পর্কে বোধহয় সন্দেহের তেমন অবকাশ নেই। এঁদের সব পুঁথি চট্টগ্রামেই পাওয়া গেছে।

মুহম্মদ 'ফসিহ'-র 'মুনাযাৎ' নামক একটি মাত্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত পুঁথিই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। কাব্যটি বাংলা চৌতিশা জাতীয় রচনা। আসলে এটি আরবী ত্রিশ হরফের মুনাযাৎ।

“আরবীর এ ত্রিশ অক্ষরে করি ভার
মুনাযাৎ করিলাম গোচরে আদ্বার।
একেক অক্ষরে প্রতি চতুস্পদ বন্ধে
মোহাম্মদ, ফসীহে কহে পয়ার জে ছন্দে।”

প্রতি চারিটি চরণে আলিফ থেকে শুরু করে একেকটি আরবী হরফের ফজিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। প্রতি চারি চরণের আদিতে একেকটি আরবী হরফের বাঙলা প্রতিলিপি স্থান পেয়েছে। 'হামদ' ও 'নাত' লিখিত হয়েছে 'মুনাযাতে'র শেষে। কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বলছেন :

“কোরানের মাঝে আছে তিরিশ হরফ
দেশী ভাষে করিলুং পঞ্চাশী স্বরূপ।
এসব অক্ষর দেখি কোরান মাঝার
মোত্তা সবে করিলেক কিতাব সঞ্চারণ।
ফারছির মধ্যে দেখি পত্তিতেরগণ
বাঙ্গলার ভাষে তবে করিল রচন।
যার যেবা ইচ্ছামতে নানান প্রকারে
হিতবাক্য বুঝিবারে কহিছি পয়ারে।”

একভাষা থেকে আরেক ভাষায় অক্ষর বা ধ্বনির প্রতিবর্ণায়ন আধুনিক ভাষাতত্ত্বের আওতায় পড়ে। মুহাম্মদ কসীহ-ই সর্বপ্রথম 'সজ্ঞানে আরবী হরফের বাঙলা প্রতিবর্ণায়নের রীতি অবলম্বন করেন।' এদিক দিয়ে কাব্যটির একটি বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আছে। কবির জীবনকাল ১৬১০ খৃঃ হতে ১৬৮০ খৃঃ পর্যন্ত বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। অবশ্যি সাহিত্য বিশারদ তাঁকে আরো কিছুটা পরবর্তীকালের কবি বলে মনে করেন। তাঁর মতে 'মুনাযাতে'র রচনাকাল হচ্ছে ১৬৯৫ খৃঃ।

'মুনাযাৎ'টিতে একটি নিবেদিত-আত্মা মু'মিনের আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে। আন্তরিকতার দিক দিয়ে মর্মস্পর্শী এই 'মুনাযাৎ'টি আজো পাঠকচিহ্নে একটি ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে। নমনাস্বরূপ 'আলিফ' ও 'হামজা'কে আদ্যক্ষর করে রচিত চরণগুলি উদ্ভূত করা যেতে পারে :

আলিফ :

'আলিফে আত্মার নাম মনে করি সার
আউয়ালে আখেরে প্রভু তুমি সে নিস্তার।
অনাদি নিদান প্রভু নির্বঙ্গীর বল
অনাখের নাখ তুমি এ মহিমত্তল।”

হাম্জা :

‘হা হা প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিদান
হারাইলে তোমা নাম করাইবা স্মরণ।
হিন হই না রহিনু যেন পদতল
হইয়া মানবকূলে জনম বিফল।”

কবি মীর মুহম্মদ শফীর ‘নূরনামা’, ‘নূরকন্দীল’ ও ‘সায়্যাৎনামা’ নামক তিনখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ‘নূরনামা’ ও ‘নূরকন্দীল’ একই পুঁথি বলে মনে হয়। কারণ দু’য়েরই ভাষা ও বিষয়বস্তু প্রায় এক। পুঁথিটির আসল নাম হচ্ছে নূরনামা। ‘কন্দীল কথ জন’কে ‘কন্দীল কথন’ পাঠের ফলেই নাকি এই নাম বিভ্রাট ঘটেছে। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :

“পিতা মোর শাজাহান শহীদ দরবেশ
কিঞ্চিৎ জানাইলা মোরে পছের উদ্দেশ।
কহে মোহাম্মদ হকি দিলে মনে তানে জপি
যার কর্মে দিষ্টি উত্তপন।
পীর হাজি মোহাম্মদ শিরে বাকি তান পদ
পাইতে আছে নূরের দিদারা।”

কবির পীর ‘হাজি মোহাম্মদ’ আর ‘নূরজামাল’ কাব্য রচয়িতা হাজী মোহাম্মদ (১৫৫০-১৬২০) একই ব্যক্তি হতে পারেন। কবির পিতা শাজাহান দরবেশ ছিলেন বলে জানা যায়। কাব্যে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে কবির উক্তি :

আদি চন্দ কোথা হোতে হৈল উৎপন
নিজ চন্দ কোন্ স্থানে হৈল সৃজন।
উনমত্ত চন্দ কেন হৈল কোথা হোন্তে
গরল চন্দ বোল জন্মিল কোথা হতে।

(নূর-কন্দীল)

মুহম্মদী নূর কি করে সৃষ্টি হলো এবং তা’ থেকে কি করে বিশ্বজগৎ, বেহেশত-দোজখ পয়দা হলো, নূরনামায় তাই আলোচিত হয়েছে। প্রভুর সঙ্গে দর্শন কি করে

পাওয়া যায়, সে প্রেমের জ্বাবে কবি সুফী পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন : প্রভুর 'প্রেমভাবে মগ্ন মন'ই 'প্রেমের সমুদ্রে ডুবে' আল্লাহর দিদার লাভ করে :

নবমে সমুদ্রে এশক জানহ আপন ।
এশক অর্থ প্রভু প্রেম ভাবে মগ্ন মন।
প্রেমের সমুদ্রে ডুবি করিলে বিচার ।
অবশ্য প্রভুর সঙ্গে দর্শন তাহার।

কাব্যটির স্থানে স্থানে নানা উপদেশও লিপিবদ্ধ হয়েছে ।

'গুল-ই-বাকাউলি' রচয়িতা মুহম্মদ মুকিম তার পূর্ববর্তী যে সব চট্টগ্রামী কবির নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে 'পরাগল' বলে এক কবিরও নাম আছে । এর থেকে অনুমান করা যায়, কবি সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন । পরাগলের একটিমাত্র পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে—তাও খণ্ডিত আকারে । মাত্র দুটি পৃষ্ঠা বিদ্যমান । পুঁথিটির নাম—'শাহ পরীর কেছা ।' এটি মৌলিক রচনা নয়, নিজামীর কারসী কাব্যের ভর্জমা । একটি প্রেম কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচিত :

“কারসি কেতাবেত নিজামি রচিল
বএত ভাদি পরাগলে পয়ার করিল।”

কবির ভাষা সহজ ও প্রাকৃতিক :

“দেখিয়া কুমারের মুখ যেন রূপবান
জোড় হস্ত করি কৈন্যা আইল বিদ্যমান।
* * * *
শাহা পরীর মুখ যদি কুমারে দেখিল
আকাশের চন্দ্র যেন হাতে হাতে পাইল।”

'বৃষ্টিবিরের স্বর্গারোহণ' নামক মহাভারতের এক অংশ বিশেষে তিনজন কবির ভণিতা পাওয়া যায়—বষ্টিবব, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও পরাগল খান । ভণিতায় যেখানে 'পরাগল খানের' নাম আছে, সে অংশটি নিম্নরূপ :

“অশেষ ভারত কথা সমুদ্রের জল ।
প্রণাম করিয়া বৈসে পাণ্ডব সকল।

চারি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী ।
অন্যে অন্যে আলিঙ্গন কৈল মহামতি ॥
পরাগল খানে কহে গোবিন্দ চরণ ।
একমনে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥”

পরাগল খান সত্য সত্যই এ কাব্যের অংশবিশেষ রচনা করেছিলেন, না লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ এ নাম ভণিতায় ঢুকে পড়েছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। তা’ছাড়া পরাগল খান ও ‘শাহ পরীর কেছার রচয়িতা’ পরাগল একই ব্যক্তি কিনা, সে সম্পর্কেও শুধু অনুমানই করা চলে।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধ্বে বা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান কবি নিয়াজের তিনখানি গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া গেছে। পুঁথিগুলির নাম—যোগ কলন্দর (?) বা নসিয়ত নামা, কায়দানি কিতাব, নূরজামাল। কবি নিয়াজের পুত্র আশরাফও ধর্ম উপদেশমূলক ‘কিফায়তুল মুসল্লিন’ ও ‘মুহররমের নামাজ্জ মাহাত্ম্য’ নামক দু’টো কাব্য রচনা করেন। ‘মোহাম্মদ হানিফার লড়াই’ নামক কাব্যের অন্যতম লেখক আবদুল আলিম (বা হালিম) সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। সাহিত্য—বিশারদের ধারণা তিনি সম্ভবতঃ কল্লবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের কৃতিপদ্য কবি

(ক) শেখ মনসুর

কবি শেখ মনসুরের দু'খানি কাব্যের প্রতিমূলাপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। 'সিরনামা' রচয়িতা শেখ মনসুর এবং 'আমীর-জঙ্গনামা'র কবি শেখ মনসুর অভিন্ন বলে মনে হয়। কবির পিতার নাম কাজী ঈশাখাঁ এবং পীরের নাম শাহ তাজ্জদিন। কবি নিজ পীরকে 'ছোলতান বংশের কান্তি' বলে বিশেষিত করেছেন, এতে কেউ কেউ অনুমান করেছেন তাজ্জদিন পীর মীর হৈয়দ সুলতানের বংশধর হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর কাব্য 'সির নামার' রচনা কাল সম্পর্কে কবি বলেছেন :

“যত হৈল মঘী সন লও পরিমানি
এক পরে শূন্য ছ'ও পাঁচ দিয়া গোনি।”

তাহলে 'সিরনামা' ১০৬৫ মঘীতে অর্থাৎ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। কবি ছিলেন চট্টগ্রামেরই রাছ বা রামুর অধিবাসী— 'রোসান্দে আছিল আসি রাছ কৈল বাদ।' 'সিরনামা' 'আসরারুল মসা' বা 'বীর্য রহস্য' নামক কোনো ফারসী গ্রন্থের বাংলা তর্জমা। আরবী ফারসী সাহিত্যের সেরা গ্রন্থগুলিকে বাঙলায় তর্জমা করে পাঠককে আমাদের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সে যুগের বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে যে ব্যাপক ও গভীর উদ্যম দেখা যায় তা' থেকে এ যুগেও আমরা শ্রেরণা পেতে পারি। 'সিরনামা' রচনার প্রারম্ভে কবি বলেছেন :

“বচন আরবী ভাষে সব শান্নমূল
বুঝিতে ফারসী ভাষে কিতাব বহুল
যত গুণিগণে সবে মনে প্রীতি ভাসি
আরবী ফারসী ভাষে দিলেক প্রকাশি

বাঙ্গালে নবোন্মেষে সব ফারসী কিতাব
নবোন্মেষে কিতাব কথা মনে হয় তাব (তাপ)
সবে বোলে বাঙ্গালের ভাষে এ কিতাব
শুনিতে পার এ যদি যায় মনস্তাব।
তেকাজে বাহলা ভাষে ফারসী জবান।
পদবন্ধি করি কৈলুং পুস্তক গ্রহণ॥”

কবি তাঁর তর্জমা প্রসঙ্গে বলেছেন :

“আছারল মসা এক কিতাব উপাম
ছিন্ননামা রাখিলাম পুস্তকের নাম।”

আসলে কাব্যটি একটি ‘দরবেশী পুঁথি।’ বীর্ষ রহস্য এ কাব্যের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলেও এ কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি মা’রফতের গূঢ়তত্ত্বেরও আলোচনা করেছেন, তাতে কাব্যটি বীর্ষ রহস্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এক সুগভীর তত্ত্বসেৱেরও আধার হয়ে উঠেছে। পুঁথিটি কয়েকটি ফসল বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ‘দরবেশী কখন’ দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘এবাদত’। তৃতীয় অধ্যায়ে ‘তনের বিচার’, চতুর্থ অধ্যায়ে ‘রাবির বয়ান’, পঞ্চম অধ্যায়ে ‘দিলের বিচার’ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘রাবির কখন’, সপ্তম অধ্যায়ে ‘ঋতুর কখন’, অষ্টম অধ্যায়ে ‘আরোয়ার বাণী’ এবং নবম অধ্যায়ে ‘নিরঞ্জনের কথা’ আছে।

অষ্টম অধ্যায়ে ‘আরুহার’ (আরোয়া) বাণী বিবৃত হয়েছে; “প্রাণেরে আরোয়া বোলে আরবী ভাষাএ।”

আরোয়ার চারিটি নামঃ

- “(১) ‘নাতকি’ আরোয়া বৈসে মনুষ্য ভনএ
বচন কন যত কহিলে বোজএ॥
- (২) ‘ছামি’ নামে পতপক্ষী আন্তমা (আত্মায়) বৈসএ
কহিতে না পারে ফিরি বচন নিচয়॥
- (৩) ‘জিসিম’ আরোয়া বৈসে যত বৃক্ষ তরু
তুলতা আদি আর সুগন্ধ সূচরু॥
- (৪) ন্মাসি নামে আরোয়া বৈসএ পাথরএ
মণিমুক্ত আদি যত দানা কঙ্কর হএ॥”

এইরূপে মনুষ্য শরীরে, পশুপক্ষীতে, বৃক্ষলতায় ও প্রস্তুরদিতে বিভিন্নরূপে আরোয়া
বা প্রাণ— .

“ব্যাপিত হই মিশিয়া আছএ,
পুষ্পের অন্তরে গন্ধ যেমত নিচ্চয় ।
গোষ্ঠের অন্তরে দৃষ্টি আছএ যেমত
ভেন মতে প্রাণী আছে শরীরে গোপত॥
দৃষ্টি হস্তে দধি হএ দধি হস্তে লনি (ননী)
তেমত রহিয়া আছে শরীরেও প্রাণী॥

শুধু মনুষ্যদেহ এবং পশুপক্ষীতেই নয়, বৃক্ষলতা ও প্রস্তুরাদিরও প্রাণ আছে এ উক্তি শুধু আত্মিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বৈজ্ঞানিক দিয়েও বিপ্রবাক্যক। কবির দুশো বছর পরে, বৈজ্ঞানিক জগদীশ বাবু প্রমাণ করেছেন বৃক্ষলতার প্রাণ আছে এবং অতি সম্প্রতি পদার্থ বিজ্ঞান বলছে—জড় পদার্থ বলে কিছু নেই। সব কিছুর মূলে আছে শক্তি বা এনার্জি। জড় পদার্থে বৃক্ষ লতায় প্রাণ সূত্র আছে—‘পুষ্পের অন্তরে গন্ধ যেমত নিচ্চয়’—একটি মাত্র প্রতীকের সাহায্যে কবি এখানে একটি দুর্লভ তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক সত্যকে যে অব্যর্থরূপ দিয়েছেন তা যথার্থ কবিত্ব শক্তির অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব।

নবম অধ্যায়ে ‘নিরঞ্জনের’ সিব্ব বা রহস্য আছে, কবি শুধু এর উল্লেখ করেই বিদায় নিয়েছেন; কারণ নিরঞ্জনের রহস্য ফাঁস করে দিলে, কাজীর দল ক্ষেপে উঠে, “প্রাণ করে নাশ।” তাই নিরঞ্জনের রহস্য “প্রচারিতে দোষ অতি গোপত কখন।”

“প্রচারিলে দুষিবেক যত গুণিগণ
ছোট হই বড় বাক্য কহে যেই জন॥
তেকারণে না কহিনু ছিরি নিরঞ্জন
সকলে বোলএ ভারে গর্বিতা বচনা॥
উত্তমে করিলে দোষ সবে মানি লএ
হীন কৈলে নিন্দা মনে সকলে দোষএ॥
তেকারণে প্রচার না কৈলু হিন্দুআনি
মুর্শিদ ভজিয়া লও হই কানাকানি॥

নিরঞ্জনের রহস্য মুর্শিদের কাছ থেকেই জানতে হবে, এই হচ্ছে কবির শেষ কথা।

কবির অপর গ্রন্থ “আমীর জঙ্গনামায়” ইমাম হাসান হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা “আমির মুহম্মদ হানিকার বিজয় কাহিনী” বর্ণিত হয়েছে। মদিনা ও দামেস্কে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ‘আমীর মোহাম্মদ হানিকা জয়ী হন এবং এজিদকে বধ করে ইমাম হাসান হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই প্রকাশ্য পুঁথি খানির প্রথম ভাগে মদিনার ও দ্বিতীয় ভাগে দামেস্কের যুদ্ধাদি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটির ভণিতায় আছেঃ

(ক) “শেখ মনসুরে কহে অর অবধান।
আমীর জঙ্গের কথা অমৃত সমান॥”

(খ) “কহে সেখ মনছুরেত পাঞ্চালী পয়ার।
শুনি শুনিগণ মন হরিষ অপার॥”

কাব্যটির দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ নিম্নরূপঃ

“প্রথমে প্রণাম করি এক করতার
দ্বিতীয় প্রণাম করি রতুল আদ্যার।
তৃতীয়ে প্রণাম করি আছবাব (আসহাব) গণ
চতুর্থে প্রণাম করি ফাতেমার চরণ।
হাছন হোছেন দুই হৈল স্বর্গ গতি
মহম্মদ হানিকার জঙ্গের আরতি
মদিনা সহরে যুদ্ধ হইল সুমার
দিমিস্কের যুদ্ধে যায় আলীর কুমার।”

এই পুঁথিটির বিষয় বস্তু হচ্ছে যুদ্ধ বর্ণনা। তবে আবাস্তুর কথা এবং অপ্রাসঙ্গিক উক্তি রয়েছে দেদার। অনেক আরবী-ফারসী শব্দের সুন্দর প্রয়োগ কাব্যটির সুখমা ও স্বকীয়তা বৃদ্ধি করেছে। ভাষায় কবির দখল লক্ষ্যণীয়। দৃষ্টান্তরূপ নিম্নের উদ্ধৃতিটি বিবেচ্যঃ

“সংসার বসতি জ্ঞান নিশির স্বপন
মায়াজাল বন্দী বাজী দেখহ আপন॥”
* * * * *
“মুক্তিকায় কাল বুঝ অসার কেবল।
এহার ভরসা করে সেই বে পাগল॥

দুই আঁখি মুদিলে হইব অন্ধকার
 ভাগ্য হৈলে রাখে নিয়া ভিহিত মাঝার।
 মনুষ্যের আয়ু যেন শিশিরের পানি
 যমরাজ্যার কাছে জান জল ভাঙ খানি।
 শিশিরের জলশেষে যেহেন ডাকরে
 তেমতে আছএ যম শরীর অন্তরো।”

শিশিরের পানির মতো মানুষের পরমায়ু; সূর্যের ঝরতাপে যেমন শিশিরের পানি বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি যম বা আঞ্জরাইলও মানুষের ভেতরে থেকেই ধীরে ধীরে মানুষের পরমায়ু শুষ্ক নিচ্ছে—মানুষের জীবনের এই পরিণতিকে কবি অতি চমৎকার ভাবে অঙ্কিত করেছেন, উপরোক্ত ছত্র কয়টিতে। মৃত্যুর লক্ষণ বর্ণনায় কবির বর্ণনা আরো অব্যর্থঃ

“দুই চন্দ্র গননেত ন পাইব দেখা
 সন্ধে আছে দুই পক্ষী ডাক্তে তার পাখা।
 সহস্র কমলদল শুখাইব সকল
 ভ্রমরা উড়িয়ে যাইব ছাড়িয়া কমল।”

(খ) মুহম্মদ মুকীম

‘গুল-ই-বকাউলি’ নামক সুপরিচিত ও জনপ্রিয় কাব্যের রচয়িতা মুহম্মদ মুকীম অষ্টাদশ শতকের মুসলমান কবিদের অন্যতম। কবির পূর্বপুরুষেরা ফটিকছড়ি থানার আজিমপুর গ্রামে বাস করতেন। কবির কোনো পূর্বপুরুষ পরবর্তীকালে রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে বসতি-স্থাপন করেন। এ সন্ধকে কবির উক্তি নিম্নরূপঃ

“মুকিম মোহোর নাম জ্ঞানহীন অতি
 চাটিগ্রাম রাজ্যে জান আমার বসতি
 জন্মভূমি নোয়াপাড়া গ্রাম মনোহর
 কুলশীল নরগণ সাধু সদাগর।
 নোয়াপাড়া নাম জান নবীন সদায়
 নব সুখ, নব ভোগ, নব সুবরায়।”

কবি মুকিম নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ছিলেন রাউজানের জমিদার হারিস মিত্রা চৌধুরীর পিতা আলী আকবর চৌধুরীর গোমস্তা। কবি তাঁর কাব্যে যে বিস্তৃত আত্ম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে কবির পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বহু কবির নাম যেমন উল্লেখিত হয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁর নিজ পূর্ব-পুরুষের বিস্তৃত বিবরণও রয়েছে। আদিতে কবির পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন নোয়াখালি জেলার ফেণীর বাসিন্দা, সেখান থেকে তাঁরা আসেন চট্টগ্রামের ষটিকছড়ি থানার আজিমপুর গ্রামে; আজিমপুর থেকে রাউজান থানার 'নোয়াপাড়ায়।' কবি যখন আলী আকবর চৌধুরীর গোমস্তা হিসেবে কাজ করছিলেন, সেই সময়েই দেয়াঙ্গের শাহ্ আস্‌হাবুদ্দীনের সংগে তাঁর পরিচয়; তাঁরই নির্দেশে তিনি "নর-পরী প্রসঙ্গ এক ফারসি কিতাব" "তাজল বকাউলি" বাংলায় তর্জমা করেন। মুকিমের পূর্বে, এই কাব্যের বাঙলা তর্জমা করেছিলেন চট্টগ্রামের কবি নওয়াজিশ খান এ কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

তাজুল মুল্লকের সঙ্গে বকাউলির প্রেম এবং নানা রকমের দুর্লভ্য ও ভয়াবহ বাধা অতিক্রম করে বকাউলির সংগে মিলন কাহিনীই কাব্যের বিষয়বস্তু।

কবির এই কাব্য যেমন নানা ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ, তেমনি এ কাব্য কবির পাণ্ডিত্যেরও স্বাক্ষর। ভাবানুবাদের মধ্যে, কবির নিজের স্বাধীন রচনারও সহজেই অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ছন্দশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, সংগীত শাস্ত্র, এবং মুসলিম ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কবির জ্ঞান যে প্রচুর ছিল তার প্রমাণ 'শুল-ই-বকাউলি' কাব্যে এ সবার দেদার প্রয়োগ। ডঃ হকের মতে পাণ্ডিত্যে একমাত্র আলাওলের সংগেই মুকিমের তুলনা চলে। কাব্যটির বন্দনা অংশে,— "হাম্দ, নাহ্ আস্‌হাব, চারিপরী, বারো ইমান, চৌদ্দ খান্দান, সত্ত্ব আকাশ, সত্ত্বভূমি, সাত সমুদ্র, সত্ত্বদীপ ও পর্বত ও সত্ত্বরাজ সিংহাসনে"র বর্ণনা আছে। রাজ সিংহাসনের বর্ণনায় আওরঙ্গযেবের সিংহাসন প্রাপ্তির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাব্যের এক জায়গায় চট্টগ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলছেনঃ

"চিরদিন ইংরাজ এথা মহীপাল
ভালে ভাল মন্দে মন্দ তরুরের কাল।"

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে এ কাব্যটি রচিত হয়ে থাকবে, তা' 'ফায়দুল মুকতদী'র তারিখ থেকে অনুমান করা যায়। কবির অন্যতম গ্রন্থ 'ফায়দুল মুকতদী'তে 'কাল-কাম, 'সুগাবতী' ও 'আয়ুব-নবীর কিসসা' নামক কবির আরো তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে;—কিন্তু এ কাব্যগুলির কোনো পাণ্ডুলিপি আজো আবিষ্কৃত হয়নি। 'ফায়দুল মুকতদী' ধর্মীয় কাব্য এ কাব্য রচনার তারিখ 'ঋতুবেদ চন্দ্র শত আলী আর নয়।—মঘী সন;— অর্থাৎ ১১৩৫ মঘী বা ১৭৭৩ খৃঃ এ কাব্যটি রচিত হয়।

(গ) শেখ সেরবাজ চৌধুরী

কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরীকে ডঃ এনামুল হক ত্রিপুরার কবি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর পুঁথিগুলি ত্রিপুরা থেকে পাওয়া গেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মরহুম সাহিত্য বিশারদ তাঁকে চট্টগ্রামের কবি বলে মনে করেন। তিনি ১৭শ শতকের শেষভাগে অথবা ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁর পুঁথিগুলির প্রতিটিপি চট্টগ্রামেই পাওয়া গেছে।

কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরী তিনটি কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যগুলির নাম—
'ফকরনামা' বা 'মল্লিকার হাজার সওয়াল', 'কাসিমের লড়াই' ও 'ফাতিমার সুরতনামা।'

“বদিয়েদ্দিন জান গীরের জে নাম।

* * * *

আদালত শুরু প্রণামিএ শরীফ হাছন।”

অর্থাৎ কবির মুর্শিদ হচ্ছেন বদিয়েদ্দিন এবং ওস্তাদ শরীফ হাসান। সৈয়দ বায়েজ্জিদের নির্দেশে, বংগ ভাষাভাষিদের সুবিধার জন্য তিনি ফারসি থেকে কাব্যটি বাংলায় তর্জমা করেনঃ

“ফকর নামা করি এক আছএ কিতাপ।

কহিমু যথেক কথা আছে পরস্তাব।

সকলে না বুজে দেখি ফারসি বচন।

কহিমু বাঙলা ভাসে বুজিতে কারণ॥”

শেখ শাদী নামক ত্রিপুরার এক কবিও 'গদা মল্লিকা' নামক এক কাব্য রচনা করেন। ডঃ হকের মতে এ কাব্য সেরবাজের 'ফকরনামা'র অক্ষয় অনুকরণ মাত্র।

রুম রাজকন্যা মল্লিকা—

“বুজিতে ন পারে কেহো রহিছে কুমার।

চল্লিশ বৎসরে বিভা ন হইল বালার॥

কুল শীল হৈলে হএ পণ্ডিত কুমার।

এ মত পুরুষ জান যোগ্য হএ তান॥”

মল্লিকা ঘোষণা করেঃ যে তার হাজার সওয়ালের জবাব দিতে পারবে তাকেই সে স্বামীত্বে বরণ করে নেবে। তুরস্ক দেশ থেকে আব্দুল্লাহ্ ফক্বর নামে এক তরুণ আসে এবং হাজার সওয়ালের জওয়াব দেয়। অতঃপর তাদের দু'জনের বিয়ে হয়। প্রশ্নোত্তরগুলির বেশীর বাগই হৌয়ালীপূর্ণ; যেন একেকটা ধাঁ ধাঁ। কিন্তু, প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যেই একেকটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা লুক্কায়িত আছে; কাব্যটি উদ্দেশ্য মূলক; গল্প বলার সুযোগে তত্ত্বপ্রচার-ই কাব্যের লক্ষ্য।

নিম্নে একটা সওয়াল ও তার জবাব উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

“লাগিলা পুছিতে পুনি আর যে সওয়াল
পুনি পুনি পুছিলা বালা আব্দুল্লাহ্‌র ঠাই।
কোন্ মোকামে তুন্দি আছহ বেরাই।
আব্দুল্লাএ বোলে ইচ্ছা যথাতে আন্কার
লাহত মোকামে জানি বেরানি আন্কার।”

আব্দুল্লাহ্ আরেকটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে নিম্নলিখিত ভাবেঃ

“আব্দুল্লাহ্ এ বোলে সুন রুম নূপবর।
সংসারে ন আটে আন্না অধিক ডাঙ্গর।
যদি সংসারে আন্না কোথা ন আটএ।
মুনিগণ দিলে তাজ থাকএ নিচ্চএ।”

‘কাসেমের লড়াই’-তে কারবালার মর্যাস্তিক কাহিনীর একটা অংশ বর্ণিত হয়েছে।

(ঘ) রামজীবন বিদ্যাভূষণ

কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। কবি ছিলেন বাঁশখালী থানার অন্তর্গত সাধনপুর বা বাণীগ্রামের বাসিন্দা-সাহিত্য বিশারদ এই মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর দুটি কাব্যের কোনোটিতেই তাঁর গ্রামের উল্লেখ নেই। কবির পিতার নাম গঙ্গারাম আর খুল্লতাতে হচ্ছেন নারায়ণ। তাঁর কাব্য দুটি হচ্ছে—“মনসা মঙ্গল” ও “আদিত্য চরিত” বা সূর্যমঙ্গল পাঁচালী।

মনসা মঙ্গলের রচনাকাল কবির ভাষায়—

“সরকার ঋতু বিধু শক নিজোজিত
মনসামঙ্গল রাম জীবন চরিত ।”

আর ‘আদিত্য চরিত’ বা ‘সূর্যমঙ্গল পাঁচালীর’ রচনা কাল ‘ইন্দু রাম, ঋতু, বিধু, শকান্দ ।’ অর্থাৎ, মনসামঙ্গল রচিত হয় ১৬২৫ শকান্দ বা ১৭০৩—৪ খৃঃ-এ। আর ‘আদিত্য চরিত’ রচিত হয় ১৬৩১ শকান্দ বা ১৭০৯-১০ খৃঃ-এ।

সুপণ্ডিত রামজীবনের ভাষা সংস্কৃত বহুল ও প্রাজ্ঞল। তিনি সু-রসিক এবং সংযমী লেখক। বহু প্রাচীন শব্দের ব্যবহার তাঁর কাব্যে রক্ষিত হয়েছে। তাঁর ‘মনসা মঙ্গল’ বিদ্যাভূষণী মনসা’ নামে পরিচিত। কবিতাটি পরবর্তী ‘মনসা-মঙ্গল’ কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্যহীন রীতিতে রচিত। মনসা-মঙ্গলে কবির আত্ম-পরিচয় নিম্নরূপঃ

“অল্পবয়স মোর বিজ্ঞকুলজাত ।
পণ্ডিত না হম মুই কহিলু সভাতা।
মনসার নাম মাত্র হৃদয়ে ভাবিয়া ।
মহাসিদ্ধু খেয়া দিছে উড়প লইয়া॥
জনক আমার জ্ঞান গঙ্গারাম খ্যাতি ।
তাহান চরণ বন্দো করিয়া ডকতি।
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ ।
করজোরে তান পদে করম বন্দনা॥”

অধিকাংশ মৌলিক ব্রতকথা বা পাঁচালী কাব্যের মতোই ‘আদিত্য চরিত’ বা ‘সূর্য পাঁচালী’ কাহিনীও উপকথামূলক; রামজীবন বলেনঃ

“গুরুজন মুখে শুনে কথার শিকলি
সূর্যদেব অনুসারে রচিনু পাঁচালী॥
পূর্বেত আছিল এই ব্রতের যে কথা
পরম হরিষে কৈনু প্রকাশ কবিতা॥”

কাহিনীর নায়ক একজন দরিদ্র বিপত্নীক ব্রাহ্মণ; তার দু’কন্যা কুমুনা ও স্বমুনা সূর্য পূজা করে পিতার সংসারে খনৈশ্বৰ্য ও শ্রী নিয়ে আসে। ভাগ্যক্রমে সেই ব্রাহ্মণ এক

রাজকন্যাকে বিয়ে করে। এই রাজকন্যা সূর্যদেবের ঘোর বিরোধী। তার-ই প্ররোচনায় কুমুনা ও কুমুনা ঘুমন্ত অবস্থায় বনে পরিত্যক্ত হয়।

এদের জীবনের নানা ঘটনা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে, সূর্য-বিরোধীদেরকে শায়েস্তা করে, সূর্যদেবের পূজা প্রতিষ্ঠাই এ কাব্যের প্রতিপাদ্য।

(ঙ) ভবানীশঙ্কর দাস

ভবানীশঙ্করের কাব্যটি 'জাগরণের কাব্য' ও 'চন্দীমন্ডল গীত'—উভয় নামে পরিচিত। কবির কাব্য রচনার কালঃ

“ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে
ভবানী শংকর দাসে পঞ্চালিকা ভণে।”

এ থেকে জানা যায়, কবি তাঁর পুঁথিটি ১৭১১ শকাব্দ বা ১৭৭৯ খৃঃ এ রচনা করেন। কবির আত্ম পরিচয় প্রসংগ থেকে জানা যায়, তিনি আত্মীয় গোত্রীয় নরদাসের বংশধর ও কুলীন কায়স্থ কুলোদ্ভব। কবির পূর্ব পুরুষ নরদাসের বংশধর কৃষ্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ চট্টগ্রামের দেবগ্রামের অন্তর্গত বটতলী গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের মধুসূদনই হচ্ছে কবির পিতামহ। তিনি বটতলী থেকে চক্রশালার 'ছনহারী' গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। কবির পিতার নাম শ্রীমন্ত। কবির বংশধরেরা এখনো এই গ্রামে বাস করছেন।

ভবানী শঙ্করের কাব্যখানি আকারে বৃহৎ। তাঁর উপর ভারতচন্দ্রে কোনো প্রভাব দেখা যায় না। মনে হয় তিনি দ্বিজ মাধবের কাব্য থেকেই কাহিনীর মূল অংশ গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত কবি “কিছুমাত্র কাভ-জ্ঞানের” পরিচয় দিতে পারেন নি। বিষম সংস্কৃত পদের ব্যবহার এবং তদ্ভব পদের সংগে তৎসম শব্দের সঙ্কি ভবানী শঙ্করের রচনাকে বিকট করেছে। যেমন—“শনুধং সাধব সব কর অবধান”, “যা হোস্তে হইলোৎপত্তি ভবাচ্যতখাতা,” “বন্দমাষিকারাম্বিত্তে লোটাই বিশেষ।” “ধন দেখি আশ মূল্য দদন্স আশ্বারে।”—ইত্যাদি।” (সুকুঃ সেন)।

কাব্যের মধ্যে “ঘোষা” নামে অনেকগুলি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ও ভক্তিমূলক পদ সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলিতেই তাঁর কিছু কিছু কবিত্ব-শক্তির প্রমাণ মেলে।

(চ) মুহম্মদ রজা

কবি মুহম্মদ রজার দু'খানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাব্যগুলির নাম—‘তমীম গোলাল ও চতুর্থ ছিদ্দাল’ এবং ‘মিসরী জমাল।’ কবি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার বখ্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গ্রামে আজো কবির বংশধরেরা বসবাস করছেন। এঁরা বংশপরম্পরায় যে ‘বংশলতিকা রক্ষা করে আসছেন, তা’ থেকে জানা যায় কবি জন্মগ্রহণ করেন ১৬৯১ খৃঃ-এ এবং ইন্তেকাল করেন ১৭৬৭ খৃঃ-এ।

‘তমীম গোলাল ও চতুর্থ ছিদ্দাল’ একটি প্রণয়মূলক কাহিনী-কাব্য। এককালে বটতলার প্রকাশকদের কল্যাণে পুঁথিটি ছাপা হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ‘তমীম গোলাল ও চতুর্থ ছিদ্দাল’ একে অন্যকে স্বপ্নে দেখে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ এবং পরিচয়ের আগেই পরস্পরের প্রতি আশিক হয়ে পড়ে। তমীম গোলাল হচ্ছে শিমালের বাদশাহ্ ইউসুফ জালালের পুত্র, এবং চতুর্থ ছিদ্দাল’ শিরাজের শাজাদী। স্বপ্নে গন্ধর্ষ মতে বিয়ে হয়ে গেলেও তাদের মিলনের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেলো না। পূর্ণবৌবনা কন্যার মতি-গতিতে পরিবর্তন দেখে শিরাজের বাদশাহ্ কন্যার বিয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। সেখানে ‘তমীম গোলাল’ও হাজির হয় এবং পাঁচটি শর্ত পূরণ করে ‘চতুর্থ ছিদ্দাল’কে বিয়ে করতে সমর্থ হয়।

কবির ভাষা তথা প্রকাশভঙ্গী সুন্দর ও সহক কবিত্বমণ্ডিত। যেমনঃ

“শিরাজ নৃপতি পদে করে নিবেদন
দেশের মেলানি মাগে ইছুক নন্দন
দেশত যাইতে বাপু দাও অনুমতি
দেও রখে আরোহিআ করিবাম গতি
নৃপতি বোলোএ মোর বৃকে ছেল হানি
দেশে গিয়া দেখ তোমার দুর্লভ জননী।”

রূপ বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্তঃ

“হেরিতে-কৈন্যার রূপ ছন্ন হৈল আখি।
পলক না মারে কেহ সেইরূপ দেখি।
“মুগেন্দ্রনয়ানী বালা রস কুমুদিনী।
মুখেতে অমৃতবাণী সেই কমলিনী॥

দশন মুকুতা পাঁতি জ্বলে যেন মণি ।

হাসিতে ঝলকে মুক্তি কামেতে কামিনী॥”

‘মিছিরী জামাল’ও একটি প্রণয়োপাখ্যান। ‘কুর্বার শহরে’র শাহা আব্দুল করিম ও তাঁর ‘বণিতা’ সুন্দরী নাছিরার ‘ভুবন মোহিনী অতিশয়মণি’ নন্দিনী ‘মিছিরি’ জামালের প্রণয়কাহিনীই এ কাব্যের উপজীব্য।

(ছ) আলী রজা

সাধক কবি আলী রজার জনপ্রিয় নাম কানু ফকির। তিনিও চট্টগ্রামের কবি। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে কবি আলী রজা জনগ্রহণ করেন আনোয়ারা খানার অন্তর্গত ‘ওস্‌খাইন’ নামক গ্রামে। এই গ্রামে তাঁর যে বংশধরেরা আজো বসবাস করছেন। তাঁদের নিকট থেকে জানা গিয়েছে কবি ১৭৮০ খৃঃএ প্রায় নব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি একাধারে সাধক, পীর ও কবি ছিলেন। তাঁর মুরশিদ ছিলেন কেয়ামউদ্দিন।

“শাহা কেয়ামউদ্দিন গুরু সর্বলক্ষ্য সার
হিন আলী রজা কহে আগম সবার।”

* * * *

“শাহা কেয়ামউদ্দিন গুরু হৃদয় কলিকা
আগমেত পূর্ণ করি নিগমে সাধিকা॥”

আলী রজার রচিত কাব্যগুলির নাম— আগম, জ্ঞানসাগর, ধ্যানমাশা, যোগকলন্দর, ষটচক্র ভেদ, ও সিরাজকুলুব। এ ছাড়া বহু গান এবং পদাবলী কবিতার রীতিতে বহু গীতি-কবিতাও তিনি রচনা করেন। তাঁর কাব্য মূখ্যতঃ তত্ত্ব ও অধ্যাত্মমূলক, সূফীবাদ ও যোগশাস্ত্রের সমন্বয়ে তিনি নিজস্ব এক অধ্যাত্মতত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেন; সমকালীন বহু লোক তাঁর শিষ্য গ্রহণ করে।

সাহিত্য বিশারদ জনাব আবদুল করিম আলী রজার ‘জ্ঞানসাগর’ নামক গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন; এ গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সুখ-দুঃখে অবিচলিত থাকার যে দর্শন এ কাব্যে প্রচারিত হয়েছে তা’ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার খুবই সহায়ক।

“দুষ্ক পাই সুখ না মাগিব প্রভুস্থানে
এক চিন্তে ঈশ্বর স্মরিব মনে মনে॥
দুখের সুখের দিকে মন না রাখিব
সনা (দা?) এ ঈশ্বর নাম স্মরণ করিব॥”

‘জ্ঞান-সাগরে’র আলোচ্য বিষয়ের ইংগিত গ্রন্থের সূচনাতেই রয়েছেঃ

“জিজ্ঞাসিল শাহ্ আলী রসুলের পাশ ।
কি কর্ম করিলে হৃদ হইব প্রকাশ॥
কি কর্ম করিলে হএ চিন্ত অন্ধকার ।
এই কর্ম ভগ্ন করি কহ নবিবর॥”

‘সিরাজ কুলুব’কে ইসলামী ধর্ম-বিজ্ঞান মূলক কাব্য বলা যেতে পারে। পৃথিবীর অবস্থান, বেহেশতের সংখ্যা, আত্মাহু কোনদিন পৃথিবী সৃষ্টি করেন, কেয়ামতকালে এবং তার পরে কি হবে—এই সব বিষয় এ কাব্যের আলোচ্য বস্তু।

কবির প্রেমভক্তিমূলক একটি কবিতায় অতি চমৎকারভাবে সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী আত্মাহু-প্রেমের অসীমতা বর্ণিত হয়েছেঃ

“দারুন অনলপ্রেমে ঠাকুরের তনু ঘামে
ত্রিভুবন পুড়ি করে ছার ।
মহারত্ন প্রেম তোর রাখিতে কি শক্তি মোর
সর্বজগত যাহে অধিকার ।
যে রাখে পীরিতি সার ত্রিলোক নিছনি তার
কান্ত সোহাগী সে সফল ।
যে জন পীরিতি ছাড়া সে জন জীয়ন্তে মরা
আদি অন্ত নাই তার ফল॥ ”

(জ) মুহম্মদ আলী

‘হয়রতুল-ফিকহ’ নামক ফেকা শাস্ত্রমূলক গ্রন্থের লেখক কবি মুহম্মদ আলী। তাঁর কাব্যের আত্ম-পরিচয় অংশে চট্টগ্রামের কবি মুকিমের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্যে

রচনার তারিখ উল্লেখিত না হলেও শুধু উপরোক্ত প্রমাণের বলেই তাঁকে অষ্টাদশ শতকের কবি বলে ধরা যায়— এ মত কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন।

কবি তাঁর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

‘চাট্টগ্রাম শুদ্ধ স্থান

ইসলাম আবাদ বুলি কহে।

তাহার উত্তর দেশ কি কহিব সবিশেষ

আজিম নগর নাম হএ।

আর এক আছে নাম ইদিলপুর অনুমান

শুদ্ধ সুপবিত্র সেই স্থান।

সেই দেশে :

বহুলোক জ্ঞানবন্ত

পাণ্ডিত্যের নাহি অন্ত

মুকিম পণ্ডিত সর্বশ্রেষ্ঠ।”

চাট্টগ্রাম বা ইসলামাবাদের আজমিনগর চাকলাধীন ইদিলপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন কবি। এখানে বহু পণ্ডিতের বাস ছিলো; কবির সমসাময়িক মুকিম পণ্ডিত হুসেন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। কবি খুব সম্ভব লেলাজ বা রোসাজ গিয়েছিলেন, সেখানকার “শুদ্ধ পবিত্র কলেবর” ইউসুফ হাকেকজ

‘কৃপা করি কহিল বচন।

তুমিত পণ্ডিত হও

কিতাব বাঙ্গালা কহ

পদবন্ধ করিয়া রচন।’

এর আদেশেই কবি ‘হয়রতুল ফেকহ বা ‘শাস্ত্র পণ্ডিতের সংকট’ নামক ফারসী কাব্যের বাংলা তর্জমা করেন। পুঁথিটি আরবী হরকে লেখা। এতে এমন সব সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে যা, শাস্ত্র পণ্ডিতদের জন্য সত্যই ভীতিজনক। কাব্যটি প্রশ্নোত্তররূপে লিখিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা উল্লেখ করা যেতে পারেঃ শত্রুরা এক মুসলমানকে বন্দী করে রেখে—

“অনুজল ভক্ষ দ্রব্য না দেয় ভক্ষিবার।

দুই তিন দিন কিবা রাখে অনাহার।

রাফিয়া শূকর মাংস সম্মুখে আনিয়া ।
খাইতে করে যে আজ্জা তাড়িয়া তাড়িয়া॥
পদুত্তর কহ কি ভক্ষিব না ভক্ষিব ।
অনাহারে বন্দীতে কি রূপে রহিব॥”

সমাধান হোলোঃ

খাইতে খাইয়া প্রাণ রাখিব তাহার ।
না খাইয়া মুক্ত নহে মৃত্যু হইবার॥

কবির আর দু’খানি কাব্য হচ্ছে—“শাহা পরী মল্লিকজাদা” এবং “হাসান বানু।”
দুটিই প্রণয়োপাখ্যান মূলক কাব্য। শেষোক্ত কাব্যটির মাত্র দুটি পাতা পাওয়া গেছে।
এটি ‘হাতেম তাই’ কাহিনীর অংশবিশেষ বলে মনে হয়।

(ক) ছৈয়দ নূরুদ্দিন

ছৈয়দ নূরুদ্দিন অষ্টাদশ শতকের একজন শক্তিশালী কবি : পন্ডিত্য ও তাসাউফের
জ্ঞানের দিক দিয়ে যে তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ— তাঁর শ্রেষ্ঠ
গ্রন্থ ‘দকায়িকুল হকায়িক’-এর বহু প্রতিলিপি চাটগাঁয় পাওয়া গেছে। আরবী এবং
বাঙলা— উভয় হরফেই তাঁর গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি পাওয়া গেছে। আরবী ফারসী ভাষায়
নূরুদ্দিনের পাণ্ডিত্য ছিলো অগাধ; এই সব গ্রন্থ মছন করে তিনি এগুলিরই ভিত্তিতে তাঁর
গ্রন্থগুলি রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থগুলি প্রধানত ধর্মীয় গ্রন্থ।

এ পর্যন্ত নূরুদ্দিনের ‘দকায়িকুল হকায়িক’, ‘কেয়ামত নামা’ বা ‘রাহাতুল কুলুব’,
‘মুসার সওয়াল’ ও ‘বুরহানুল আরেকিন’ বা হিতোপদেশ নামক চারখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত
হয়েছে। ‘দকায়িকুল হকায়িক’ নামক গ্রন্থে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য
আচরণীয় ধর্মীয় বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ ‘কেয়ামতনামা’ থেকে
জানা যায়, কবি ১৭৯০ খৃঃ এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

“সৈয়দ নূরুদ্দিনে কএ আজিজ নন্দন
বিরচি কহিএ আমি সুন গুণিগণ ।
এগারশ সাতাল্লক্বই সন হইল যবে
পুস্তক বাঙ্গালা কৈল সুন নর সবে ।” (কেয়ামত নামা)

বাক্সালা ১১৯৭ সন 'দকায়িকের' রচনার তারিখ, না 'কেয়ামত নামা'র রচনার তারিখ—তা' বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর হিতোপদেশ রচনার তারিখ নিম্নে পাওয়া যাচ্ছেঃ

“বারশ’ তিন সনে পুস্তক লেখা যায়
পড়িলে শুনিলে জ্ঞান জর্খিব সভাএ
‘বোরহানুল আরেকিন’ কিতাব দেখিয়া
কহিলুম হিত উপ বাক্সালা রচিয়া”

তাহলে দেখা যাচ্ছে ‘বুরহানুল আরেকিন’ দেখে যে কাব্য (হিতোপদেশ) তিনি রচনা করেন, তার তারিখ হচ্ছে বাঙ্লা ১২০৩ সন। কবিকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে মনে করা হয়।

২২ টি বাব বা অধ্যায়ে বিভক্ত বিরাট গ্রন্থ ‘দকায়িক,’ ইমাম হাফিজুদ্দীন নফসী রচিত ‘কন্জুদ্-দকায়িক’ নামক আরবী ফিকাহ্ শাস্ত্রমূলক গ্রন্থের তর্জমা। ‘দকায়িকে’র প্রথম ‘বাব’-এ মৃত্যুর বর্ণনা মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ করে তোলেঃ

“কহি প্রথম বাব সুন মন দিয়া।
যে রূপে রাখিলা প্রভু মগত সৃজিয়া॥
ভিন্ন এক স্থানে নিয়া বাকিয়া রাখিলা।
মনুষ্য মগত মধ্যে ছানি দিয়া থুইল॥
দশলক্ষ প্রাচীর বাকিয়া একঘর।
মৃত্যুকে রাখিলা নিয়া সেঘর অন্তরায়”

হযরত মুসা কুহিতুরে আদ্বাহর দিনার লাভ করেছিলেন। তখন মুসার সওয়ারলের জবাবে আদ্বাহতাল্লা “জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বকথা” প্রকাশ করেন, ‘মুসার সওয়ারল’ নামক ক্ষুদ্র কাব্যটিতে তাই বিবৃত হয়েছে।

‘রাহাতুল কুলুব বা কেয়ামতনামা’ও ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত এক বিরাট গ্রন্থ। এটিও ধর্মবিষয়ক পুঁথি। বহু আরবী ফারসী গ্রন্থ মছন করে কবি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থেরঃ

“প্রথম বাবেত জান কেয়ামতের বাণী।
দ্বিতীয় বাবেত কেয়ামতের ভয়-ভীতি কথা।

তৃতীয় বাবেত দোজখের কথা ।
 চতুর্থ বাবেত কহি বিহিস্তের বাণী ।
 পঞ্চম বাবেত কহি মাতা-পিতার কথা ।
 ষষ্ঠ বাবেত জ্ঞান রেবা-খোর কথা ।
 সপ্ত বাবেত কহি রোজা নামাজের কথা ।
 অষ্টম বাবেত সুরা মানা করিয়াছি ।
 নবম বাবেত জ্ঞান ছবাব নমাজ ।
 কোরাণ পড়ন পুন্যকথা দশ বাবে ।
 একাদশ বাবে জ্ঞান রোজা জন্মপুন্য;
 স্ত্রী-পুরুষের দায় দোয়াদশ বাবে ।
 ত্রয়োদশ বাবে মিথ্যা কহিতে নিষেধ ।
 চতুর্দশ বাবে শুন চর্চার বয়ান ।
 পঞ্চদশ বাবে জানা হাছদের কথা ।
 ষষ্ঠদশ বাবে শুন নেকীর বাখান ।
 সপ্তদশ বাবে কহি সপ্তদশ বাবে ।
 অষ্টাদশ বাবে শুন নছিত কথা ।
 নবদশ বাবে শুন নানা পরস্তাব ।”

মুসলমানের ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সমগ্রটাই এ গ্রন্থের আওতায় পড়ে ।
 নুরুদ্দিনের ‘হিতোপদেশ’ বা ‘বুরহানুল আরেকিন’ তাসাউক-মূলক গ্রন্থ । এ কাব্যের
 রচনার তারিখ পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ।

(এ) মুহম্মদ উজির আলী

কবি মুহম্মদ উজির আলীর একখানি মাত্র কাব্য আবিস্কৃত হয়েছে । কাব্যটির নাম
 ‘নসল-ই-উসমান ইসলামাবাদ’ বা শাহনামা । কাব্যে কবির সুদীর্ঘ পরিচয় লিপিবদ্ধ
 হয়েছে । চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামে কবির জন্ম । কবির জ্যেষ্ঠ
 ভ্রাতার নাম ‘শাহাজাদা নাজির আলী ।’ এই নাজির আলীই নাকি সুপ্রসিদ্ধ বাজার ‘নাজির
 হাট এর প্রতিষ্ঠাতা । কবি তাঁর ভাই নাজির আলীর নির্দেশেই ইসলামের তৃতীয় খলিফা
 হযরত উসমানের বংশধরগণের পরিচয়মূলক এ বিরাট কাব্যখানি রচনা করেন ।

“নবি বাদে খিলাফত সিদ্ধিকে মিলিল।
 তারপরে উমর যে খলিফা হইল।
 তারপর উস্মান যে নূর আদিকার।
 নবিজি দামাদ সেই কেতাবে প্রচার।
 আখেরে পাইল কে প্রথমে লেখিল।
 উস্মান নসল হৈতে পুস্তক রচিলা”

উজির আলীর এ গ্রন্থখানির ভিত্তিঃ

“তওয়ারিখ ওসমানী যেই আরবী জবান
 গদ্য হস্তে পদ্য কৈল নসলি উসমান।”

গদ্যে লিখিত আরবী ‘তওয়ারিখ-ই-উসমানী’কেই কবি বাঙলা পদ্যে ভাষান্তরিত করেন। পুস্তকটির রচনা শুরু হয় ১৭১১ খৃঃ এ। রচনা শেষ হয় ১৭১৮ খৃঃএ। কবি নিজেও উসমানের বংশধর বলে দাবী করেন; ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রামে উসমানীদের আগমন, বসবাস ও সমৃদ্ধির বিবরণ দানই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থটির সূচীপত্র দেখলেই বোঝা যায় কবি ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশে এক বিরাট কাব্য সৃষ্টি করেছেন।

কবি উজির আলীর “সারাৎ নামা” নামক একখানা কাহিনী কাব্যেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

“কষ্টতপ করে চান্দে পাই অপমান।
 মাসে মাসে মরে জীয়ে না হয়ে সমান।
 তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম।
 রূপ গুণ, খগ পক্ষীর চক্ষুর সমান।
 খঞ্জন চকোর আর কুমুদ-কুরঙ্গ।
 নয়ন দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ।”

(ট) দ্বিজ রাধাকান্ত

দ্বিজ রাধাকান্তের ভণিতাযুক্ত একখানি ‘কালিকামঙ্গল’ বা বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি মুদ্রিত হয়েছে। এ কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় বা রচনার কালের উল্লেখ নেই। কিন্তু ‘কব-

মুনির পারণাভঙ্গ' নামে তাঁর একখানি পুঁথি চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে; এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে কবি চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর কাব্যে বিদ্যার পিতৃরাজ্য হচ্ছে বর্ধমান এবং পিতার নাম বীরসিংহ। চট্টগ্রামে বিদ্যাসুন্দর রচনার যে খারা সৃষ্টি হয় তাতে দেখা যায়, এই নামগুলি আলাদা। ভারত চন্দ্র রায়গুণাকরের প্রভাবেই পরবর্তীকালে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের ঘটনাস্থল বর্ধমান বলে উল্লিখিত হতে থাকে। এর থেকে বলা যেতে পারে, ষিঞ্জ রাধাকান্ত ভারত চন্দ্রের পরবর্তী কালের কবি। তাঁর ভাষাও আধুনিক।
যেমনঃ

“তর্জন করিয়া ভারে মারিবারে ধায় ।
অসিধারী শ্যামা দেখিয়া পালায়॥
লোভ সঞ্চারিতে নারে আইসে পুনর্বীর ।
কি করিতে পারয়ে পার্বত সখা যার॥
পথেতে প্রদোষ হৈল অন্ধকার নিশি ।
নির্ণয় না হয় দিক হারাইল দিশি॥”

(ঠ) নিধিরাম আচার্য

“কালিকা মঙ্গল”র লেখক নিধিরাম আচার্য তাঁর কাব্য রচনা করেনঃ

“শকাব্দা ষোড়শ শত জরনিধি বসু
দৈব বিশ্ব বিরচিত নিধিরাম শিশু॥”

অর্থাৎ “কালিকা মঙ্গল” কাব্যটি রচিত হয় ১৬৭৮ শতাব্দে; খ্রীস্টীয় সন হচ্ছে ১৭৫৬-৫৭। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া থানার চক্রশালা নামক গ্রামে কবির জন্ম বলে সাহিত্য-বিশারদ অনুমান করেছেন। নিম্নে উদ্ধৃত ভণিতাতুলো থেকে কবির পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

“আনন্দে নয়নের জলে পাখালিলো পাএ
দুর্লভ আচার্য্য সুত নিধিরামে গাএ ।
* * * *
গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথাএ
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গাএ ।”

কবির পিতার নাম দুর্লভ আচার্য্য, মাতার নাম লক্ষ্মী এবং গুরুর নাম রামচন্দ্র। আরেকটি ভর্ণিতায় তাঁর মাতামহ গঙ্গারামের নাম পাওয়া যায়। এটি একটি নতুন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। ভারত চন্দ্রের 'বিদ্যা সুন্দর' কাব্য রচনার চার বছর পরে এ কাব্যটি রচিত হয়। নিধিরামের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের ঘটনাস্থান "উজ্জয়িনী"। সুন্দরের পিতার নাম গুণসার (গুণসার, গুণিসার, বা গুণসাগর)। মাতার নাম কলাবতী, এবং রাজ্যের নাম রম্মাবতী। এ কাব্যে বিদ্যার পিতা হচ্ছে বিক্রম কেশরী এবং মাতা চল্লরেখা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি রয়েছে এ কাব্য তা' থেকে অনেকখানি মুক্ত। কবির কবিত্ব শক্তি অতি সামান্য হলেও তা তাঁর নিজস্ব; অল্প পরানুকরণের নীতি তিনি অনুসরণ করেননি। তাঁর কাহিনীতে 'দেবতা একবারে অন্তরালবর্তী' নয়।

কবির ভাষা সহজ এবং বক্তব্য সুস্পষ্ট; যেমন বিদ্যা ও সুন্দরের সাক্ষাতের পর—

'দুইজনের চারি চক্ষু হইল মিলন।
আস্বাতে দেখিল যেন দ্বিতীয় মদন॥
হরিষে কুমারী করে লাস অভিলাস।
কসহার ঘরের চোর আইল মোর পাশ॥'

এই ভাষার মধ্যে কোনো কারুকার্য বা অস্পষ্টতা নেই। বিদ্যার রূপ বর্ণনা অংশটি গতানুগতিকঃ

"সুন্দরীর মুখ পানে দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শরীর চান্দে পাইলেক লাজ॥"

(ড) মুক্তারাম সেন

চতুর্মঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবির নাম মুক্তারাম সেন। অবশ্য তাঁর কাব্যের প্রকৃত নাম 'সারদা মঙ্গল।' সাধক কবি মুক্তারাম অষ্টাদশ শতকের চট্টগ্রামী কবিদের একজন। মুখ্যভূগণের হিন্দু কবিদের প্রায় সকলেই হয় দেব-দেবীর প্রশস্তি বা প্রতিষ্ঠা মূলক কাব্য রচনা করেছেন না হয় রামায়ণ-মহাভারতের তর্জমা করেছেন; দেব-দেবী বর্জিত নেহাৎ মানব-রস-সিদ্ধিক্ত কাব্য রচনায় তাঁরা নিরুৎসুক। মুক্তারাম সেনও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি বিষয়-নিষ্পৃহ ছিলেন। সাধুসংগ ও তীর্থ পর্যটনেই চিরকুমার মুক্তারাম তাঁর জীবন কাটান। মাধবাচার্য্য প্রভৃতির চতুর্কাব্যের মত মুক্তারামের কাব্যও একটি চতুর্কাব্য।

কুছ রাগ

“মধুপুরী জ্ঞাএ রাধার বন্ধু হে
না জ্ঞানি কপালে কিবা আছে
পাইলে যুবতী নব মধু হে
অলি হইয়া রহে কালা পাছে । ধূয়া
রাধার বধের ভাগী হইবে সেই নারী
ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে
মরিমু পড়িমু শোকে জড়িহে
জল বিনে মীন যেন আছে ।
ন জাইয় রাধার প্রাণ বন্ধুহে
হারাইলে ন পায় হেন দেখি॥”

(ঢ) বদীউদ্দিন (কাজী)

‘কায়দানী কেতাব,’ ‘কাতেমার সুরনামা,’ সিকৎ-ই-ইমাম নামক তিনটি পুঁথি ও কিছু সংখ্যক পদাবলীর রচয়িতা, কাজী বদীউদ্দিন চট্টগ্রামের অষ্টাদশ শতকের কবিদের একজন । ‘সিকৎ ই-ইমানে’ কবি আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

“চক্রশালা পুরাণ বস্তি জানে সবহাম ।
তাতে এক মৌজা ‘বাহুলী’ আছে নাম॥
সেই স্থানে চিকণ কাজি করিছে বসতি ।
উত্তম পুরুষ ছিল ভাগ্যবস্ত অতি॥
তানপুত্র আব্দুব শরীফ ছিল নাম ।
তৃষামস্ত ছিল সেই দরবেশ উপাম॥
তান ঘরে এক পুত্র সৃজন হইল ।
তামামুদ্দিন খোন্দকার নাম যে আছিল॥
তাহান ঔরসে জন্নি দেখি এ সংসার ।”

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার বাহুলী গ্রামে কবির জ্ঞাতি বংশধরেরা আজো বাস করছেন। কবির পূর্ব-পুরুষ ছিলেন চিকন কাজি,—তাঁর-ই নামে এ গাঁয়ের এক অংশের নাম হয়েছে “চিকম কাজি পাড়া।” রাগ ভাল নামার কবি সংগীতবিদ চম্পাকাজী ছিলেন কবির বাঙালা শিক্ষক।

‘কাহ্নদানি কিতাবে’র বিষয়বস্তু হচ্ছে শরা-শরিয়ৎ। এ ধরণের কাব্যে কবিত্ব শক্তি বিকাশের সুযোগ কম। ‘সিফা-ই-ইমান’ ও একই জাতীয় গ্রন্থ। হযরত আলী মূর্তজা একদিন তাঁর স্ত্রী, নবিনন্দিনী হযরত ফাতেমার অভিনিহিত রূপ দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন,—‘ফাতেমার সুরতনামার বিসয়বস্তু হচ্ছে এই। এই বাঙালা পুঁথিটি আরবী হরফে লিখিত। হযরত আলীঃ

‘সুরত দেখিয়া আলী শান্ত হইল মন
সুব্হান আদ্দাহ্ বুলি বুলিলা জোবান।
* * * *
এই মতে শাহা আলী ফাতেমা দেখিল
আপনার মনে ভাবি পরিচয় পাইল
ফাতমার সুরতনামা সমাপ্ত হইল
পুস্তক দেখিয়া জ্ঞান এসব লেখিল।’

কবির সর্বশেষ উক্তিটিতে মনে হয়, কবি হয় কোনো পুস্তক অবলম্বনে এ কাব্য রচনা করেছিলেন; আর না হয় আরবী-ফারসী কোনো গ্রন্থ থেকে তা তর্জমা করেছেন। লেখকের রচনা একেবারেই মামুলি। কোনো কবিত্ব-শক্তি নেই।।

(৭) বালক ফকির

বালক ফকিরের দু’খানি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে—‘চৌতিশার পুঁথি’ আর ‘ফারেদুল মুক্তাদি।’ কবি ছিলেন আলী রজা ওরফে কানু ফকিরের শিষ্য। উভয় গ্রন্থেই তিনি বারবার তাঁর পীরের নাম শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করেছেন। কবি আলী রজা অষ্টাদশ শতকের লোক; কবি বালক ফকির তাঁর সমসাময়িক; কাজেই, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, অর্থাৎ ইংরেজ আমলের সূচনার দিকে তিনি বর্তমান ছিলেন, এ অনুমান করা যেতে পারে।

চৌতিশার পুঁথিটি দেহতত্ত্ব বিষয়ক রচনা। 'কারেদুল মুক্‌তাদি' একটি তর্জমা গ্রন্থ বলে মনে হয়; মূলগ্রন্থঃ

“যতেক নিয়ম ধর্ম মুছলমানি কাজ
আদি অন্ত নিখিলেস্ত কিতাবের মাঝ।”

সেই কিতাব দেখেই তিনি বাঙ্লা জ্বানে 'কারেদুল মুক্‌তাদি' রচনা করেন। প্রকৃত মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় সকল কাজই এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মূল গ্রন্থটি ফারসীতে লেখা।

“দিন শেষ হৈল এবে যত মুসলমান
অনাচার করে নিত্য হারাইয়া জ্ঞান।” —

এ সব মুসলমানকে সুপথে ফেরানোর জন্য কবি কাব্য রচনা করেছেন। কবির পীর “শাহা আলী রজা গুরু অমূল্য রতন।”

(ত) মুহম্মদ দানীশ

কবি দানীশ 'গুল-ই-বকাউলি'র কবি মুকিমের কাব্যগুরু স্থানীয় ছিলেন। কবি মুকিম অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে 'গুল-ই-বকাউলি' কাব্য রচনা করেন; এই কাব্যে দানীশের নাম প্রসঙ্গের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং, দানীশ আঠারো শতকের মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর নিবাস ছিলো চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে 'সুলুকবহর' গ্রামে।

মুহম্মদ দানীশের একটি মাত্র পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে তা-ও খণ্ডিত। পুঁথিটির নাম 'জ্ঞানবসন্ত বাণী'। কোনো এক রাজপুত্র এক রমণীর প্রেমে পড়ে অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকে; তখন তার পাত্রমিথেরা সুন্দর সুন্দর গল্প ফেঁদে প্রমাণ করার চেষ্টা করে নারী প্রেমের কোনো মূল্য নেই। নারী স্বভাবতঃই 'কুটিল এবং বিশ্বাসঘাতিনী' রাজপুত্রের চৈতন্য সম্পাদনের জন্যই গল্পগুলির অবতারণা।

পুঁথিটি একটি তর্জমাগ্রন্থ। কবির পিতার নাম 'আরব'ঃ

‘জ্ঞান বৃদ্ধি পুস্তকের বাণী সুধাময়
রচএ দানীশ হীন আরব-তনয়।’

কবির ভাষা সুন্দর। পদাবলী কবিতার রীতিতে রচিত তাঁর কিছু খণ্ড কবিতাও আছে।

হোসেন ফকীর নামক অপর এক কবি 'রাশি গণনার পুঁথি' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই হোসেন ফকীর চট্টগ্রামের কবি বলে মনে হয়। তাঁর পুঁথিটির লিপিকর হচ্ছেন কবি আলী রজা ওরফে কালু ফকীরের পুত্র শরাকতুল্লাহ। এতে মনে হয় কবি অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের লেখক।

'সিফৎ নামা'র কবি নুরুল্লাহ এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 'সুফি সানাউল্লাহর সিফৎনামা' রচয়িতা কবি আজমত উল্লাহ অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হন।
 এঁরা দু' ভাই। এঁদের নিবাসস্থলঃ—

“হীন (ম) ত্তি নুরুল্লাহ ছুণে চাট্টিগ্রাম স্থল।
 স্বর্গস্থল যেন হয় সুচারু নির্মল।
 দৌলতপুর রাজ্য মোর এ ক্ষুদ্র উহারি।
 বিরচিত চিত্তকথা ধর্মমানে স্মরি।”

চট্টগ্রামের অন্তর্গত দৌলতপুরে কবি ভাতৃঘর জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের পূর্ব পুরুষের নাম 'গদাই মুনদার'; পিতামহের নাম 'নিয়াজ্জ' এবং পিতার নাম 'মুহমিন' বা 'মুহাম্মিন'। নুরুল্লাহ তাঁর কাব্যে আধুনিক ফেনী মহকুমার কতিপয় শরীফ পরিবারের তারিফ বর্ণনা করেছেন। আজমত উল্লাহর কাব্যেও ব্যক্তি-প্রশস্তিমূলক কাব্য— 'সানাউল্লাহ' নামক কোনো সুফী ও তাঁর পরিবারের লোকজনের প্রশংসাই কবির লক্ষ্য। প্রসংগক্রমে কিছু হাদিস এবং আরব দেশের কিছু কিছু প্রথাও বর্ণিত হয়েছে। রচনায় কাব্যগুণ নেই।

কাইমুদ্দিন নামে চট্টগ্রামের এক কবি এই শতকে 'চমন বাহার' নামক একখানি কাব্য রচনা করেন।

নবম অধ্যায়

গীতি কবিতা

(ষোড়শ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক)

মধ্যযুগের কবিরা যে শুধু কাহিনী কাব্য কিংবা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন তা' নয়। বহু কবি খন্ড ও গীতি কবিতা এবং সংগীতও রচনা করেছেন। এইসব খন্ড ও গীতি-কবিতা রচনা করতে গিয়ে তাঁরা প্রচলিত পদাবলীর রচনারীতি ও রূপ বহুলাংশে গ্রহণ করেছেন। সুফী মতবাদের সাথে পরিচিত বৈষ্ণব কবিদের কাছে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী যেরূপ শেষ পর্যন্ত জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপকে পর্যবসিত হয়েছে, সুফীপন্থী মুসলিম কবিরাও বাঙলায় কাব্য রচনা করতে গিয়ে তেমনি বহুক্ষেত্রে আশিক-মাতকের রূপক হিসাবে রাধাকৃষ্ণের প্রতীক ব্যবহার করেছেন। “রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে মুসলিম কবিরা যে সব কবিতা রচনা করেছেন, তা' কোনো বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মমতের আঁওতায় রচিত নয়।” কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে অন্ধ অনুকরণও হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খন্ড কবিতার এই কবিদেরকে ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ বলা অযৌক্তিক; কবি হিসেবে এঁরা মুসলমান, এঁদের কাব্য রচনার রীতি পদাবলীর রচনা রীতির অনুরূপ— এই হচ্ছে এঁদের বৈশিষ্ট্য।

চট্টগ্রামের বহু কবিই খন্ড কবিতা রচনা করেছেন। কারো কারো শুধু খন্ড বা গীতি কবিতাই পাওয়া গেছে। ফতে খান এবং সুন্দর ফকির নামক দুই গীতি কবিকে ষোড়শ শতকের চট্টগ্রামের কবি বলে অনুমান করা হয়; চট্টগ্রামের পীর দরবেশের উল্লেখ প্রসঙ্গে কবি মুকিম ‘গুল-ই-বকাউলি’তে বলেছেন:

“শাহ জাহিদ, শাহ পন্থী, আর শাহ পীর,
হাদি বাদশাহ, আর শাহ সুন্দর ফকির।”

কাজেই কবি ষোল-সতের শতকের লোক—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি সাধক ছিলেন তা-ও-মুকিমের উক্তি থেকে প্রমাণিত। তাঁর রচনার নমুনা:

চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া ।
একহাতে বাজুবন্দ আর হাতে বাঁনী
সোন্দর ফকীর কহে হামো পরবাসী ।

ফতেখানের ভণিতায় প্রকাশ—তিনি ছিলেন ‘পীর মীর হৈয়দ সুলতান (শাহের) মুরীদ । কাজেই, তিনি ষোল কিংবা সতের শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন, একথা বলা যেতে পারে । পোতন, ফতন ও ফতেখান একই ব্যক্তি কি-না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না । তাঁর ভণিতাটি নিম্নরূপঃ

“ভব কল্পতরু জ্ঞানহ আন্দার
পীর মীর শাহ সুলতান ।”

সপ্তদশ শতকে কমর আলী, নওয়াজিশ খান এবং শমসের আলী ছাড়াও হৈয়দ আইনুদ্দিন, গেয়াস খান এবং আলি মিয়া নামক কবিরা খন্ড কবিতা রচনা করেন । হৈয়দ আইনুদ্দিনকে চট্টগ্রামের কবি বলে অনুমান করা হয়ে থাকে । কবি মুকিম তাঁর পূর্ববর্তী চট্টগ্রামের যে সব বিখ্যাত কবির নামোল্লেখ করেছেন তার মধ্যে গেয়াস খানের নাম আছে । গাএস, গায়াস, গেয়াস খান বা গএয়াস যে ‘গিয়াস’এর বিকৃতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই । তিনি সতের শতকে বা আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন । কবি আলি মিয়ার নামও মুকিম উল্লেখ করেছেন । কাজেই আলী মিয়াও সতেরো শতকের শেষ দিক, না হয় আঠারো শতকের প্রথম দিকের কবি । জনশ্রুতি এই যে কবির নিবাস রাউজান খানার সুলতানপুর গ্রাম ।

রূপ ও অভিসারের বর্ণনায় হৈয়দ আইনুদ্দিন যেমন সিদ্ধ হস্ত, তেমনি জীবনের পরিণাম বর্ণনায় তাঁর কাব্যে শাস্ত্রত সত্যের দীপ্তিতে সমৃদ্ধ । তাঁর রূপ এবং অভিসার বর্ণনাও আসলে এক আধ্যাত্মিক সত্যেরই পরোক্ষ বর্ণনা মাঝঃ

“খোশ না লাগে মোর গৃহের বে-ভারঃ
রাজপছে ননদিয়া দিছে আঁখি ঠার।”

— কবি বলছেন গুপ্ত মন্দিরে গিয়ে ‘নাগরকে’ বরন করে নাও । “উঠানেত হাটু পানি সমুখে গড় খাই । সোনা হেন কায়াখানি রাখিমু কোন্ ঠাই ।” কবি বলছেন, চিন্তার কারণ নেই— “এক চিন্তে প্রভু ভাব, মিলাইবা কান্ত ।” মানুষ অমর নয়—তাকে একদিন

এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবেই— সেদিন তার প্রতিটি অঙ্গের কাছে ভেট বা শুক চাওয়া হবে। প্রতিটি অংগের সন্ধ্যবহার না করলে সেদিন কি জ্বাব দেবে মানুষ?

“তলব হইলে সাংগ কি লইয়া যাইবা।
চাহিবেক নৌকি ঘাটি কি উত্তর দিবা॥
উত্তম কি ভেট লইয়া ঠাকুর ভেটিবা।
প্রতিস্থাসে কোন কর্ম করিছ বুলিবা॥”
শ্রবণে শুনিলা কিবা শব্দ সুললিত।
মুখে কোনো জাপ্ সার জপিলা স্মরিত॥
দুই হস্ত পদ যুগে কৈলা কোন কাম।
অঙ্গুলীতে জপমালা কি লইলা নাম॥
চিতান্তরে জিটমূলে কিরূপ দেখিলা।
হিয়ার মাঝে কেবা আছে তারে নি চিনিলা॥ ”

কবি আলী মিয়্যার রচনায় মৌলিকতা বা গভীরতা নেই। কবি গেয়াস খানের রচনার নজীর হিসাবে নিম্নের পদটি উল্লেখযোগ্যঃ

“তোমার সুখের খবর কোথায় গেলে পাইনু।
সেবিয়া তোমার পদ আর কিছু লৈমু॥
যেখানে করিলা বন্ধু এ রাজা পীরতি।
কি না দোসে দিয়া বন্ধু হইলা ভোর মতি॥
কাহাকে কহিমু দুঃখ কে জানে বেদনা।
সঙ্গের সঙ্গিয়া ভাই কেহ নহে আপনা॥”

আঠারো শতকে ঐ রীতির বিপুল সংখ্যক কবি আবির্ভূত হন। চট্টগ্রামের কবিদের মধ্যে আবাল ফকির, মুহম্মদ রজা, আলিরজা, আলাউদ্দিন, এরশাদুল্লাহ, চম্পাগাজী, চামারু, ফাজিল, নাসির মোহাম্মদ, ফকির ওহাব, হৈয়দ নাসির, বকসা আলী, কাজী বদিউদ্দিন, মুহম্মদ আলী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

সাধক কবি আলী রজ্জার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। পদাবলীর রীতিতে তিনি যেসব গীতি কবিতা রচনা করেছেন তাতে সুফীদের অধ্যাত্মদৃষ্টিই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর ‘বংশী’ আমাদেরকে মওলানা রুমীর ‘মসনবী শরীফে’র বংশী বেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

“অখন্ড মহিমা যার নাহিক তুলন
 মারিয়া জিয়ায় বংশী না জানি কেমন ।
 না হয় বংশীর ধনি পূর্ণ কামশর
 আলাপ করিতে মাত্র প্রাণ তেজে ঘর ।
 যার নাম বেদ শাস্ত্র অঙ্করে না ধরে
 পরম বংশীর সানে সে নাম নিঃসরে ।”

এ বংশী সাধারণ বংশী নয়; কারণ—

‘বংশী হেন মূর্তি ধরে

তুন রাখি প্রাণ হরে

বংশীমূলে জগতের চিত্ত ।’-

এ বংশীধনি যার কানে এসে প্রবেশ করে সে বড় ভাগ্যবান । এ বাঁশী কে বাজাচ্ছে? তিনিই বাজাচ্ছেন—“জগতের কায়-মনে যার যন্ত্রগীত” ।

কবি ফাজিল মুহম্মদ ও ফাজিল নাসির একই ব্যক্তি বলে কেউ কেউ অনুমান করেন । নাসির মুহম্মদের খন্ড কবিতাগুলিও গতানুগতিক পদাবলী কবিতার সীমিত রচিত । এতে প্রকাশের স্বকীয়তা বা আবেগের তীব্রতা নেই । তবে তাঁর একটি কবিতা বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য । পৃথিবীতে প্রবাস জীবন কাটানোর পর মানব যাত্রীর কাছে ‘স্বগৃহে ফেরার আহ্বান এসেছে; কিন্তু কবি কি করে শূন্য হস্তে এই দূতর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে স্বগৃহে ফিরবেন?—মানব হৃদয়ের এই শাস্ত জিজ্ঞাসা অতি চমৎকার ভাষায় কবি বর্ণনা করেছেনঃ

“দিনে দিনে আসেরে নাথ মোর বাড়ীর খবর
 কি লৈয়া যাইমু দেশে শূন্য দুই কর ।
 ভরিমু সুবর্ণ ভরা না রাখিমু ধারে
 লহরে মারিল নৌকা পাইয়া বালুচরে ।
 ভরিমু সুবর্ণের বণিজ না বুঝিনু ভাও
 ওকাইল যমুনার জল চরে লাগিল নাও ।
 যত ছিল পাইক মাঝি সব দিল লুক ।
 না জানি নসিবে মোর কত আছে দুখ ।
 স্তর নাই, কূল নাই, রইবারে নাই ঠাই

‘রাগভালে’র পুঁথি রচয়িতা বকশাআলীর নিবাস ছিলো ‘বেলমোড়ি’ গাঁয়ে। তাঁর পিতার নাম আরব চৌধুরী এবং পীরের নাম দানীশ কাজি। তাঁর খন্ড কবিতাগুলি রচনা হিসাবে সাধারণ স্তরের।

ব্রজসুন্দর সান্যালের মতে ওহাব ককির চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার হাওসার (খরন্দীপ) বাসিন্দা। কবি চামারার বাড়ী ছিলো সুলতানপুর।

‘চম্পাগাজী’ চট্টগ্রামের ‘সতর পটুয়া’ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এই গ্রামে তাঁর বংশধরেরা আজো বসবাস করছেন। রাগনা’র একটি ভণিতায় দেখা যায় কবির পিতার নাম আব্দুল কাদিরঃ

‘আব্দুল কাদির সুত চম্পাগাজী নামে।’

তিনি পণ্ডিত ও হাড়িদের সংগতি শিক্ষক ছিলেন। চম্পাগাজী কাজি বদিউদ্দিনের সমসাময়িক।

দশম অধ্যায়

ইংরেজ আমল ও মুসলমান

(সাধারণ আলোচনা)

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শারেক্তা খান পুত্র বৃজর্গ উমিদ খান চট্টগ্রাম জয় করেন এবং চট্টগ্রাম স্থায়ীভাবে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত আমরা পাশ্চি নব্বই বছরের ইতিহাস। তথা কথিত পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। এই সময়টা চট্টগ্রামে নিরবচ্ছিন্ন মুঘল যুগ বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য—যুদ্ধের নামে এই প্রহসনে, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মীরজাকর, রায়বল্লভের যড়যন্ত্রে ও বিশ্বাসঘাতকতার, কুচক্রী ক্লাইভ জয় লাভ করে এবং বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ক্লাইভের আদেশে জঘন্যভাবে নিহত হন। এই বিশ্বাসঘাতকতার ইনাম স্বরূপ মীরজাকর ক্লাইভের ডাবেদার নবাব রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরজাকরের জামাতা, স্বদেশশ্রেমিক মীরকাসিম ইংরেজ বনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঙলার স্বাধীনতা কিছুকাল বজায় রাখেন। তাঁর পতনের পর স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কেউ রইলোনা। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বনিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহ্ সাহ আলমকে বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা রাজস্বদানের শর্তে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের কমতা লাভ করে। এখন থেকে কার্যতঃ এই কোম্পানী দেশের মালিক হয়ে বসলো, বাঙলার স্বাধীনতা সূর্ব অন্তিমিত হলো। ইংরেজ বনিকদের এই বিজয় শুধুমাত্র শাসক পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ থাকলোনা। এ দেশের সামাজিক কাঠামো, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মন-মননের ক্ষেত্রেও তা ব্যাপক পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৭২-১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেশে কতিপয় গুরুতরো পরিবর্তন লক্ষিত হয়। রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতার স্থানান্তরিত হলো, নবাব হলেন স্বভিজেন্দ্রী। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলো এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অফিস আদালত থেকে রাজস্বাধা কারসী উঠে গেলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন ও কারসী ভাবার বিতাড়ণ বাঙলার সন্ত্রাস্ত মুসলমান সমাজের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দেয়।

এর কিছুকাল আগেই বাঙলাদেশে চার্লস গ্রাণ্টের উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা চালুর প্রচেষ্টা চলে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম কেব্রীর কলিকাতা আগমন, শ্রীরামপুর ইংরেজ মিশনে কেব্রীর বোগদান ও বাইবেলের বাংলা গদ্যানুবাদ, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে এদেশের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার সাথে ওয়াকিবহাল করা ও দেশের ভাষা বাংলা শেখানোর জন্য কলকাতার কোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠিত হয়। দেশে ইংরেজি শিক্ষা এ ভাবেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ফারসীর ক্ষেত্র সংকুচিত হতে থাকে। কোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক হিন্দু পণ্ডিত ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের উদ্যোগে সংকৃত কলেজ স্থাপিত হয়। দেশের আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনকে হিন্দুরা প্রভু পরিবর্তন বলে স্বীকার করে নিয়ে, ইংরেজের প্রতি সহযোগিতার দরাজহস্ত প্রসারিত করে। হিন্দুরা মুসলিম রাজত্বে যেমন ফারসী শিখেছে তেমনি ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজি শিখে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করলো। কিন্তু সদ্য কমতা থেকে বঞ্চিত মুসলমানেরা ইংরেজের শাসন, তার ভাষা ও সাহিত্য কোনো কিছুই স্বীকার করে নিতে পায়নি। তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করতে থাকে। শত বছরেরও অধিক কাল ধরে এই অসহযোগ চলাতে থাকে।

কলে রাজ্য, ভাষা ও সম্পদ হারিয়ে মুসলমানরা নতুনতরো বিপদের সম্মুখীন হয়; খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারে মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসেও প্রচণ্ড আঘাত লাগে। বিস্তু মুসলমানেরা এসব নীরবে মুখ বুজে সহ্য করার পাত্র নয়। 'ওহাবী আন্দোলন' ও পূর্ব বংগের 'করাজী আন্দোলন'র মাধ্যমে সেই বিদ্রোহের বিস্কারণ ঘটে। ১৮৫৭ এর সিপাহী-বিপ্লব আজাদির জন্য মুসলিমের অভূতপূর্ব আত্ম-ত্যাগেরই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। হিন্দুরা সিপাহী বিদ্রোহে ভয়ানক বিচলিত হয়; "কলিকাতার সন্ত্রাস্ত অদ্রলোকেরা হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশের জন্য এক সভা করেন। সভার রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালি প্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তির উপস্থিত ছিলেন। সভার সিপাহীদের বিদ্রোহের নিন্দা করে এবং বিদ্রোহ দমনে সরকারকে বাবতীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যাব পৃথীত হয়।" (সঃ প্রভাকর ২৮শে মে, ১৮৫৭) সিপাহী বিপ্লব হলো মূলতঃ

মুসলমানদের স্বাধীনতার যুদ্ধ, আর সে সময়ের শিক্ষিত সত্ত্বান্ত হিন্দুরা ছিলেন এই সংগ্রামের ঘোর বিরোধী দালাল শ্রেণী। বিপ্লব ব্যর্থ হলো। মুসলমানদের উপর নেমে এলো নতুনতরো নির্বাতন। এই নির্বাতিত, নিপীড়িত, সকল ব্যাপারে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের করুণ চিত্র ১৮৭১ খৃঃ এ রচিত হান্টারের 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' নামক গ্রন্থে অংকিত হয়েছে।

মুসলমানদের এই সর্বনাশের জন্য হান্টারের মতে, ইংরেজরাই ষোলো আনা দায়ী। ১৯০০ খৃঃ অ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে আর তেমন কোনো আন্দোলন দেখা না গেলেও, ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুর নব জাগরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, অকিস-আদালত, শিক্ষা-সাহিত্যে হিন্দুর একাধিপত্য মুসলমানদেরকে ভাবিয়ে তোলে। ১৯০৫ খৃঃ- এ বাংলা ভাগ করে পূর্ব বংগ ও আসাম নামে এক পৃথক মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ গঠন করায় মুসলমানরা নিজের ভাগ্য গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল আন্দোলনের ফলে তাও বানচাল হয়ে যায়। ক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিরোধ তীব্র হয়ে উঠে, শিক্ষায়-দীক্ষায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রসর হিন্দু সমাজ মুসলিম স্বার্থের প্রত্যেকটি ব্যাপারে ঘোর বিরোধিতা করতে থাকে। দীর্ঘদিন পরে মুসলমান আবার তার জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপ সংরক্ষণে সচেতন হয়ে ওঠে, এবং স্বতন্ত্র জাতীয়তার ভিত্তিতে একদিন পাকিস্তানের দাবী তোলে। ১৯৪৭ ইংরেজির ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে হিন্দু সংখ্যাগুরু অঞ্চল নিয়ে হিন্দুস্থান ও মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চল দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে গোড়াতে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের জীবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজি কাব্য ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয় এবং সেই সাহিত্যের অনুকরণে, বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হয়, পদ্যের স্থলে গদ্য সাহিত্যের প্রধান রীতি হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃত পন্ডিতেরা যে গদ্য সৃষ্টি করলেন তাতে করে দেশে সাধারণ্যে-প্রচলিত ভাষা থেকে আলাদা এক সংস্কৃত-প্রধান গদ্যের উদ্ভব হয়। ১৮০০ খৃঃ- এ কলিকাতায় কোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা এদিক দিয়ে একটি সুশাস্ত্রকারী ঘটনা। ১৮২৫ খৃঃ- এ গদ্যে কতকগুলি বাঙলা পুস্তক প্রকাশিত হয়ে হিন্দুরচিত আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করে। ক্রমে এই সাহিত্য হিন্দু জাতীয়তার বাহন হয়ে উঠে।

অন্যদিকে, মুসলমানেরা ১৮২৫ খৃঃ পর্যন্ত কাব্যে প্রাচীন মুঘল ঐতিহ্যের অনুবর্তন করেন। মুসলমানেরা যখন প্রাচীন কাব্য ধারার অনুবর্তন করছেন, (১৮০০-১৮৫৭ খৃঃ)

তখন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সাধনা-রত। বংকিম মারকত পাশ্চাত্য প্রভাব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হলো বাঙলা সাহিত্যে। ইত্যবসরে মুসলমানদের মধ্যেও ইংরেজের সাথে আশোষ-মীমাংসার মনোভার সৃষ্টি হয় এবং আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিমদের প্রবেশ ঘটে। মীর মুশাররফ হোসেন মুসলমানদের মধ্যে এই ধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক।

১৮০০ খৃঃ-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাবিত বাঙলা কাব্যের সূত্রপাত হলেও, চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরো কিছুকাল পুরোনো ধারার অনুর্তন চলতে থাকে এবং মুসলমানদের মতো বহু হিন্দু কবিও পুরোনো ধারারই অনুর্তন করেন। প্রত্যন্তবর্তী এই জেলাটিতে ইংরেজ আমলে প্রাচীন ধারার এই অনুসরণের কারণ খৃঃতে হবে ইংরেজ আমলের সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতা থেকে এর দূরত্ব, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও মুসলিম প্রাধান্যের মধ্যে।

একাদশ অধ্যায়

ইংরেজ আমলের কবি ও কাব্য পরিচিতি

এই আমলের গোড়ার দিকের কয়েকজন কবি— মুহম্মদ রজা, আলী রজা, মুহম্মদ মুকীম, মুহম্মদ কাসিম ও ছৈয়দ নুরুদ্দিনের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কালের দিক দিয়ে এঁরা ইংরেজ আমলের কবি, কিন্তু কাব্য-বস্তু, রচনা রীতি ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে এঁদের স্থান মুঘল যুগে। পলাশীর ভাগ্য বিপর্যয়ের পরও দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে, অর্থাৎ ১৮০০ খৃঃ পর্যন্ত মুঘল ঐতিহ্য অব্যাহত থাকে। উল্লিখিত কবিদের কাব্য রচনাকাল মোটামুটি এই সময়ের মধ্যেই পড়ে।

উনিশ শতকে এই ধারার আরো কয়েকজন মুসলিম কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের অনেক হিন্দু কবিও উনিশ শতকে মঙ্গল কাব্যের ঐতিহ্য অনুসরণে কাব্য রচনা করেন। চট্টগ্রামের হিন্দু কবিদের মধ্যে পান্চাত্য ভাবধারার আধুনিক কাব্য রচনার পথিকৃৎ হচ্ছেন কবিবর নবীন সেন।

(ক) কবি চুহর

উনিশ শতকের প্রথম দিকের চট্টগ্রামের কবিদের মধ্যে চুহরের নাম সর্বাত্মে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পূর্ব-পুরুষের নাম আজমত। আজমত গৌড় থেকে সগোত্র চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। আজমতের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন কবি চুহর। কবি চুহরের পিতার নাম ওয়াইজুদ্দিন, পীরের নাম মতিউল্লাহ। পীরের ইচ্ছানুযায়ী তিনি অপরিণত বয়সে 'মনোহর মধুমালতী' ও বৌবনে 'কমিলশাহ দিলারাম' নামক প্রেমমূলক কাব্যদ্বয় লিখেন :

“বালক সমস্ত মধুমালতী রচিল
কতকাল শেষে দিলারাম প্রকটিল।”

কবির পৃষ্ঠপোষক জাকর আলীর পূর্ব-পুরুষ ধনমন্ত্ৰীও গৌড় থেকে আগত। তিনি সিদ্ধিক বংশের লোক। 'সত্যের সুমেরু জাকর আলী'র

.....'মুখে পাইয়া ভরসা
রচিত্তে উত্তম গ্রন্থ হীনে কৈল আশা।'

কিন্তু কবির বয়স তখন চতুর্দশ পেরিয়ে গেছে এবং তার ফলে 'কায় আলসিত মন আলমারী স্নীতি।' জাকর আলীর আদেশে কবি 'আজর শাহা-সমনরুখ' ও 'সুজন চিত্রাবতী প্রসঙ্গ' রচনা করেন। এই দুটি কাব্যের বিষয়বস্তুও প্রেম।

কবির পৃষ্ঠপোষক জাকর আলী চৌধুরী দোহাজারীর বাসিন্দা। তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উকিল ছিলেন। কবির কাব্য পাঠে জানা যায়— তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেনঃ

"আরবী ফারসী মধী আর হিন্দুয়ানী।
পঠিয়া কুমার হৈল শাস্ত্রে মহাতপীঃ
নানা শাস্ত্র অভ্যাসিলা সুবুদ্ধি কুঁঅর।
কৃতির শব্দ হৈল দিগ দিগন্তরঃ
চাট্রিয় চাকা আদি শ্রমি নানা ঠাম।
কৈলকাতা ডাকশালে লিখাইল নামঃ
ভাগ্যগুনে কোম্পানীর উকীল হইয়া।
পুনরপি চাট্রিয়ামে আইল পলটিয়া।"

কলিকাতায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নতুন টাকশাল স্থাপিত হয় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এবং এই টাকশালে টাকা তৈরি হতে থাকে ১৮৩৫ খৃঃ থেকে। কাজেই কবি যে এই সময়ের লোক হাতে সন্দেহ নেই। কলিকাতা টাকশালে প্রথম জীবনে চাকুরি করার পর জাকর আলী চৌধুরী চট্রিয়ামে ওকালতি পেশা অবলম্বন করেন। তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উকিল ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁরই আদেশে কবি দু'খানি কাব্য রচনা করেন— 'সুজন চিত্রাবতী প্রসঙ্গ' ও 'আজর শাহ সমনরুখ'। এতে বোঝা যায় কবির এ দুটি কাব্য উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই রচিত।

চট্রিয়ামের বাঁশখালি থানার কাথারিয়া গাঁয়ে খোন্দকার বংশে দরবেশ ও কবি চুহরের জন্ম। তাঁর কোনো বংশধর নেই বলে স্থানীয়-সূত্রে জানা গেছে। উক্ত গাঁয়ের চাঁদগাজী চৌধুরীর দীঘির পাড়ে, দক্ষিণ পূর্ব কোণে 'চুহর শার দরগা' নামে কবির কবর বর্তমান।

কবি চুহুর পণ্ডিত কবি। তাঁর 'মনোহর মধুমালতী' 'কমিল শাহ্ দিল্লারাব', 'সুজন চিত্রাবতী প্রসঙ্গ' নামক কাব্য তিনটির কোনো প্রতিশ্রুতি আজো পাওয়া যায়নি। শুধু মাত্র 'আজর শাহ্ সমনরুখ' নামক কাব্যটিরই একটি আদ্যন্ত খণ্ডিত অনুশ্রুতি পাওয়া গেছে। সৈয়দ সুলতান, আলাওল, শাহ বারিদ খান ও নীর কবি মুহম্মদ খানের গুণ ও কাব্য-সুন্দর কবি চুহুরের কাব্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব পড়েছে; হিন্দু পুরাণ ও জ্যোতিষেও তাঁর জ্ঞান ছিলো প্রচুর।

'আজর শাহ সমনরুখ' কাব্যটির কাহিনীটি নিম্নরূপ :

অধিবিক্র দেশের রাজা 'আজরশাহ্' ও রাণী সুনালার সন্তান হয় না। এজন্য রাজার বড় দুঃখ। দেশের জ্ঞানী ঙ্গী ও পণ্ডিতেরা বললেন, সুনালার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই, মশরিক দেশের শাহজাদী 'সমনরুখ'কে বিয়ে করলে রাজার পুত্র জন্মাবে। আজরশাহ্ সমনরুখকে বিয়ে করলেন। রাণী সুনালার প্রতিহিংসা বলে জাদু-টোনার সাহায্যে রাজাকে নিবীৰ্ব করে দেন। দৈবজ্ঞের পরামর্শ মতো রাজা প্রতিবেদক ব্যবহার করে পুরুষত্ব ফিরে পান ও সমনরুখের গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সুনালার আবার তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জাদু-টোনার সাহায্যে সমনরুখ ও তাঁর পুত্রের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। এদেরকে রক্ষা করার জন্য, আজর শাহার উজির বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে বাগদাদ পৌছেন 'হাকাহান' নামক পীরের দোয়ার জন্য। সেখানে পীরের সাথে তাঁর দিদার হয়।

এর পর পুঁষির কোনো পৃষ্ঠা বর্তমান নেই। পুঁষিখানা একটি কারসী কাব্য অবলম্বনে রচিত বলে মনে হয়। কবির নিজের উক্তি :

“তান (জাকর আলীর) আজা পাই হীন দুঃখিত চুহুর
ভাদিয়া কারসী ভাষা রচিত নয়র।”

(খ) হামীদুল্লাহ খান :

হামীদুল্লাহ খান কবি হিসেবে যতো না প্রসিদ্ধ তার চাইতে বহু গুণে বশরী ঐতিহাসিক হিসাবে। তিনি কারসী ভাষার 'আহাঙ্গিসুল খাওয়ানীন' নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা। চট্টগ্রামের এই ইতিবৃত্তে চট্টগ্রামের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। আরবী ও কারসী ভাষার হামীদুল্লাহ খান সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর

জন্ম ১৮০৭/৮ খৃঃ-এর দিকে। সিপাহী বিপ্লব হয় ১৮৫৭ খৃঃ-এ ; দেশের আজাদির জন্য এই মুসলিম পরিচালিত আন্দোলনে সমগ্র ভারতবর্ষ সাড়া দেয়। কিন্তু হামীদুল্লাহ খান ছিলেন এই আন্দোলনের বিরোধী এবং ইংরেজ কোম্পানীর সমর্থক। দেশের এই সার্বিক বিপ্লবে দেশবাসীর পক্ষে না দাঁড়িয়ে তিনি ইংরেজকে সাহায্য সহায়তা করেন। তারই ইনাম পান 'বী বাহাদুর' খেতাব।

হামীদুল্লাহ খান শুধু কারসী ভাষার ইতিহাসই রচনা করেননি, তিনি বাঙলা কাব্য রচনারও হাত দিয়েছিলেন। 'জাগপথ' ও 'শাহাদতুদ্যান' নামক তাঁর দুখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাছাড়া তিনি 'গদ্য-পদ্য' মিশ্রানো একখানা গ্রন্থও রচনা করেন, গ্রন্থখানির নাম 'ক্লীবদ্ভ মোচন'। 'জাগপথ' ও 'ক্লীবদ্ভ মোচন' ১২৭৭ সালে মুদ্রিত হয়। 'উল্কার-ই-শাহাদত' কাব্যটির রচনা কবির পঞ্চাশ বছর বয়সে। ১২৭০ সালের ১৫ই কাছন, মোতাবেক ১২৮০ হিজরীর সত্তেরই রমজান, শুক্রবারে তিনি এটি সমাপ্ত করেন। অর্থাৎ ইংরেজীর ১৮৬৩ খৃঃ এ গ্রন্থটি রচিত হয়।

'ক্লীবদ্ভ মোচন' নামক কাব্যটিতে কবি দাড়ি মুক্তনের নিন্দা ও দাড়ি রাখার কজিলত ব্যয়ন করেছেন। 'শ্রী শ্রী পরমেশ্বর' নামে গ্রন্থটির সূচনা। আরম্ভটি নিম্নরূপ :

"হিজ্জার ন্যায় লোকস্বর্গের পতি। আশি তাহার পোনের প্রকার দোষ লিখিতেছি। মহামহিম মহাসরোরা মনজোগ করিবেন।"

"ওহে ভাই, যদি আপনাকে নামর্দ খোজার ন্যায় বানাইতে চাহ, তবে দাঁড়ি কাট কেন না খোজা ও নামর্দের দাড়ি হয় না।" এই ধরনের পনেরো দফা যুক্তি অবতারণার পর লেখক দাড়ি ছেদন না করার জন্য তাঁর 'হেতুবাদ ও সারকথা' লিপিবদ্ধ করেছেন। তার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

'তাহার মর্ষ এই জে ইখর জেমত বানাইয়াছেন তেমম বানাইবার কেহরই কদাচিত সাধ্য নাই এবং তাহার কর্ব কখনও ব্রোখা ও অনার্ক নহে। জেমত হস্তার্জে পক্ষ অঙ্গুলি সহিতে সৃজিয়াছেন; যদি তাহাতে অন্য অঙ্গ হইতে বেশি জোড়া না ধাহিত তবে কিছু ধরা না জাইত।' এই ধরনের যুক্তি পেশের পর লেখক হস্তো বন্ধ পদের আশ্রয় নিয়েছেন। রচনার নমুনা :

"তম ভাই মিলাক্কা লোকদের পত

সুর্ষতার লোমহীন বানরের মত

হিজরার ন্যায় কিবা শ্রদ্ধা তার মনে
ঘসিতে অন্যের সঙ্গে বদনে বদনে ।”

কিংবা

“দাড়ি মুখে দিল প্রভু পুরুষ লক্ষণ
নারী খোজা-মুখে দাড়ি না হয় কখন ।
আপনার পুরুষত্বে কি মন্দ দেখিলা
যার অন্য পুরুষত্ব লক্ষণ ত্যজিলা ।”

কাব্যের সর্বত্র তিনি আত্মাহর পরিবর্তে পরমেশ্বর শব্দ ব্যবহার করেছেন—যেমন ঃ—

“প্রমেশ্বরে তার ভার করিতে প্রকাশ’

‘উচিৎ প্রমেশ্বরের শোকর সর্বাধা—” ইত্যাদি ।

‘ত্রাণ পথ’ কাব্যে ‘খোদা নিরঞ্জন’ একত্ব, তাঁকে ‘চিনন ও জ্ঞাননের উপায় ।’
‘সুকৃতি’ বাহাতে ‘লোকে ত্রাণ পায়’, এবং ‘কুকৃতি’ বাহাতে মানুষ ‘দুইকুল হারায়’
ইত্যাদি পদ্যে আলোচিত হয়েছে । কাব্যটির আরম্ভ নিম্নরূপ ঃ

“প্রথমে সকল আদ্যে স্বরি প্রভু নাম
পরিবার সহ করি নবিকে ছলাম
পরে কিছু ধর্মপথ দেখাইতে চাই
বাহাতে তরয়ে লোক নিজ ত্রাণ পাই
কলে পথ দেখানিয়া নিরঞ্জন সারে
দেখাইতে আদেসিল নরে বাহা পারে ।”

কাব্যটির সমাপ্তি এইরূপ ঃ

“নবম প্রভুর প্রেম মনেতে বাড়ান
সেই যে পরম হেতু ত্রাণ জন্যে জান
দশম সে মৃত্যু কথা সমায়ে স্বরণ
পাপ হতে ভয় জন্যে স্বরিলে মরণ ।”

ডঃ এনাথুল হক 'ত্রাণ পথ' কাব্যলোচনা প্রসঙ্গে 'দাড়ি রাখন ও কাটনের' কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে 'কুবজু মোচন' কাব্যেই দাড়ির বিষয় আলোচিত হয়েছে। 'ত্রাণ পথ' কাব্যে নয়।

'ভলজার ই-শাহাদত' মধুরময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত একটি কাব্য।

(গ) হাশমত আলী চৌধুরী

কবি হাশমত আলী কালি চৌধুরী কটিকছড়ি থানার ভোজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন স্বল্পশিক্ষিত, স্বনামধন্য, প্রতাপশালী ক্ষমিদার। কিন্তু প্রতিভা অনেক সময়ই শিক্ষার ভোয়াকা রাখে না। হাশমত আলী শিক্ষা-দীকার দিক দিয়ে পচাংপদ হলেও তিনি ছিলেন কবিত্ব শক্তির অধিকারী।

কবি হাশমত আলী 'কমকচ রাজা ও কপকুর শাহ' তথা মলয়া-মাহমুদ নামে একখানি কাহিনী কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানি আকারে প্রকাণ্ড। তবে মৌলিক সৃষ্টি নয়, কোনো কারসী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। কাব্যটির ভাষা মোটামুটি সুন্দর এবং স্থানে স্থানে নতুন ছন্দ বন্ধারে মুখরিত। কাব্যরচিতে মহারাজা ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ আছে। কাজেই ইহা ১৮৫৮ খৃঃ-এর পরে রচিত।

হাশমত আলী 'আরব্য উপন্যাসের' কাহিনী অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করেন বলে শোনা যায়—কিন্তু তার কোনো প্রতিলিপি আজো পাওয়া যায়নি।

কবি বহু গান এবং গীতি-কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাগুলির অধিকাংশই সংগীত এবং 'প্রণয় ও আদিব্রত ঘটিত'। কোনো কোনো গানে তিনি বাঙলা ও উর্দু পদের অঙ্কিত সঙ্কলন ঘটিয়েছেন। যেমনঃ

এ পছ দি গেলে বুঝি এয়ার

পাওজারে।

গয় পাওজা গলে লেপট লে লেওজারে। খুঃ

জান মেয়ে করকে চুরি খাই কোথা গেল প্যারি

চাতরে চাতরে চোরারে।

বসতি স্থাপন করেন বলে জানা যায়। কবি 'সিরাজ হবিল' নামক হাদীস-সম্পর্কিত একখানি কাব্য রচনা করেন। চট্টগ্রামের দৌলতপুরের বাসিন্দা, 'অল্পে-শাল্পে বিশারদ' ও 'আলিম গণিনের' ভক্ত জমিদার জ্ঞান আলীর নির্দেশে তিনি এ কাব্য রচনা করেন :

“কহিল মোহর স্থানে সেই মহামতি
রচিবারে গ্রন্থ এই করিয়া আরতি
হাদিস না বুজে সবে আরবী বচন।
বুঝিতে রচ পুস্তক বাঙ্গালা বচন।”

গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে কবির উক্তি :

“গুরু স্বরি নবি ভজি প্রভুতে মাসিলুং
'হেরাজ হবিল' নামে পুস্তক রাখিলুং।
হেরাজ হবিল কহে আরবের গণ,
“পছেয়ো চেরাগ” কহে বাঙ্গালা বচন।”

কবির উপর আলাওলের প্রভাব ছিলো ব্যাপক। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আলাওলের বাক-ভঙ্গী পর্যন্ত অনুকরণ করেছেন। কবির রচনার নমুনা হিসাবে নিম্ন উদ্ধৃতিটি উল্লেখযোগ্য :

“যে চাহ সে কহি তুমি আএ নিরঞ্জন
কোন কাজ নহে বিনে আজ্ঞাএ তোমার।
তুই ঢেউ মুই তৃণ আএ জগপতি
ঢেউর সাক্ষাতে তৃণে কি ধরে শকতি।
ঢেউএ তৃণেরে নিআ যথাতে ঠেকাএ
আবশ্য তৃণের যুক্ত যাইতে তথাএ।
কিবা শক্তি ধরে কাষ্ঠ পোতলার গণ
শিল্পীকে যেমত করে নাচএ তেমন।
শিল্পীকে অঙ্গুলি ডোরে যেমত লাড়এ
কাষ্ঠের পোতলা সব তেমত নাচএ
কি শক্তি ধরিতে পারে মৃত কাষ্ঠ যন্ত্র—
যেমতে বাজাএ যন্ত্রী সেই বোলে যন্ত্র।
আর মত বুলিতে না পারে যন্ত্রগণ
তুই যন্ত্রী মুই যন্ত্র আএ নিরঞ্জন।”

‘বেনজির বদর-ই-মনির’ নামক অপর এক কাব্য গ্রন্থের রচয়িতার নামও বৈয়দ নাসির। কেউ কেউ মনে করেন আলোচ্য কবি এবং ‘বেনজির বদর-ই-মনির’ কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তি। ‘বেনজির বদর-ই-মনির’ আরবী হরফে লিখিত একটি প্রেম কাহিনী; ভাষায় তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই।

(ঙ) মোশারফ আলী

সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কবি দীর্ঘকাল বার্মা মুলুকে বাস করেন। তাঁর কাব্যে সীতাকুণ্ডের উল্লেখিত বর্ণনা আছে

মোশারফ আলীর কাব্যের নাম ‘কমরুজ্জামান ছকুরা খাতুন’ বা রসমঞ্জরী। কমরুজ্জামান ইরানের বাদশাহ্ আন্দলুকের পুত্র আর ছকুরা খাতুন চীনরাজ কলিংগদা মণির কন্যা। এদের দু’জনের প্রণয় কাহিনীই এ কাব্যের উপজীব্য। বারশত বক্রিশ মনীতে কাব্যটি রচিত; ইংরেজি সন হচ্ছে ১৮৭০। এটি একটি হিন্দী গদ্য উপন্যাসের তর্জমা।

“কাব্য মূল ছিল আদ্যে গদ্য উপন্যাস
তছনিপি মোজামেল হক হিন্দুস্থানী ভাশ।”

মোজামেল হক বিরচিত, হিন্দুস্থানী গদ্য উপন্যাস অবলম্বনে এ কাব্য রচিত। রচনা স্নীতি গতানুগতিক।

(চ) উজির আলী মুন্সী

কবি উজির আলী মুন্সী উনিশ শতকের শেষার্ধের লেখক। তাঁর একটি পুঁথি পাওয়া গেছে—পুঁথিটির নাম ‘ছায়েদ কুমারের পুঁথি’। ইহা একটি কাহিনী কাব্য।

কাব্যে বর্ণিত কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় :

“চট্টগ্রাম জেলার মাজে পটীয়ার অন্তর
শ্রীমতির কুল জান উত্তম নগর।
“শ্রীমাই সিন্দুর উত্তর দিগে বেলপর্বত নাম
তাহার উপরে জান অধিন মোকাম।”

পটীয়া ধানার নিকটেই শ্রীমতি বলে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামেই কবির জন্ম। কবির পিতার নাম মহম্মদ আলী। পিতামহের নাম রকি এবং পীরের নাম আব্দুল জব্বার। কাব্যটির আরও নিম্নরূপ :

“রসুলের চারিসুখা সিদ্দিক ওমর
হয়রত ওসমান আর আলী ধনুর্ধর।
সে সব ভারীপ আমি কি কইতে জানি,
সে সকল कहিয়াছে আদ্যর সে গুণি।”

(ছ) হায়দর আহমদ

কবির একখানি মাত্র কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাব্যটির নাম ‘এলমাজ্জ বাদশাহর পুঁথি। ইহা একখানা কাহিনী কাব্য। মাগরিবের রাজা শামশাদের ছিল সাত পুত্র। সর্ব কনিষ্ঠের নাম ‘এলমাজ্জ’। এলমাজ্জ শিকার করতে গিয়ে এক দরবেশের সাক্ষাৎ পায়; দরবেশ ছিলেন কাজিব দেশের রাজা; তাঁর সাত সাতটি পুত্র প্রাণ হারিয়েছে ‘অরুশ’ দেশের রাজকন্যার সওয়ালের জওয়াব দিতে গিয়ে। রাজকন্যা ‘মেহের আজেজ্জ’কে বিয়ে করতে হলে আগে তার সওয়ালের জবাব দিতে হবে, বা সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় মৃত্যু। এই খবরে ‘এলমাজ্জ’ ‘মেহের আজেজের’ প্রতি আসক্ত হয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। অবশ্য বহু চেষ্টার ফলে সে ‘মেহের আজেজ্জ’কে লাভ করে।

কবির পিতার নাম হুদরুদ্দিন। কবির বাসস্থান চট্টগ্রাম জেলার ‘মুরাদপুর’ মৌজা :

“মৌজে মুরাদপুর আর জিলে চাট্টগ্রাম
শহর কাভালগঞ্জ সাকিন মোকাম।”

কাব্যটি ১২০৪ শব্দীতে রচিত। ইয়েরেজি সন অনুসারে ১৮৪২ খৃঃ। কবি অল্প বয়সে কাব্যটি রচনা করেন। মূল কাব্যটি ফারসী ভাষায় লিখিত; ফারসী এদেশের সর্বসাধারণ বোঝেনা, তাই কবি এর বাহুলা তর্জমা করেন :

“ফারছির ভাসে সবে না বুঝে কারণ,
বাদশাহর ভাসে রচিলুম তেকারণ”

(জ) আসাদ আলী চৌধুরী

উনিশ শতকের শেষার্ধের কবি—কবির পিতার নাম; বেচাগাজী চৌধুরী; চট্টগ্রাম জেলার রত্ননিয়া থানার হোসনাবাদ প্রকাশ 'শীলমগল' নামক গ্রাম। বর্তমানে গ্রামটিকে রাজানন্দরও বলা হয়ে থাকে। কবি এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন।

'ছিন্নিন্দী' কাহিনীমূলক কাব্য। মনে হয় কবি পূর্ববর্তী কোনো কবির কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচনা করেন।

কবির কাব্যের আরও নিম্নরূপ :

“অনন্ত জনত পতি; সেই করতার
অশেষ প্রশাম করি। উদ্দেশে তাহার
অপকল্প অদ্বিত অদৃশ্য অতুল
অনন্ত অখীল আশ্রয় সেই সারমূল।”

(ঝ) সলিম উদ্দীন

চট্টগ্রামের কবি সলিম উদ্দীনও উনিশ শতকের শেষার্ধের কবি। কবির একটি মাত্র কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে—কাব্যটির নাম 'তোতী মরনা'। আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের কাহিনীর মতোই এ কাব্যও একটি কাহিনী কাব্য—কাহিনীটি অনেকখানি রূপ-কথা ধর্মী।

'নানা বিদ্যায় সুপারজ্ঞ', 'জলের সাগর', 'রসিক নাগর', 'শ্রীমন্ত ইছুর আলী'র আদেশে কবি এ কাব্য রচনা করেন। কবির কাব্যটির আরও এইরূপ :

“সেই শোক কষ্ট দুঃখ সহিতে না পারি
ভ্রমিক হইলু নিজ দেশ পরিহারি।
যেইমতে নানা দেশ ভ্রমণা করিল
যেন মতে সব রাজ্যে কৌতুক দেখিল।”

(এ৩) ওয়াজিউদ্দীন চৌধুরী

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার টেরিআইল গ্রামে কবি ওয়াজিউদ্দীন চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ক্ষুদ্র একটি কাব্য পাণ্ডুয়া গেছে—কাব্যটির নাম ‘গরকির বচন’। চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় সহ প্রলয়ংকরী সামুদ্রিক বন্যাকে ‘গরকি’ বলা হয়ে থাকে। কবিতাটিতে ১২৩৮ মধী বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে যে ধ্বংসকরী বন্যা হয়েছিল, তারই সৎকিঞ্চ অথচ সার্থক বর্ণনা আছে। সম্প্রতি ১৯৬১ খৃঃ-এর অক্টোবরে এবং ১৯৬৩ খৃঃ-এর মে মাসে চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় ও তৎসহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে—এই খণ্ড প্রলয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমরা নিজেরাই। ১৯৬১ খৃঃ-এর ‘গরকি’ নিয়েও কবিতা রচিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াজিউদ্দীন চৌধুরীর কবিতাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। তাই সম্পূর্ণ কবিতাটিই নিম্নে তুলে দেয়া হলো :

“প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার
এ তিন ভুবন মধ্যে যার অধিকার।
এ তিন ভুবন মধ্যে তিন খণ্ড হৈল
স্বর্গ মৃত্যু পাতাল বলি নাম যে রাখিল।
স্বর্গেতে রাখিল বেহেস্ত দোজক পাতালে
মর্ত্যেতে আদম সৃষ্টি আশকের হালে।
মহাশয়দ নবি আগে করিলেন পএদা,
তান নুরে ইতি আদি সৃষ্টিলেন খোদা।
ফাতেমা বিবির পদে প্রণাম যে করি,
হাচেন হোচেন পদে শির আমি খরি।
শরিয়তের চান্নি ইমাম করিনু প্রচার,
এক লাখ চকিষ হাজার পএগাঘর।
তুনি গণের পাদপদ্মে করি নিবেদন,
হীন ওয়াজিউদ্দিনে কহে গরকির বচন।”

(২)

“সওয়ালের তের রোজ পূর্ণিমার দিনে,
বারশ আটত্রিশ মধি কার্তিক পুনি খেনে।

এলাহি গজ্বব ভেজে বাঙালা জমিনে,
 রোজ মঙ্গলবার ছিল জান সব জনে ।
 শরতের ঋতু ছিল সেইতো সময়,
 তক্ত তাজ লুটি নিল আসি বসন্তয় ।
 বসন্ত হইল রাজা পবন উজির,
 বরুন সাহায্য বাহনি হৈল নীর ।
 বরুন সাহায্য পাই করিলেক জোর,
 বসন্ত শরৎ সনে জোরিল সময় ।
 প্রথম যুদ্ধেতে আইল-হনুমানের পিতা,
 গৃহ আদি উখারি ভাঙ্গিল বৃক্ষ মাথা ।
 বরুন সাজিল রণে জল অধিপতি,
 লোনা জল পাঠাইয়া পবনের 'ত'... ।
 তারা দোন যোগ হৈয়া করিলেক বল,
 না রাখিল বৃক্ষ আদি বসতি সকল ।
 উচু নীচু সব ভাঙ্গি করিল সমান,
 হরি নিল মেমা আদি বাঁরের বরের পান ।
 উপহার দ্রব্য যত সব হরি নিল,
 আবাদি মূলুক সব বিরান করিল ।
 ছরদ আছিল রাজ্য করিল গরম;
 সুখের সাগরে দিল লাগাইয়া গম ।
 দুনিয়াতে মিষ্ট ফল না রাখিল এক গোট,
 মিষ্ট পানি না রাখিল ধুইবারে ঠোঁট ।
 পবনের জোরে সব সোণয়াইয়া দিল,
 জলস্রোত আসি সব ভাসাইয়া নিল ।
 কার নিল ঘর দরজা কার ধানের গোলা,
 কার তামা পিঙল নিল আর কোলের ছাইশা
 ইতি আরঙিলাম এবে শুন সর্বজন,
 অবধান কর এবে তারিখ বিবরণ ।
 ভাস্কর দক্ষিণ পানে নেত্র বসাইয়া,
 তার ডাইনে বসু রাখি জগুন করিয়া ।
 ঋতু বসু দিন জান বিচিক মাসের,
 লিখন সমাণ্ড রোজ শুরু অসুরের ।”

(ট) তমিজী

কল্পবাজারের একটি ধানার নাম রামু। রামু ধানার মিঠাসরাই নামক গায়ে এক জমিদার বংশে আলী হোসেন চৌধুরী ১৮১৫ খৃঃ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাচাঁদ চৌধুরী নামেও পরিচিত। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কবি সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকতার যে ঐতিহ্য মুসলমান রাজা বাদশাহরা সৃষ্টি করেছিলেন আলী হোসেন চৌধুরী তা-ই অনুসরণ করেন। তিনি চারজন কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রামুর আলী হোসেন চৌধুরীর হাট, গর্জনয়ার হাট, হাইস্কুল ও মাদরাসা, তাঁরই কীর্তি।

আলী হোসেন চৌধুরীর আশ্রিত কবি চারজনের নাম—কবি তমিজী, কবি হাজি আলী, ফকির আসকর আলী ও লোকমান আলী।

কবি তমিজীর কাব্যের নাম 'লালমতী-তাজল-মুলুক'। এটি একটি কাহিনী কাব্য। মরহুম আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিখানি প্রথম ও শেষ দিকে খণ্ডিত। এর রচনার তারিখ জানা যায়নি। তবে জনাব আহমদ শরীফের ধারণা—কাব্যখানি ১৮৫৫ খৃঃ-এর মধ্যে রচিত। মসুরেকী রাজ্যের রাজা জেবল মুলুকের পুত্র তাজল মুলুকের সংগে মগুরেবী রাজ্যের শাজাদী লালমতীর পরিণয় এ কাহিনীর বিষয়বস্তু।

কবির ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গী সুন্দর। তাজল মুলুকের সংগে লালমতীর সাক্ষাতের পর দু'জনের শাদি হয় মনকীর নকীরকে সাক্ষী রেখে :

“আপাদ মস্তক যদি কুমারে হেরিল
সাক্ষী প্রায় অম্পরার ফান্দেত বাখিল
প্রথমে বয়ান হেরি দিল আলিঙ্গন
শাত্রনীতি নিকাহা পড়িল দুইজন
সাক্ষী হেতু মানুষ্য নাইক কোন জন
মনকীর নকীর সাক্ষী করিলা তখন।”

মিলনের পর দিব্যশেষে এলো বিচ্ছেদের লগ্ন :

“দিব্যশেষে কন্যা তবে মাগিল মেলানি
বিহঙ্গম আইসএ পাখার শব্দ শুনি
মেলানি দিব্যে মুখে না নিঃসরে বাণী
বচনের আগে নিঃসরিতে চাহে প্রাণি।”

আসন্ন বিচ্ছেদে কাতর ভাজল মূলুক বললো :

‘মনে লয় মর্মান্তরে তোমা দিতে ঠাই
যেন শত্রু না দেখএ রাখিতে ছাপাই।’

(ঠ) হাজি আলী

কবি হাজি আলীর একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপির খোঁজ পাওয়া গেছে। পুঁথিটির কোন নাম নেই—খণ্ডিত পুঁথি। বিষয়বস্তু বিচার করে কেউ কেউ এর নাম করেছেন ‘মওত নামা’ বলে। মানুষের শরীরে রোগ-ব্যাধি পয়দা এবং মৃত্যুর পর মানুষের দাফন পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থার বিশদ বিবরণ এ কাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাব্যটি বহু ‘বাব’ বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

কাব্যটি যে ফারসী হিন্দী কাব্য অবলম্বনে রচিত সে সম্বন্ধে কবির উক্তি নিম্নরূপ :

“ভাঙ্গিয়া ফারসী হিন্দী লিখি পরস্তাব।”

রচনায় তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। দাফনের পর, মৃতের প্রতি মওতের উক্তি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

“দাফন পচাতে সঙ্গী মৃত্যুএ কহিব
অই মৃত নাম নিজ ধরিয়া ডাকিব।
তোমার অগ্রেতে আমি আশিয়াছি এথা
কতদিন বিলম্ব করিলি তুই তথা।
আমার সঙ্গতি হৈবি কেনে না স্মরিলি
মৃত্যু পছ তুই কি কারনে না চাহিলি।
তোহার হইব মৃত্যু না স্মরিলি মন
ভুলিয়া রহিলি কেনে মালের কারণ।
মালের হিসাব লৈব কেনে না জানসি
অন্তকালে কি হইব না ভাবিলি বসি।”

(ড) কবি ফকির আসকর আলী

কবি ফকির আসকর আলীর পাণ্ডুলিপিটি আসলে আরবী হাদিসের তর্জমা। পাণ্ডুলিপিটি প্রথম ও শেষ দিকে খণ্ডিত। আশ্রয়দাতা আলী হোসেন চৌধুরীর ইংগিতে তিনি এই তর্জমা কার্যে হাত দেন :

“আরবী হাদিস তবে বাঙ্গালা গ্রহণে
প্রকাশিয়া রাখ ভূমে রাজকৃতি সনে।”

অথবা

“আরবী কালাম নবী বঙ্গে পয়ারিয়া
সাবদি রাখহ ভূমে প্রকাশ করিয়া।”

‘পঞ্চসতী প্যারজান’ নামক মুদ্রিত পুঁথিটিও এই কবিরই রচিত বলে মনে হয়। এটি একটি কাহিনী কাব্য। ভাষা দুর্বোধ্য, কবিভূ-বর্জিত এবং বহু ক্ষেত্রে অর্থহীন।

(ঢ) লোকমান আলী

কবি লোকমান আলীর একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তা-ও আদ্যন্ত খণ্ডিত। পুঁথিটির কোনো নাম নেই। সাহিত্য বিশারদ জনাব আব্দুল করিম এর নামকরণ করেছেন—‘হাদিস কালাম বাণী’। তাঁর এইরূপ নামকরণের ভিত্তি নিম্নলিখিত ভণিতা :

“মাতা পিতা গুরুজন শিরে বন্দি সে চরণ
ঝাষ্প দিলু সাগরের মাঝে
আলী হোসেন মুখে শুনি হাদিস কালাম বাণী
রচিলেক মোহুসিন কাজে।”

কবির আশ্রয়দাতা, আলী হোসেন চৌধুরীর সাথে, প্রশ্নোত্তর স্থলে কবি হাদিস আলোচনা করেন। আলী হোসেন চৌধুরী একদিন বললেন—দু’জনের এ মৌখিক আলোচনা তো টিকে থাকবে না, আরবী-ফারসীও লোকে বুঝে না, কাজেই কবি যদি এসব বাঙলা ভাষায় কাব্যে গ্রথিত করেন মানুষের উপকার হবে :

“পার যদি কর সব করি এক ঠাই
পুস্তক ভণিতে এক পয়ার মিলাই।

আরবী ফারসী লোকে নাহি বুঝে ভাস,
বান্ধালা হইলে পূরে সকলের আশ
বান্ধালা করিয়া রচ মোর আঙ্কা ধরি
এ কথা শুনিব লোকে বহু শ্রদ্ধা করি।”

গ্রন্থখানির সূচীপত্র থেকে জানা যায়, সালাত, রোজা, শরীয়ত, তরীকত, আঠার মোকাম, দশ দরওয়াজা এবং নবীর ওফাতের বিবরণ এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। নানা ধরনের কেতাব থেকে কবি তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

কবির জন্মস্থান পটিয়া থানা থেকে দু’মাইল দূরে অবস্থিত নাইখাইন গ্রামে। কবির পিতার নাম মোহাম্মদ জমা।

(গ) নীলকমল দাস

চট্টগ্রামের দক্ষিণ রাউজানের অন্তর্গত কোয়েপাড়া নিবাসী নীলকমল দাস বিরচিত ‘বৌদ্ধ রঞ্জিকা’ বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। উনিশ শতকে কিংবা তার পূর্বে বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে কোনো কাব্য বা গ্রন্থের ‘সাক্ষাত’ এ এলাকায় পাওয়া যায় না। এদিক দিয়ে কাব্যটির গুরুত্ব অনেকখানি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, লেখক নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন না।

কাব্যটি চট্টগ্রাম শহরের চন্দনপুরা নিবাসী মরহুম আব্দুল হামিদ মাষ্টার প্রকাশ করেন। কাব্যের ভূমিকায় প্রকাশক লিখেন—“এক প্রাচীন পালি ভাষায় ‘খাদুত্তাং’ বিস্তীর্ণ গ্রন্থ নামে অভিহিত ছিল। সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পার্বত্য প্রদেশের রাজা মৃত ধরমবরু খান বাহাদুরের পত্নী কালিন্দী রাণী বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া বান্ধালা ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে অনুবাদিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বৌদ্ধদিগের একমাত্র সার গ্রন্থ বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। কেননা ইহাতে বুদ্ধ দেবের বাল্য ক্রীড়া হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সম্যক ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত আছে।” ১২৯৬ বাঙলায় এ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। নীলকমল দাস সম্ভবত চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের উক্ত রাজসরকারের কর্মচারী ছিলেন।

কাব্যের ভণিতায় আছে :

“শ্রীমতী কালিন্দী রাণী

ধর্মবন্ধ রাজরাণী

পৃথ্যবতী সূশীলা মহিলা

তান আঙ্গা অনুবলে

দাস শ্রী নীলকমলে

এ বৌদ্ধ রঞ্জিকা প্রকাশিলা।”

(ত) শংকর ভট্ট ও সদানন্দ ভট্ট

চট্টগ্রাম জেলার উত্তর রাউজান মুনসেফীর অন্তর্গত কদলপুর একটি বিখ্যাত গ্রাম। ‘নিমাই সন্যাস’-এর রচয়িতা শংকর ভট্ট ও সদানন্দ ভট্টের জন্মস্থান এই কদলপুর বলে জানা গেছে। এ ক্ষুদ্র কাব্যটি এঁদের যুক্তরচনা বলে মনে হয়। কাব্যটির চরণ সংখ্যা মাত্র ১৬৮। চট্টগ্রামে বহু বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া গেলেও বৈষ্ণব মতবাদের প্রবর্তক শ্রী চৈতন্যদেব সম্পর্কে অন্য কোনো কাব্য চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে বলে আমাদের জানা নেই।

কাব্যটির ভণিতায় দু’জন কবির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে বলেই এটিকে দু’কবির যুগ্ম রচনা বলে মনে করা হয়। কাব্যটির আরম্ভ নিম্নরূপ :

“বন্দ মাতা সিদ্ধু সুতা করি পুটাঞ্জলি

কৃপা কর নারায়নী কহি পদাবলী

সুধামৃত কৃষ্ণ কথা দিবেন যোগাই

যেন মতে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই

নৈরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন

মৎস্য কূর্ম বরাহচ্চ রূপে যে বামন

* . * * *

নিমাই রূপে গৌরহরি নদিআ প্রকাশ

যেমতে কৈলেন প্রভু আপনে সন্ন্যাস।”

(খ) রঞ্জিত্রাম দাস

কবি রঞ্জিত্রাম দাসের বাসস্থান চট্টগ্রামের পুরৈকোড়া নামক গ্রামে। কবির কাব্যের নাম 'লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি বা পাঁচালী'। ক্ষুদ্র পুস্তিকা, পাতার সংখ্যা মাত্র পনেরো। ভণিতায় আছে :

“লক্ষ্মীর পাঞ্চালি শুনে রঞ্জিত্রাম দাস,
চরণে শরণ দেয় বলি তব পাশ।”

কাব্যের বন্দনা অংশটি নিম্নরূপ :

“বন্দম যে গণপতি মূসিক বাহন
চারি ডুঙ্গ এক দস্ত গজেন্দ্র বদন।
গরুড় বাহনে বন্দঘ দেব নারায়ন
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কল্লুভ ভূষণ।”

কবির বিশ্বাস, যে এই পাঁচালী শুনে তার মনস্কাম সিদ্ধ হবে আর ভক্তির সাথে যে পাঠ করে 'অন্তকালে' সে 'বৈকুণ্ঠ ভুবনে' যাবে।

কাব্যটিতে তাইর (তাহার, তুচ্ছার্থে), ডোম (ভূমি), উজ্জাল (মাতাল) জালা (অংকুরিত ধানের চারা), নিবৃন্তে (নিমিষে), চোবা (চৌচা ধান), চা'র (মাটির পাত্রেয় ভাসা টুকরা) পেরাআ, টচকা' প্রভৃতি এমন কতকগুলি আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি আজো চাটগাঁয়ে ছবছ ব্যবহৃত হয়।

(দ) রামতনু আচার্য

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানা বাসী শ্রীরামতনু আচার্য 'তারিণী চৌতিশা' নামক একখানা কাব্যের লিখক। তাছাড়া শুভংকরের ন্যায় 'দেশীয় কালির' অনেক আর্ধাঙ্গও তিনি রচয়িতা। তাঁর পিতার নাম দেবজ্ঞ শ্রীরাম প্রসাদ। জয়কালীর নিকটে 'দেবগ্রামে' তাঁর বসতি ছিলো। দেবগ্রামই বর্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা থানা।

কাব্যটির আরম্ভ :

“গো ভারিনি, ভারগো এইবার,
বিপদে পড়িয়া মা ডাকম বারে বার।”

কাব্যটির সমাপ্তি নিম্নরূপ :

“কীণবৃদ্ধি মুই মৃত্ত কি বলিতে পারি
ক্লেম অপরাধ মোর হেমন্ত কুমারী।”
ক্ষিতির জখেক লোক শুনএ বচন
ক্ষিতিতে ভারিণীর গুণ গাও সর্বক্ষণ।
ভারিণীর চৌতিশা যেবা শুনে আর পঠে
অম্বকালে জাইবা ভাই ভবানী নিকটে।”

(খ) রামলোচন দাস

রামলোচন দাসের জন্মস্থান কাশ্মীর (কাশিয়াইস), চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার একটি গ্রাম। তাঁর পিতার নাম রামদুলাল মুন্সার, ম্বতরের নাম শিবচরণ দেওয়ানজি।

রামলোচন দাসের দু’খানি চৌতিশার সন্ধান পাওয়া গেছে—‘ত্রিপদী চৌতিশা’ এবং ‘আম্ব নিবেদনী চৌতিশা’। ‘ত্রিপদী চৌতিশাতে’ কবি বাঙলা চৌত্রিশটি হরফের সাহায্যে ত্রিপদী ছন্দে দেবীর চৌত্রিশটি রূপের বন্দনা করেছেন—অক্ষর পরিচয়ের সংগে সংগে দেবীদেরও পরিচয় দিয়েছেন কবি। যেমন :

ক-এ মাতা কাত্যায়ণী

খ-এ খাবর পানি

গ-এ মাতা গজানিন আই

ঘ-এ ঘোরতর রূপা

উমে-ইউমা স্বরূপা

চ-এ চতুর্ভুজ দেবী মাই। — ইত্যাদি।

‘আম্ব নিবেদনী চৌতিশা’তে দারিদ্র পীড়িত লেখক ধন-শান্তির জন্য ভবানী পদে আম্ব নিবেদন করেছেন। চৌতিশাটির পদসংখ্যা ১৩৬; এবং রচনাকাল :

“রুদ্র বসু চন্দ্র সখী সন নিরুপণ
কর্কটেতে ত্রয়োদশ দিনেতে লিখন
কুজবার সিত পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে
সমাণ্ড হইল বেলা দশ দণ্ড স্থিতে ।”

অর্থাৎ মঘী ১১৮১ সনে বা খৃষ্টীয় ১৮৫৯ সনে চৌতিশাটি রচিত । কবির ভাষা
সুন্দর এবং অনুপ্রাসের প্রয়োগ সুচর্ছ :

“শ্বেমংকরী শ্বেমাবতী শ্বেম অপরাধ
খণ্ডাইয়া অবোদ মোর করহ প্রসাদ
খণ্ড তপস্যা কৈল জন্নিয়া সংসারে
খেদ রৈল তুয়াপদ নারি দেখিবারে ।”

(ন) ভৈরব আইচ

ভৈরব চন্দ্র আইচের বাড়ীও চট্টগ্রামের দেবগ্রাম (বর্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা) ।
তিনি যে ক্ষুদ্র কাব্যটি রচনা করেন তার নাম ‘ষড়ানন ব্রত-কথা’ । মাত্র ৫টি পদ্যে
কাব্যটি লিখিত । কবির ভণিতায় জানা যায়, জরীপের সময় কবির জননী ঘরে না
থাকায়, চোরেরা তাঁর সব কিছু হরণ করে নিয়ে যায় । কবির যত ‘সম্বল’ ছিল সবই
অপহৃত হয় । তাঁর পুস্তকাদিও চোরেরা ছুরি করে; শুধু ‘ষড়ানন ব্রত-কথা’টিই রয়ে যায় ।

১২০০ মঘীর ২রা কার্তিকে কাব্যটির রচনা সমাণ্ড হয় । অর্থাৎ ১৮৩৮ খৃঃ কাব্যটির
রচনাকাল । পূর্বোক্তলিখিত হিন্দু কবিদের রচনার মতোই তাঁর রচনা গতানুগতিক এবং
দেবমাহাত্ম্য প্রতিপাদক । কবিতাটির বর্ণনা অংশে চক্রশালা, হাওলা, ঝিয়রি এবং
বাজালিয়া প্রভৃতি গ্রামের উল্লেখ আছে ।

রচনার নমুনা :

“মেঘনালে কাট ওয়া মাজে দুইখান
ক্ষীর নদীর সাগর হইতে চুন ভালো আন
সেই চুন দিয়া তবে তুলাইল পান
সুবর্ণের খিলান দিয়া সেই পান তুলান ।”

(প) কবিরাজ ষষ্টিচরণ মজুমদার

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সূচক্রদত্তী গ্রামে কবিরাজ ষষ্টিচরণের জন্ম। যৌবনে দারিদ্রের জন্য তিনি গৃহত্যাগী হন। পরে অনেক ধন-সম্পত্তি উপার্জন করে দেশে ফিরেন।

তিনি কয়েকটি শ্যামাসংগীত রচনা করেন বলে শোনা যায়। 'শুকাখ্যান লহরী' নামক একটি গ্রন্থেও তাঁর ভণিতা বিদ্যমান। মরহুম সাহিত্য-বিশারদ ষষ্টিচরণের একটি পাল্লুলিপির নামকরণ করেছেন—'শনি চরিত্র'। 'ইহার আরম্ভে গুরু বন্দনা, গনেশ বন্দনা, অভয়া বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, সর্বদেব বন্দনা, গৃহ বন্দনা, এবং শনি বন্দনা।' এর পর ভূমিকা থেকে আসল বক্তব্যের শুরু।

ভণিতায় আছে :

তব পদ পংকজে

অলিরূপে যেই মজে

সেই যায় অমর ভুবন

পাদ পদ্মে অলি করি

রাখ মোরে সুরেশ্বরী

ষষ্টিচরণের এই আকিঞ্চন।

প্রাচীন ধারার গীতি কবি

পদাবলীর আদর্শ ও রূপে গীতি কবিতা রচনার যে ধারা মধ্য যুগে প্রবর্তিত হয় উনিশ শতকেও তার জের চলতে থাকে। সূফী ও সন্ন্যাসীরা ভাবধারা প্রকাশের জন্য উক্ত কাব্যরীতির উপযোগিতা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছিলো। সমাজে পীরবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব কাব্যে আধ্যাত্মিকতা ও উদ্ভৃ-রস-রসিকতার প্রসারের জন্য অনেকখানি দায়ী। পীর বা গুরুর প্রভাব কিভাবে কবির জীবনে ক্রিয়া করেছে, মধ্য যুগের কাব্যে তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। উনিশ শতকে, চট্টগ্রামে দু'একজন কবির রচনায় এ প্রভাবের পরিচয় মেলে।

কবি আলী রজ্জার এক পুত্র কবি এরশাদুল্লাহর কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি আঠারো শতকের একেবারে সমাপ্তির দিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর অন্য পুত্র শরফতুল্লাহ ১৮৫০ খৃঃ-এর দিকে আশি বছর বয়সে মারা যান বলে জানা যায়। তাহলে

তাকে আঠারো শতকের সমাপ্তি ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কবি বলে ধরা যায়। তিনি তাঁর পিতা কবি আলী রজার মুরাদ ছিলেন; তাঁর নিবাস চট্টগ্রামের ওসখাইন নামক গ্রামে। কবির একটি কবিতার অংশ বিশেষ নীচে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

“জাগ মন আলস ছাড়িয়া ।
সতত গুরুর নাম জপরে বসিয়া॥
সকল ছাড়িয়া সার পছে বান্ধিমন
সত্ত্ব-রজঃতম হের মুদিয়া নয়ন ।
উকার সকার আর আকার সহিত
অনাহত চক্র ধ্যান করহ সতত ।
রেচক পূরক সঙ্গে তথা বাজে তত ।
চন্দ্রসূর সঙ্গে তথা একত্র করিয়া
পঞ্চশব্দ পঞ্চরত্ন তাতে মিলাইয়া ।
নানা বাদ্য রঙ্গ তথা হের হর সদায়
কিঞ্চিত্ত কহিল বুঝ তরিতে উপায় ।”

কবিতাটিতে চর্যাপদের অনুকরণ লক্ষণযোগ্য।

উনিশ শতকে, এই ধরার আরেকজন গীতি কবি হচ্ছেন মুহম্মদ হাশেম বা হাসিম। চট্টগ্রামের পটিয়া থানার একটি গ্রাম শ্রীমতি বা শ্রীমাই; এই গ্রামেই কবি জন্মগ্রহণ করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি ‘হাশিম পণ্ডিত’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পদাবলীর চণ্ডে বহু গীতি-কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর একটি গান নিম্নরূপ :

“কৈ খাম কৈ যায় মুঞেরে ননদীর আতনে
রাত্রি দিবা কানা কানি না সহে পরানে
শাওড়ি, ননদী জাল সতিনী মোহিনী
এক ঘরে চারিজন মুঞি সে অভাগিনী ।
সোয়ামী রসিয়া নাগর মুঞি সে অভাগিনী
ননদীর বাক্য ধরে তত্ত্ব নাহি জানি ।
সোয়ামী পদে সেবা দিতে না রহে চিত
এত দুঃখ দেখি আঁখি ভাঙ্গি পরে নিত ।”

দ্বাদশ অধ্যায়

আধুনিক ধারা

ইংরাজ আমলের বাঙলা সাহিত্যে তথা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে সব কারণে হিন্দুরা অগ্রণী এবং মুসলমানেরা পশ্চাৎপদ তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বাঙলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চল সম্পর্কেই এ কারণগুলি মোটামুটিভাবে সত্য—চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও। প্রসঙ্গক্রমে কবি নবীন চন্দ্র সেনের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছিলো—চট্টগ্রামে ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে বাঙলা কাব্য রচনার পথিকৃৎ হচ্ছেন নবীন সেন।

নবীন চন্দ্র সেন

(১৮৪৬-১৯০৯)

নবীন সেন, চট্টগ্রামের দক্ষিণ রাউজানের নোয়াপাড়া নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে ১৮৪৬ খৃঃ-এ জন্মগ্রহণ করেন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি রচনা করেন ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন কাল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ। কাজেই বাঙলা সাহিত্যে যখন মহাকাব্যের যুগ চলছে ঠিক সেই সময়েই নবীন সেনের আবির্ভাব হয়। তিনি মধুসূদনের অনুসারী হিসেবে কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

নবীন সেনের প্রথম গ্রন্থের নাম 'অবকাশ রঞ্জিনী' (১৮৭১ খৃঃ)। 'অবকাশ রঞ্জিনী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় বাঙলা ১২৮৪ সনে। দুটি কাব্যই কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। আন্তরিকতা, ভাবাতিশয়, অসংযত উদ্দ্বাস তাঁর এসব কবিতার বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ ভক্ত কবি ডিষ্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র এডোয়ার্ডের ভারত-আগমন উপলক্ষে 'ভারত-উদ্দ্বাস' (১৮৭৫) নামক কবিতা লিখে বিলাত থেকে ৫০ গিনি পুরস্কার পান। এর মাত্র ২৫ বৎসর আগেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন—সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। কবির স্বাধীনতার কল্পনা "আর্থাগিত্যেই" সীমাবদ্ধ, এবং ইংরাজ প্রশস্তিতে গদগদ।

এই মন্দিরের ক্ষেত্রে

আর্থের ও অনার্থের

হইবে শ্রীক্ষেত্র, মহাসম্মিলন ধাম

অনার্য ব্রাহ্মণ আর্থ

গাবে এক কৃষ্ণ নাম

আর্থ ও অনার্থ এক প্রেমে ভাসমান,

প্রতিধ্বনি তুমি সিদ্ধ গাবে হরি নাম ।”

নবীন সেনের কাব্যায়রীর মূল-বিষয়বস্তু হচ্ছে আর্থ ও অনার্থ জাতির মিলন। বিষয়বস্তুটি একটি মহাকাব্যের উপযুক্ত, সন্দেহ নেই; “কিন্তু আখ্যান বস্তুর পরিকল্পনায় এবং রচনায় মূলবস্তুর মহত্ব রক্ষিত হয় নাই।” অনার্থরা তাঁর কাছে কৃপার পাত্র, তাঁর অনার্থ চরিত্রগুলি মুহূর্তের জন্যও ছুলতে পারে না যে তারা আর্থদের চেয়ে হীন; কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে তা সত্য নয়। তাঁর রচনার গাঁথুনি বড়ো শিথিল এবং ছন্দ ত্রুটিপূর্ণ। ভাবাতিশয্য ও ভক্তিরস তাঁর কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য, ফলে অসংযম তাঁর রচনার একটা প্রধান লক্ষণ।

‘রক্তমতীর’ পর নবীন সেন যে সব কাব্য রচনা করেন তার সবগুলিরই বিষয়বস্তু কোনো না কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠাতার জীবনী আলোচনা অথবা ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপার। হজরত ঈসার জীবনী সংক্রান্ত ‘খৃষ্ট’ (১২৯৭), বুদ্ধের জীবন কথা নিয়ে ‘অমিতাভ’ (১৩০২) এবং শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা কাহিনী নিয়ে ‘অমৃতভা’ (১৩২৪) রচিত হয়। নবীন সেন ‘ভগবদ্ গীতা’ এবং ‘মার্কণ্ডেয় চঞ্জীর’ পদ্যানুবাদ করেন।

নবীন সেনের গদ্য গ্রন্থগুলির নাম ‘প্রবাসের পত্র’, ‘ভানুমতী’, এবং ‘আমার জীবন’। ‘ভানুমতী’ নামক গদ্য আখ্যায়িকাটিতে কিছু কিছু পদ্যও আছে। ধর্মমতের দিক দিয়ে তিনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন এ গ্রন্থটিতে তার পরিচয় আছে।

নবীন চন্দ্র দাস

চট্টগ্রামের আরেকজন কবি নবীন চন্দ্র দাস, নবীন সেনের কিছু পরবর্তী কালে আবির্ভূত হন। তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদক হিসাবে। মূলানুগত তর্জমার ক্ষেত্রে, বাঙলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান আছে।

নবীন দাস কালিদাসের ‘রঘুবংশ’ (১৮৯১) ভারবির ‘কিরাতাঙ্কুরীয়’ (১৯০৬) এবং ‘শিশু পাল বধে’র খানিকটা তর্জমা করেন। তাঁর প্রথম কাব্য ‘আকাশ কুমুম’ ১২৯০ বাঙলায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তার আগে কাব্যটি ‘হালি সহর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

শশাঙ্ক মোহন সেন

কবি সমালোচক শশাঙ্ক মোহন সেন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
উনিশ শতকের রোমান্টিক কবিদের মধ্যে তাঁর একটা বিশেষ স্থান আছে।

শশাঙ্ক মোহন সেনের কাব্যগ্রন্থগুলির নাম যথাক্রমে 'সিন্ধু সংগীত' (১৮৯৩), 'শৈল
সংগীত' (১৯০৭), 'সাবিত্রী' (১৩১৬), 'বর্গে ও মর্গে' (১৩১৯), 'বিমানিকা' (১৩৩১)
প্রভৃতি। তিনি মূলতঃ গীতি কবি হলেও সমালোচনা এবং সাহিত্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণেও
বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। তাঁর ভাষা সহজ ও প্রাজ্ঞ। চট্টগ্রামের প্রকৃতি কবি চিন্তকে
কী ভাবে গড়েছে তার স্বীকৃতি আছে কবির 'শঙ্খনদী' নামক কবিতায় :

তুমি মম জীবনের জননী-নির্ঝর
তোমাতে বর্ধিত এই অশান্ত কাতর
অনন্ত অভক্তি লয়ে, ছুটি অনিবার
এত দূর আসিয়াছি।

সাহিত্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণমূলক কবির বিখ্যাত গ্রন্থ 'বঙ্গবাণী' বাঙলা সাহিত্যে একটা
মূল্যবান অবদান। তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ 'মধুসূদন' (১৯২১) বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ
গ্রন্থগুলির অন্যতম।

কবি তাঁর এক আত্মীয় কর্তৃক নিহত হন।

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ

(১৮৭১-১৯৫৩)

চট্টগ্রামের গৌরব, মুনশী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের জন্মস্থান চট্টগ্রামের
পটিয়া ধানার সূচক্রদণ্ডী গ্রামে। এতিম আব্দুল করিম চাচা ও দাদার হাতে মানুষ হন।
এক,এ, পর্যন্ত পড়ে, পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি জীবিকার্জনের জন্য চাকুরী গ্রহণ করেন।
স্কুলসমূহের বিভাগীয় ইন্সপেক্টরের অফিসে তিনি দ্বিতীয় কেরালীর কাজ করে নিজের
সংসার চালাতেন।

মুনশী আব্দুল করিমের সাহিত্যিক জীবনের দুটি ধারা লক্ষ্যযোগ্য। “একটা হইল
প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও তাহার তথ্য তাল্লাস করা—অপরটি হইল সাময়িক পত্রাদি

পাঠ।" তাঁর বিশেষ কীর্তি হচ্ছে প্রাচীন পুঁথিপত্রের সংগ্রহ। বিশেষ করে তিনি মুসলিম কবিদের তথ্য উদ্ঘাটনে ছিলেন তৎপর। বহু পত্রিকার লেখক ও বহু পত্রিকা সম্পাদক মুনশী আবদুল করিমের নিজস্ব কোনো মৌলিক গ্রন্থ নেই। যে সব পুঁথি পুস্তকের সংগে তাঁর নাম জড়িত আছে সে সবই তাঁর সম্পাদিত পুঁথি এবং কোনো না কোন প্রাচীন কবি কর্তৃক রচিত। ডঃ এনামুল হকের সংগে তিনি যুগাভাবে 'আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গলা সাহিত্য' নামক গবেষণা পুস্তক লিখে মুসলিম সাহিত্যের একটা গৌরবময় অতীত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর নিজস্ব মৌলিক রচনা হচ্ছে প্রায় ছয় শতাধিক প্রবন্ধ। এসব প্রবন্ধেই সাহিত্য বিশারদ তাঁর গবেষণালব্ধ সমস্ত তথ্য ধরে রেখেছেন। অবশ্য সাহিত্য বিশারদের পাণ্ডিত্য ও মনীষার পূর্ণ পরিচয় বহন করছে তাঁর সম্পাদিত পুঁথিগুলি। তাঁর রচনা মৌলিক না হলেও সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি যে গবেষণা করেছেন তা মৌলিকতায় অসাধারণ। তাঁর সম্পাদিত 'রাধিকার মান ভঙ্গ' নামক পুঁথির ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন :

"তিনি এই দুর্লভ গ্রন্থের সম্পাদন কার্বে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহনশক্তি ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সমস্ত বাঙ্গালায় কেন—সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না।"

সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর 'বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' প্রকাশের পর পরিষদের সম্পাদক আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর দ্বিবেদী মহাশয় তাঁকে লিখেন :

"আপনি যেরূপ অক্ষুরস্ত অধ্যাবসায়, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বাঙলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাহাতে আপনার নিকট বঙ্গ সমাজ চিরঋণী থাকিবে। ... আপনার ঋণের পরিশোধে আমরা অক্ষম। আপনার প্রবন্ধগুলি পাঠক সমাজে প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ আপনার নিকটে ঋণমুক্ত হইতে পারিলেই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করিতে পারিব। আপনার পুরষ্কার ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকের হস্তে।"

বাঙলা সাহিত্যে সাহিত্য-বিশারদের অবদানের মূল্য নির্ণয়ের ব্যাপারে এই দুইজন সাহিত্য-সাধক মনীষীর উক্তিই যথেষ্ট।

সাহিত্য-বিশারদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত প্রাচীন পাতুলিপির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার; তাঁর মধ্যে মুসলমান রচিত পাতুলিপির সংখ্যা বারোশতের উপর বলে জানা গেছে। তাঁর সংগৃহীত মুসলিম রচিত পাতুলিপিগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হিন্দু রচিত পাতুলিপিগুলি রাজশাহী 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র হেফাজতে রক্ষিত হয়েছে।

সাহিত্য-বিশারদ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে ১৫০ জনেরও বেশী মুসলিম কবি ও গ্রন্থকারের নাম ও কীর্তি উদ্ধারে সমর্থ হন। তিনি প্রমাণ করেছেন—মধ্য যুগে, এমন কি ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেও সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরাই ছিলেন অগ্রসর, সৃষ্টি প্রাচুর্যে ও বৈচিত্রে শ্রেষ্ঠতরো।

সাহিত্য বিশারদের সম্পাদিত শেখ কয়জুদ্দার ‘গোরক্ষ-বিজয়’, রতি দেবের ‘মৃগলুক’ এবং আলী রজ্জার ‘জ্ঞান-সাগর’ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১ম ও ২য় খণ্ড) মহামূল্যবান গ্রন্থ; এ গ্রন্থ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গবেষক মাত্রের পক্ষেই প্রধান অবলম্বন। তাঁর সম্পাদিত ‘মুসলিম প্রাচীন পুঁথির বিবরণ’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হওয়াতে, মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্যে গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়েছে এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত ‘পদ্মাবতী’ পুঁথিটি আজো মুদ্রিত হয়নি। ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক ৪ খণ্ডে সম্পাদিত ‘মুসলিম বৈষ্ণব কবি’, নামক পুস্তকের মাল-মশলা সাহিত্য-বিশারদই সংগ্রহ করেন।

মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী

(১৮৭৫—১৯৫০)

মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের পটিয়া থানার ‘বরমা’ গ্রামে ১৮৭৫ খৃ-এ জন্মগ্রহণ করেন। আরবী, ফারসী, ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ইসলামাবাদী সাহেব রাজনৈতিক নেতা ও সমাজকর্মী হিসাবেই সমধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন, এ জন্য তাঁর সাহিত্য-কীর্তি অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী এবং পাকিস্তান বিরোধী। তা সত্ত্বেও গঠনমূলক সামাজিক কর্মী হিসাবে তাঁর কীর্তি মুছে-যাবার নয়। চট্টগ্রামের ‘ইসলামাবাদ টাউন ব্যাংক’, ও ‘একীষখানা’ তাঁরই কীর্তি।

সাংবাদিক হিসাবে ইসলামাবাদী সাহেব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ‘আল-ইসলাম’ ও ‘দৈনিক সুলতান’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নানাবিধ প্রবন্ধ সেকালে একটা ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিলো।

রাজনীতি ও গঠনমূলক সামাজিক কার্যকলাপে তাঁর জীবন নিয়োজিত থাকলেও মুসলিম জাতির অতীত ঐতিহ্যের উদ্ধারের জন্য যেমন তিনি গবেষণা করেছেন, ঠিক তেমনি সমসাময়িক মুসলিম জগৎ ও জাতির নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্যও তিনি কলম ধরেছিলেন। 'ধূগোল' শব্দে মুসলমান, 'ভূগোল' শব্দে মুসলমান', 'ভারতে মুসলিম সভ্যতা', 'ভারতে ইসলাম প্রচার'—প্রভৃতি গ্রন্থে আমাদের লুপ্ত উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য ইসলামাবাদী সাহেবের মধ্যে যে উদ্যম দেখা যায় তা সত্যিই প্রশংসার্হ। জাতিকে কতো গভীরভাবে ভালোবাসলে এ ধরনের কাজের তাগিদ আসে তার প্রশংসা তাঁর এই পুস্তকগুলি।

'মুসলিম জগতের অভ্যুত্থান ও কনষ্টানটিনোপল' নামক গ্রন্থে ইসলামাবাদী সাহেবের সমকালীন মুসলিম জগৎ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে। ইসলামী রাজনীতির মূল নীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন 'কোরাণ ও রাজনীতি' নামক গ্রন্থে। 'সমাজ সংস্কার', 'সুদ সমস্যা', 'কোরআন ও স্বাধীনতার বাণী' 'নিম্ন শিক্ষা ও শিক্ষাকর' প্রভৃতি পুস্তকে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর ভাবনা-চিন্তার পরিচয় মেলে। 'নিজামুদ্দিন আওলিয়া' তাঁর রচিত জীবনীগ্রন্থ।

তাঁর সম্পাদিত 'আল ইসলাম' পত্রিকায় তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

নজির আহমদ চৌধুরী

বাঁশখালী থানার সাধনপুর ডাকঘরের অধীন, ডোগরা গ্রামে নজির আহমদ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মকবুল আহমদ চৌধুরী। তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ সাংবাদিক হিসাবে। তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

তর্জমাকার হিসাবেও তাঁর নাম আছে। তিনি আব্দামা শিবলী নোমানীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কারুক' 'কারুক চরিত' নামে তর্জমা করেন। পুস্তকটি মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা রাখে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক বছর আগে লেখক কলকাতায় ইন্ডেকাল করেন।

আবুল মা আলী মুহম্মদ হামিদ আলী

কবি হামিদ আলী আখ্যান-কাব্য রচয়িতা হিসাবে সেকালের কাব্যমোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মোট চারটি কাব্য রচনা করেন।

কবির প্রথম কাব্য 'দ্রাতৃ-বিলাপ' ১৩১০ বাংলা মাঝামাঝি কোনো এক সময় প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, দ্রাতৃ বিয়োগজনিত গভীর বেদনাই তাঁর মধ্যে কাব্যশক্তির স্ফূরণ ঘটায়। কবির জাতীয়তাবোধ ছিলো প্রবল। সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য, এই নীতিতে তিনি আস্থাবান ছিলেন না; বরং 'মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়ার সংকল্প' নিয়েই তিনি কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কবির এই উদ্যম স্বভাবতঃই আমাদের মনে তাঁর প্রতি গভীরে সন্ত্রমবোধ জাগ্রত করে।

কবির পরবর্তী তিনটি কাব্যের নাম 'কাসেম বখ', 'জয়নালোদ্ধার' এবং 'সোহরাব বখ'। কাব্যগুলির নাম থেকেই কবির মানসিকতার দিকনির্দেশ মেলে। ঐতিহ্য সচেতন কবি কাব্য রচনা করতে গিয়ে নিজস্ব ঐতিহ্যের উপরই নির্ভর করেছেন। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'কাসেম বখই' সর্বশ্রেষ্ঠ। ছন্দের দ্রুতি এবং চরিত্র চিত্রণে দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর রচিত কাব্যগুলি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মাহবুব উল আলম

জন্ম-১ মে, ১৮৯৮, কতেয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। গাল্পিক ও ঔপন্যাসিক। 'মোমেনের জ্বানবন্দী' নামক গ্রন্থের লেখক হিসাবে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম সুপরিচিত হন। 'মোমেনের জ্বানবন্দী' আত্ম-কথা জাতীয় রচনা; আন্তরিকতা ও সুনিপুণ বর্ণনার গুণে রচনাটি রসোপার্ণ।

মাহবুবউল আলমের দুটি গল্প সংকলন 'তাজিয়া' ও 'পঞ্চঅন্ন'। 'মফিজুন' তাঁর একটি বড়ো গল্প। 'গায়ের মায়া' - তাঁর উপন্যাস। গ্রন্থকারের 'পল্টন-জীবনের স্মৃতি' রচনা হিসাবে উপভোগ্য। 'সোফ-সন্দেশ' নামক একটি 'ব্যঙ্গ-রচনা'ও তাঁর রয়েছে।

এইসব গল্প ও আত্মকথা ছাড়া, তিনি কয়েকটি ইতিহাস পুস্তক এবং দেশ পরিচিতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'বার্মার হাংগামা', 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' (পুরানা আমল), 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' (নবাবী আমল) উল্লেখযোগ্য। বহুদিন তিনি সাংবাদিক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৭ আগষ্ট, ১৯৮৬ তে ইন্তেকাল করেন।

দিদারুল আলম

মাহবুবউল আলমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিদারুল আলম কয়েকটি বাস্তবধর্মী ছোটো গল্প রচনা সাহিত্যিক মহলে সীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগে, অতি অল্প বয়সেই মারা যান।

মুহম্মদ এনামুল হক

জন্ম--১৯০৬; চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বখ্তপুর গ্রামে। বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান নিয়ে যৌর্য গবেষণা করেছেন, ডঃ এনামুল হক তাঁদের অন্যতম। 'বঙ্গ সূফী প্রভাব' এবং 'চট্টগ্রামী বাঙলার রহস্যভেদ' নামে তাঁর দু'খানা গবেষণামূলক পুস্তক প্রাক-স্বাধীনতা আমলে ছাপা হয়। এছাড়া, মুঙ্গী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগে, যুগ্মভাবে তিনি 'আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য' নামক একখানি পুস্তক রচনা করে সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহ্যের একটি বিস্তৃত অঞ্চল গৌরবময় অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেন। ডঃ হক কিছু প্রাচীন কলমী পুঁথিও সংগ্রহ করেন। তাঁর পাকিস্তানোত্তর কালের উল্লেখযোগ্য রচনা 'বঙ্গ ইসলাম' এবং 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য'। শেখোক্ত পুস্তকটি মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক মৌলিক ইতিহাস।

আবুল ফজল

জন্ম-১ জুলাই, ১৯০৩, কাজির পাড়া, কেউচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রামে বহু গ্রন্থ রচয়িতা আবুল ফজলের বইগুলোর নাম---মাটির পৃথিবী, আয়েশা, চৌচির, সাহসিকা,

জীবন-পথের যাত্রী, রান্ধা প্রভাত, কায়দে আজম, একটি সকাল, আলোকলতা, প্রগতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবন, রেখাচিত্র, শ্রেষ্ঠগল্প প্রভৃতি। আবুল ফজলের সাহিত্য চর্চা দীর্ঘদিনের। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনা, এমনি কি ধর্মগ্রন্থের তর্জমায়ও তিনি ছিলেন নিরলস। শিল্প ও সাহিত্যজ্ঞানের দিক দিয়ে তার নিরলস লেখনী চালনার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি প্রেসিডেন্ট পুরস্কার ও বাংলা একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ

জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২২, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১০ অক্টোবর, ১৯৭১। এই প্রতিভাবান লেখক ছোটো গল্প রচনা করে প্রাক-পাকিস্তান আমলে প্রচুর সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'নয়ন তারা' দুই তীর, গল্প সমগ্র তীর বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর উপন্যাস 'লাল সাণু' 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাদো নদী কাদো'।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ 'বহির্দীর্ঘ' নামক একটি নাটকও লিখেছেন।

বুলবুল চৌধুরী (১৯১৯-১৯৫০)

নৃত্য-শিল্পী বুলবুল চৌধুরীর জন্ম চট্টগ্রামের 'সাতকানিয়া থানায়। কথা শিল্পী হিসাবেও তাঁর মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিলো। ব্রিটিশ আমলে 'মাসিক পরিচয়ে' প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি গল্প পাঠক মহলে প্রচুর ঔসুক্য জাগিয়েছিলো। পাকিস্তানী আমলে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'প্রাচী' তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

ওহীদুল আলম

জন্ম ১ জানুয়ারী, ১৯১১, ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম। মাহবুব-উল আলমের ভাই ওহীদুল আলম প্রধানতঃ কবি এবং গৌণতঃ গল্পী। তাঁর উপন্যাস শামীমা, সোনাগাজী, জীবনী----- আমাদের নেতা, স্মৃতিকথা----- পৃথিবীর পথিক, ইতিহাস-চট্টগ্রামের ইতিহাস, চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য। তাঁর প্রকাশিত গল্প সংকলনের নাম 'জোহরার প্রতীক্ষা'। তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে।

আবুল কাসেম

পাকিস্তানী আমলের লেখক-----জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়া থানার ছেবন্দী বরমা গ্রামে ১৯২০ সনে। তিনি মূলতঃ প্রবন্ধকার। ভাষা আন্দোলনের জনক ইসলামের মৌলিক নীতিগুলোর ভিত্তিতে একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী। এই উদ্দেশ্যে, তিনি যেসব গুণ্ডিত লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে 'একমাত্র পথ', (অধ্যাপক শাহেদ আলীর সংগে যুগ্মভাবে রচিত), 'শ্রেণী সংগ্রাম ও মার্ক্সবাদ,' একুশ দফার রূপায়ন' ইসলাম কি

দিয়েছিলো ও কি দিতে পারে', 'আধুনিক চিন্তা', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাঙলা ভাষায় স্কুল-কলেজের উপযোগী বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় তিনি পথিকৃত।

ফেরদৌস খান

জন্মঃ ১ ডিসেম্বর, ১৯২২, চট্টগ্রাম। পাকিস্তানোত্তর কালের লেখক। শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনার ক্ষেত্রে লেখক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বাঙলা হরফের হেরফের' এবং 'শিশু মনের পরিপুষ্টি' নামক তাঁর দুটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে এগুলোতে তাঁর যুক্তিবাহী মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'সর্বোত্তম কাহিনী' আমপারার অনুবাদ ছড়ার ফুলঝুরি, তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আবদুর রহমান

স্কুলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ইন্স্পেক্টর আবদুর রহমান আলকোরআনের নির্বাচিত কতকগুলো আয়াতের প্রাঞ্জল তর্জমা এবং এসব আয়াতে বিবৃত ইসলামের চিরন্তন নীতিগুলির বিশদব্যাখ্যা 'কোরআন ও জীবন দর্শন' নামে ২ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এদেশে এ উদ্যম অভিনব। লেখক বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত দৃষ্টি ভঙ্গীতে, আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত আয়াতগুলির উপর আলোকপাত করে সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। তিনি যে আত্ম-জীবনী লিখেছেন তা ও বহু প্রশংসিত।

আহমদ শরীফ

জন্ম-১৯২১, সুচক্রদঙ্গী চট্টগ্রাম। পাকিস্তানোত্তর কালের লেখক। প্রাচীন মুসলিম পুঁথি পুস্তকের আলোচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর চাচা মরহুম মুন্সী আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদেরই উত্তরাধিকারী। তাঁর সম্পাদনায় ইতিমধ্যেই 'মধু মালতী', 'ইউসুফ জ্বোলেখা', 'মুসলিম পদকর্তা', 'তোহফা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ---- বিচিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা, জীবনে সমাজে সাহিত্য, যুগমন্ত্রনা, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রত্যয় প্রত্য্যাশা প্রভৃতি।

আব্দুল হক চৌধুরী ----- চট্টগ্রাম জেলার নোয়াখিঙ্গি পুর গামে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম ১৩২৮ বাংলা, তারিখ ৭ ভাদ্র। আব্দুল হক চৌধুরী প্রকাশিত গ্রন্থ--চট্টগ্রামের ইতিহাস, চট্টগ্রামের চরিতাভিধান, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি, সিলেটের ইতিহাস প্রসংগ।

সফিনাজ নুরন্ নাহার : জন্ম ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩১, চট্টগ্রাম। কাব্য-----আমার ভালোবাসার ফুল; গল্প--সোনালী দিগন্তের ইশারা; শিশু সাহিত্য সন্দীপার চার বছর শ্রুতিকথা----এলেম আপন দেশে।

সূচরিত চৌধুরী- জন্ম ২১ জানুয়ারী, ১৯৩০ কদুরবীল, চট্টগ্রাম, ছোট গল্প- আকাশে উড়ে ঘুড়ি, একদিন একরাত, শেঠ গল্প- অনুবাদ-নানা

ছোট গল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার

সুলতানা রহমান- ১৯২৪, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম,

গ্রন্থ বুলবুল চৌধুরী, বুলবুল চৌধুরীর পুণ্যজীন, শিশু সাহিত্য কাকের ছা বকের ছা, আমাদের মহানবী।

এন, এম, হাবীব উল্লাহ্ : জন্ম ১৯৭৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের পোন্ধালাী গ্রামে। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত "রোহিঙ্গা জাতীয় ইতিহাস", "অসীমে পাড়ি" জনাব এন, এম, হাবীব উল্লাহর দু'টি উল্লেখযোগ্য বই।

হাল আমলের আরো কতিপয় লেখক-লেখিকা

উপরে আলোচিত লেখকগণ ছাড়াও চট্টগ্রামে আরো বহু লেখক-লেখিকা রয়েছেন। কামালুদ্দীন খান প্রবন্ধ রচনা ও সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পরেই 'প্রেমের দেশে' নামে একখানা ভাবাবেগপূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন আলুদ্দীন আলীনূর। তিনি কবিতাও রচনা করেছেন। আহমদ ফরিদ একদা বহু বুদ্ধি-প্রধান উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ রচনা করে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ, এ, রেজাউল করীম চৌধুরী বহু সার্থক গীতি-কবিতা রচনা করেছেন। মাহফুজুল হক, গল্পকার শহীদুল্লাহ সাবের, চৌধুরী জহরুল হক, মোহাম্মদ হোসেন খান, চট্টগ্রামের কয়েকজন আধুনিকতম লেখক। মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে আইনুন নাহার, নূরুন নাহার জহর, মমতাজ বেগম, জুলেখা খাতুন, চেমন আরা, শিরীন জহর, উমরাতুল ফজল ও আলিয়া চৌধুরীর নাম উল্লেখ যোগ্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য

মুখে মুখে প্রচলিত অলিখিত সাহিত্য বা লোক সাহিত্যে চট্টগ্রামের ভাষা, নিসর্গ ও মানব প্রকৃতির যে নিগূঢ় পরিচয় মেলে তেমন আর কিছুতেই নয়। চট্টগ্রামের লোক-সাহিত্যকে পালাগান বা কাহিনীগান, শ্রেম, আটিয়ালী, জারি, বারোমাসী, মর্সিয়া, হাঁদ পেটা, হাইল্যা, পুঁথিলালী, উৎসব-পার্বনমূলক, খেলাধুলামূলক ও দরবারীগান, গাজীর গান—ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

চট্টগ্রামের পালাগানগুলির বেশির ভাগই সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই পালাগুলির অধিকাংশই শ্রেমমূলক হলেও ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলির মতো এগুলি কোমল এবং নারী প্রধান নয়। মুখ্যতঃ এগুলি পুরুষ প্রধান এবং সংঘাত-সংগ্রাম বহুল। একদিকে দুর্দান্ত দস্যু হার্মাদের দল, অন্যদিকে খামখেয়ালী সমুদ্রের ধ্বংসলীলা—এ দু'য়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পালাগানগুলির অধিকাংশ নায়ক তাদের অতীতকে পেতে চেয়েছে। চট্টগ্রামের উপকূলভাগ উনুত্ত বলেই শুধু সামুদ্রিক উদ্ভাসের দ্বারা চট্টগ্রাম বারংবার আহত হয়নি, বৈদেশিক জল দস্যুদেরও বারংবার চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চলে বয়ে এনেছে। চট্টগ্রামকে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। আরণ্যক ও নাবিকরক্তের উত্তরাধিকারও চট্টগ্রামের লোক-চরিত্রের বীরত্ব ও পৌরুষের অন্যতম কারণ। এ অঞ্চলের পালাগানগুলির নায়কদের মধ্যে যে সাহস ও বেপরোয়া মনোভাব দেখা যায় তা সমুদয় বাঙলা সাহিত্যেই বিরল।

জীবনের এমন কোনো দিক নেই চট্টগ্রামী পন্থীগীতির কোনো না কোনোটিতে দ্বার প্রকাশ ঘটেনি। এদিক দিয়ে এই পন্থী বা লোকগীতিকাগুলি চট্টগ্রামের গণজীবনের সার্থক পরিচয়বহু।

পালাগান পরিচয়

ভেলুয়া

চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ভেলুয়ার গান এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো। এই গানের অনেকগুলি মুদ্রিত সংকরণও আছে। পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত পালাগানটি আন্ততঃ

চৌধুরী চট্টগ্রামের কয়েকজন পালাগান গায়কের নিকট হতে সংগ্রহ করেন। এঁদের মধ্যে রাউজানের বাগোয়ান গ্রামের জেবল হোসেন, লাহুর হাটের ইসমাইল এবং রাংগনিয়া থানার পোমরা গ্রামের ওমর বৈদ্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ ওমর বৈদ্যের নিকট থেকেই তিনি সমগ্র পালাটি উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

ভেলুয়ার পালার পটভূমিকা

এই গানটিতে উল্লেখিত শাকলাপুর আর মহিমখালী ধীপের অন্তর্গত শাকলাপুর অভিন্ন। এককালে, বিশেষ করে পর্তুগীজ দৌরাজ্যের সময়ে, শাকলাপুর একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিলো। ভেলুয়ার পিরালায় তৈলন্যাপুর হচ্ছে, আনোয়ারা থানায় শংখনদীর তীরস্থ সমুদ্রোপকূলবর্তী তৈলারধীপ। ভোলা সদাগরের বাড়ী ছিলো কাটলী গ্রাম—এখানে পাহাড়তলী স্টেশনের নিকটেই ভেলুয়ার দীঘি বর্তমান। 'খুলসী'র ঢালার পশ্চিমেই কাটলী। খুলসীতেই সম্প্রতি চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সারোঙ্গ বাদক টোনাবারুই-এর বাড়ী রানুনিয়া থানার সৈয়দ নগরে। সেখানে টোনা বারুই-এর ভিটা আজো বিদ্যমান। ডবলমুনিং থানার অন্তর্গত সরইপাড়া নামক স্থানে কাব্য বর্ণিত মুনাপ কাজির কাছারী ছিলো। চতুস্পার্শ্ববর্তী এলাকা আজো কাজিরপাড়া নামে খ্যাত। এখানে মুনা কাজির নামে দীঘি আছে।

কুড়াল্যামুড়া নামক পাহাড়টি চট্টগ্রাম হতে বিশ মাইল দূরে কর্ণকুলী নদীর নিকটে অবস্থিত; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে স্থানটি মনোরম। কুড়াল্যামুড়ার কিছু উত্তর-পূর্বে ভয়াবহ কাউখালীর পাক বা ঘূর্ণি; আমির সদাগর এই ঘূর্ণিতেই ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। কাব্য বর্ণিত শ্রীমাই, শংখ, কাইচা প্রভৃতি নদী চট্টগ্রামে সুপরিচিত।

কাহিনী

শাকলা বন্দরের মানিক সদাগরের একমাত্র পুত্র আমির সদাগর শিকারে বেরিয়ে তেলন্যানগরের ভেলুয়া সুন্দরীর প্রিয় কবুতরীকে তীর বিদ্ধ করে। তীর-বিদ্ধ কবুতরী ভেলুয়ার কোলে এসে পড়লে ভেলুয়া হায় হায় করে ওঠে, এবং তার সাত ভাই, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমির সদাগরকে বেঁধে নিয়ে আসে। পথে জানা গেলো, আমীর সদাগর ভেলুয়ারই খালাতো ভাই এবং তারই সংগে ভেলুয়ার বিয়ে দিতে ভেলুয়ার মা

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এরপর তাদের বিয়ে হয়ে গেলো, এরপর আমীর ত্রীকে নিয়ে ঘরে ফিরলো।

কিছুদিন পর আমীর সদাগর বাগিছায় বেরোলো। কিন্তু পথ ভুলে রাস্তাে আবার নিজের ঘাটেই ফিরে এলো। ফিরে এসে সে ভেলুয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলো, এবং ভেলুয়ার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে, তাকে ঘুমে রেখে, দরজা বন্ধ না করেই আবার তার বাগিছায় নৌকায় গিয়ে চড়লো। এরই সুযোগ নিয়ে আমীর সদাগরের বোন ভেলুয়ার উপর সতীত্বহীনতার অপবাদ দিলো। আর ভেলুয়ার উপর শুরু হলো মা-এ-ঝি-এ মিলে অকথ্য নির্বাসন। একদিন ভেলুয়া কাঁখে কলস নিয়ে ঘাটে পানি আনতে গেলে ভোলা সদাগর তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার জন্য সাধাসাধি শুরু করে; ভেলুয়াকে সে বলে যে, আমীর সদাগর মারা গেছে। ভেলুয়া নিরুপায় হয়ে ইচ্ছত পালনের জন্য তার কাছে ছ'মাসের সময় নেয়।

এদিকে বাগিছায় করে দেশে ফিরে আমীর সদাগর সব কিছু বুঝতে পেরে বিরাগী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং চট্টগ্রামের বহু দুর্গম এলাকা সফর করে, রাঙ্গুনিয়া থানার সৈয়দ নগরে পৌছে, টোনাইবারুইএর নিকট সারেসঙ্গ বাজ্ঞাতে শেখে ও সেখান থেকে কাটপী পৌছে ভেলুয়ার দেখা পায়। ভেলুয়া তার সংগে পালিয়ে যেতে বললে— আমির সদাগর বললো—সে বীর পুত্র, ভেলুয়াকে চুরি করে নিয়ে সে পালাতে পারে না। সে মুনাপ কাজির কাছে বিচার দিলো। কিন্তু বুড়ো কাজি নিজেই ভেলুয়ার উপর আশক হয়ে উঠলো। ভেলুয়াকে নিজের ঘরে রেখে দিয়ে সে আমির সদাগরকে তাড়িয়ে দিলে, আমির দেশে ফিরে বহু লোক-লক্ষর নিয়ে ভেলুয়া উদ্ধারে বেরোলো। এদিকে, ভীত মুনাপ কাজি, কাটপী গিয়ে ভোলাকে বললো— ‘এ নারী তোমার মতো যুবককেই মানায়’। তারপর সে বললো আসল কথা—আমির সদাগর তাকে উদ্ধার করতে আসছে। ভোলাও সাজলো তার লোক লক্ষর নিয়ে। দু’দলে লড়াই হলো। ভোলাকে হত্যা করা হলো, কাজি বেহঁশ হলো, ভোলার বাড়ী ঘর ধ্বংস করে সেখানে দীঘি দেয়া হলো তারি নাম ভেলুয়ার দীঘি।

অস্থি-চর্মসার ভেলুয়াকে কাজির ঘর থেকে উদ্ধার করে নৌকায় করে আমির সদাগর নিয়ে চললো দেশে, শাক্লা বন্দরে। নৌকা শাক্লা বন্দরে এসে ভিড়লো— দেশের লোক সব জমায়েত হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন করবার জন্য—কিন্তু হায় !

“বন্দরের লোক জন দেখে খাড়া হই
‘ঘাটে আইল চৈন্দ ভিত্তা মরা কন্যা লই।’”

চরিত্র সৃষ্টি

এই পালা গানটিতে একটা বৈশিষ্ট লক্ষিত হয়। ময়মনসিংহ গীতিকার পালা গানগুলিতে নারী-চরিত্রগুলিরই প্রাধান্য; পুরুষ চরিত্রগুলি যেন গৌণ এবং অনেকখানি নিশ্চুড়। কিন্তু 'ভেলুয়ার পালা'গানে নায়ক আমির সদাগরের চরিত্রের পৌরুষ দীর্ঘ মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। ভেলুয়ার চরিত্রটিও মাধুর্যমণ্ডিত।

কালিদাসের মেঘদূত ভারতের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে অলকায় পৌঁছেছিলো—আমির সদাগর শাকলা বন্দর থেকে, পায়ে হেঁটে চট্টগ্রামের বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ছুরতে ছুরতে অবশেষে খুলসীর ঢালা অতিক্রম করে কাটলী নগরে পৌঁছেছিলো।

ভেলুয়ার কাহিনী উপকথা নয়, এর ভিত্তি ইতিহাসের উপর। 'তারিখই হামিদী' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা হামিদুল্লাহ খান, হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের সময়ে ষোড়শ শতকে, এই ঘটনা ঘটে বলে বর্ণনা করেছেন। আমিরের পত্নী ভেলুয়াকে ভোলা সদাগর চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো; ইতিহাস পুস্তকে, ভোলাকে 'চোর সদাগর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চোর সওদাগরের সাথে আমিরের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ 'তারিখই হামিদী'তে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই পালাটি এককালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান মেয়েরা 'বিবাহ বাসরে' গাইত। এসব গান চট্টগ্রামে 'হাঅলা' নামে পরিচিত।

হাতী খেদা

পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আসামের অরণ্য সমূহ হাতীর প্রধান আবাস স্থল। এ এলাকার লোকেরাই জগতে প্রথম হাতী ধরার কৌশল উদ্ভাবন করে। এই পদ্ধতিকে খেদা বলা হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর ও ব্রহ্মদেশের পাহাড় সমূহ পরস্পর সংলগ্ন এক বিরাট এলাকা। এই অরণ্য সংকুল বিশাল এলাকায় হাতী, মহিষ, গভার, ব্যাছ, গয়াল প্রভৃতি ভীষণ প্রকৃতির জন্তুরা বিচরণ করে। পূর্ববঙ্গ গীতিকায়, 'হাতী খেদা' নামক যে পালাটি গৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায়, এইসব পাহাড়ের গুহায় বিপুলকায় অজগর এবং চন্দ্রবাড়া সাপ চলাকেরা করে; সাপগুলি এমনি ভীষণাকৃতি ও বৃহৎ যে এদের মুখের সন্ধান পেলে লেজের সন্ধান করতে হয় অনেক দূরে। দলবদ্ধ হাতীর ডাকে ভীত হয়ে এসব সর্পও গুহার গহীনে গিয়ে আত্মগোপন করে।

চট্টগ্রামের নয়াদাড়া নিবাসী মকবুল আহমদ ‘হাতী খেদা’ নামে ছোট্ট একটা পালা গান রচনা করেছিলেন। অছি মিঞা নামক এক বিখ্যাত শিকারীর হাতী ধরার কাহিনী এ পালা গানে বর্ণিত হয়েছে। গানটি চট্টগ্রাম স্বরস্বতী প্রেস হতে মুদ্রিত হয়েছিলো। এই খেদা নির্মাণের ব্যয় বহন করেন চট্টগ্রামের চকবাজার নিবাসী জমিদার নবকৃষ্ণ রায়। অছি মিঞার সহকর্মী ছিলেন মফিজুল্লাহ চৌধুরী, আর পথ প্রদর্শক ছিলেন শিকদার মেহের আলী ও খুশি নামক জৈনক মগ। এই খেদায় ৪৫টি হাতী ধরা পড়ে। মকবুল আহমদ এই চাক্ষুণ্যকর ঘটনার বর্ণনা করেছেন জোরালো ভাষায়।

মকবুল আহমদ রচিত ‘খেদার’ ঘটনাটি খুবই সাম্প্রতিক ব্যাপার। ময়মনসিংহের জমিদার মহারাজা সূর্যকান্ত হাতীগুলো ৪০ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করে নিয়েছিলেন।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত ‘হাতী খেদা’ নামক পালা গানটি আরো প্রাচীন। অছি মিঞার পিতা ‘গোল বদনের শিকার’ কাহিনী এই পালার বিষয়বস্তু। গ্রাম্য ভাষায় রচিত এই পালা গানটিতে প্রাকৃতের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তেজনামূলক শিকার কাহিনীটি বর্ণনা করতে গিয়ে কবি রচনার মধ্যে যে গতি ও নাটকীয়তা সঞ্চার করেছেন, তা চমৎকার। ইহা এতো স্বাভাবিক যে, আমরা যেন এই ছন্দের তালে তালে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে হস্তীর পদক্ষেপ, ঝরণায় জল পান, শিকারীদের বিকট চীৎকার ও অশ্রুর ঝন ঝন শব্দ শুনে পাই। এই পালা গানের রস জীবন্ত এবং চিত্তাকর্ষক। যেমন খেদায় বন্দী হাতীর বর্ণনা :

‘সপ্ সপা সপ্ গুম্ গুমা গুম্ হাতীর আবাজ
দুনিয়াতে রোজ কেয়ামত হবে বুঝি আজ!
হাতী যদি ভাঙে খেদা পরান লৈয়া টান,
স্থানে স্থানে মুসলমানে ফুকারে আজান।
হিন্দুবলে ‘জয়কালী’, মধে বলে ‘ফরা’
এইবার প্রভু নিরঞ্জন সঙ্কটেতে তরা।
এমি কালে কী হইল গুন বিবরণ
হাবুই ছাড়ে, গোলা ফুডায় যত চৈকালগণ।
উজাল জ্বালিয়া তারা রাইতরে করে দিন
কাংসাভংগে বাড়ি মারে বাজায় মোঘর শিং
ধুনির আন্তন তখন ছুইল আছমান
বাহিরের জংলা খাইল লৈয়া নিজের জান।”

কমল সদাগর

এই পালাটিও আন্ততঃ চৌধুরী কর্তৃক চট্টগ্রামের নবুচ্চন ধুপি এবং আরো কয়েকজন মাঝি গায়কের নিকট থেকে সংগৃহীত। আন্ত বাবু মনে করেন, এই কাহিনীর কোনো না কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। কিন্তু দীনেশ বাবু এমত মানেন না। তাঁর মতে, রূপকথা সাহিত্যের একটা প্রধান অংশ জুড়ে আছে বিমাতার চক্রান্তে শিশুদের দুর্দশার কাহিনী। এ কাহিনী তাঁরই অন্যতম। তিনি মনে করেন ইহা 'নীত বসন্ত' নামক পালা গানটির রূপান্তর।

পালাটির ঘটনা তেমন কবিত্বগুণ সম্পন্ন নয়। তবে প্রথম কয়েক পরিচ্ছদের পরই কাহিনী দানা বেঁধে উঠেছে এবং নাট্যাঙ্গণ সমন্বিত হয়ে উঠেছে। সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের প্রসংগ থাকলেও কবির রচনা অশ্লীলতা মুক্ত। পল্লীর খুঁটি-নাটি বর্ণনায়, নৈসর্গিক চিত্র অঙ্কনে কবি সিদ্ধহস্ত।

মহমুলা দাসীর চরিত্র কবির সৃষ্টি ক্ষমতার সাক্ষ্য। কমল সদাগরের দ্বিতীয় বিবাহের পত্নী সোনাইয়ের প্রতি গোবর্ধনের প্রেম সমাজের দৃষ্টিতে আপত্তিকর হলেও কবি অত্যন্ত নিপুণতার সংগে তার ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। সোনাই নবযৌবনা; সে ভাবে "সদাগর শুকা কাঠ, মাদার লাকড়ি, রসের আনটনে আমি শুকাইয়া মরি।" কমল সদাগরের বিশ্বস্ত ও সচ্চরিত্র কর্মচারী গোবর্ধন। প্রথমে সে খুবই ভালো লোক ছিল, কিন্তু—

“তেতুল লাড়িলে কেহ মুখর কাছে আনি
কেমনে সহরি হায়রে রাখে জিক্বার পানি,
গোবর্ধন ডুলি গেল সে নিমকের গুণ
ভিতরে গুজরি তার উঠিল আশুন।”

দুচ্চরিত্রা নারীর কুহকে পড়ে মনুষ্যত্বের কী বিপর্যয় ঘটে তারই প্রমাণ, গোবর্ধনের শেষ পরিণতি। সোনাই-এর পাল্লায় পড়ে তার এমনই অধঃপতন হয় যে, সে তার প্রভুর দুই শিশু পুত্র, চানমনি ও সূর্যমনিকে হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলো। সদাগর পত্নী সোনাই-এর ইন্দ্রিয় লালাসা বর্ষার নদী প্রবাহের মতোই দুর্দাম, কিন্তু গোবর্ধন এগিয়েছে জীত সংকিত পদে; প্রতি পদেই তার ভয়, আর আশংকা; হয়তো বিবেকের কষাঘাতও। কিন্তু ধীরে হলেও, যে ব্যক্তি এ পথে একবার যাত্রা করেছে তার আর কেয়ার উপায় নেই, চরম অধঃপতনেই ঘটে তার শেষ পরিণতি।

কাকন চোরা

১। 'কাকন' চোরা কাহিনীটির সংগ্রাহক আন্তোয চৌধুরী। পটায়ার হাইদগাঁও নিবাসী সেকান্দর গাইন, বোয়ালখালি থানার ধোরলা নিবাসী অলিয়র রহমান ও কোতোয়ালী থানার চরচাকতাই নিবাসী ওজু পাগলার নিকট থেকে তিনি পালাটি সংগ্রহ করেন।

২। চট্টগ্রামে যখন পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভীষণ উৎপাত সেই যুগে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে, চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর অন্যতম শাখা, কুমাই নদীর তীরে, গজালি গ্রামে নায়ক দস্যু মনসুরের জন্ম হয় বলে দীনেশ বাবুর অনুমান।

নিম্ন উপত্যকাবাসিনী চেন্টয়া পরীকে লুধা গাজী নামক এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি বলপূর্বক হরণ করে। তারই ঔরবে দস্যু মনসুরের জন্ম। সে আজিমের স্ত্রী আয়রা বিবির আশেক হয়েছিল—সে মারা গেলে তার কবর খুঁড়তে গিয়ে সে গৈবী চপেটাঘাত খেয়ে বেহঁশ হয়ে পড়ে। বেহঁশ অবস্থায় সে স্বপ্নে দেখে আয়রা বিবি তাকে আর ডাকাতি করতে নিষেধ করছে এবং নিয়মিত নামাজ পড়তে নির্দেশ দিচ্ছে। নামাজ পড়তে গিয়ে এই পালায় নায়ক মনসুরের পরিবর্তন হয়। নিজাম ডাকাইত, কেনারাম এবং সনসুর এই তিন পালায় মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তিনজনই দস্যু বৃত্তি ত্যাগ করে সাধু হয়েছিলো। নিজাম ডাকাইতের পালাও চট্টগ্রামের সম্পদ।

“মনসুর ডাকাইত যে আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল স্বপ্নদত্ত সেই আদেশ এই—সে ডাকাতি বা চুরি করা যদি না ছাড়িতে পারে তাহা হইলে সে সেই ব্যবসা চালাইতে পারিবে কিছু প্রতিদিন তাহাকে অস্ত্রত পাঁচবার নামাজ পড়িতেই হইবে। এই আদেশ সে কতকদিন পর্যন্ত পালন করিয়া আসিয়াছিল। একদিন সে এক বড় ধনীর বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছে। সিঁদ কাটিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। পার্শ্বের লোহার সিন্দুক সে লৌহযন্ত্রের সাহায্যে খুলিয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখে তোড়া তোড়া টাকা, বিচিত্র অলংকার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি। তাহার অতি নিকটে গৃহস্বামী ও তদীয় স্ত্রী নিদ্রিত। দলের লোকেরা গৃহের চারিদিকে প্রতীক্ষা করিতেছে। মুহূর্ত মধ্যে এই বিপুল অর্থ তাহার অধিগত হইবে এমন সময়ে অদূরে বৃষ্ হইতে কুড়া পাখী ডাকিয়া জানাইল, ভোর হওয়ার আর বিলম্ব নাই। জানালা পথে সে দেখিল, পূর্বাকাশে সিন্দুকের রাগ পড়িয়াছে। হঠাৎ গ্রাম্য মসজিদ হইতে মোস্তাদদের সমবেত কণ্ঠের “আল্লাহো আকবর” ধ্বনি শ্রুত হইল। মনসুর তখন সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত; ধন রত্নের কথা

তাহার স্বরণ নাই। আসন্ন বিপদকে সে যে আরও ডাকিয়া আনিতেছে সে তাহা ভুলিয়া গেল। হঠাৎ তাহার দুর্লক্ষ্য প্রতিশ্রুতি তাহারে অধিকার করিয়া বসিল। চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল ‘সাইলাহা ইল্লাল্লাহ’। সেইদিন সেই দস্যু পীর হইলেন, মনসুর ফকির হয়ে গেলো” এরপর :

“কাকন চোরার কেহ আর না পাইল খবর
মাঝে মাঝে জংগল হইতে আসে এক পীর।
কদমে কদমে জবে আল্লাহর জিকির
মাঝে মাঝে দেখা যায় ময়দানের উপরে
আয়রার কবর পীর জিয়ারত করে।”

শ্রেমের যাদুকরী প্রভাবে চরিত্রের বিবর্তন দেখানো এ কাব্যের লক্ষ্য। মনসুরের চরিত্রের ক্রমপরিণতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে।

এ পালাগানটির ভাষা অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিবেশ বর্ণনায় কবির সাফল্য অনস্বীকার্য :

‘দোলা যায় যায়েরে দোলা অষ্ট বেয়ার কাঁধে
দোলার ভিতর নয়া বউএ গুঁড়ি গুঁড়ি কাঁদে
মা বাণের মনেতে পড়েবরে আরও ছোট ভাইএর মুখ
ঝি ঝি পোগর ডাক শুনি কাঁপি উডের বুক।
আগে পাছে বৈরাতি যায়, যায়েরে ধীরে ধীরে
দক্ষিণা হাওয়া পাইয়া দোলার কাপড় উড়ে।

লুখার গুরম ও চেঁউয়া পরীর গর্ভজাত দুর্ধর্ষ মনসুর কীভাবে বেড়ে উঠেছে, পত্নী কবি তা নিম্নলিখিত ভাষায় বয়ান করেছেন :

“দিনে দিনে বাড়ে ছাওয়াল বাঘের বাকার মতো
পূগের জঙ্গলের মাঝে ঘুরে অবিরত।”

লুটপাট এবং দস্যু-বৃষ্টি মনসুরের জীবনের একমাত্র অবলম্বন :

“মানুষ মারিতে বেটার দিলে দুঃখ নাই
খুশি হয় খন-দৌলত সঙ্গীরে বিলায়।”

মনসুরের রূঢ় বর্বর প্রকৃতির অন্তরালে যে একটি মহৎ মানুষের সম্ভাবনা রয়েছে, তা এখানে, অতি চমৎকার করে কবি প্রকাশ করেছেন। অথচ :

‘দাফনের সম্বাদ যখন পায়রে মনসুর চোরা
রাইত নিশিতে গুরু করে মরার কয়বর খোড়া
আধেরের সম্বল চুরি করি নিশি রাইত
দোজকের রাস্তা কাড়ি লৈয়াছে ডাকাইত।’

নসর মালুম

শ্রেম ও সতীত্বমূলক এই পালাগানটির সংগ্রাহক হচ্ছেন আন্ততঃ্য চৌধুরী। তিনি এই কাহিনীর বেশীর ভাগ চট্টগ্রামের কাঠাল ভাংগার নূর হোসেন ভাইয়ের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। নূর হোসেনের পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে পালাগানের গায়ের। তাঁর পিতা কুরবান আলী ও দাদা হায়দর আলী এই পালা গায়কদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই পালাটির অংশ বিশেষ তিনি কাঠালভাংগার নিকটবর্তী মহিষমায়া গ্রামের গুরু মিঞা নামক গায়কের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। সম্পূর্ণ পালাটি তিনি প্রাণ হন কর্ণফুলীর মোহনার নিকট রহমান নামক সাঙ্গানের একজন মাঝির নিকট।

কাহিনীটি সম্ভবতঃ ১৭শ শতকের শেষ দিকের রচনা বলে দীনেশ বাবু অনুমান করেন।

‘মাঝির গায়ের দরিদ্র হায়দর আলীর একমাত্র সম্ভান আমিনা আর পিতা-মাতাহীন ভাগ্নে নহর এক সংগে খেলাধুলা করে, বড়ো হয়—“কৈতর কৈতরার মতো তারা দোন জন।” দু’জনেই দু’জনের উপর আশিক হয়ে ওঠে। “পুত নাই, ক্ষেত নাই বিয়ের উয়র আশা।” তাই হায়দর আলী ও আমিনার মা ভাগ্নের কাছে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু “কাউয়ার বাসাং কোকিলার ছা পোষ মানলো না।” একদিন নহর গায়ের হয়ে গেলো। হয় বছর আর তার কোনো ষোঁজ খবর নেই।

গায়েরই “মস্ত ভোয়াঙ্গর” এছাক মিঞার বাড়ী; তার বিবি ‘সেমাঙ্গান সুরতে’ ‘পুনুমাঙ্গীর চান’কেও হার মানায়। খালি বাড়ীতে এছাক আমিনার সাথে দেখা করে ‘পানের বিড়া আর অলা নারিকেল তেল নিয়ে। কিন্তু আমিনা তার সাথে কথা বলে না :

‘পানির সঙ্গে তেল মিশে না, চিনির সাথে নুন
এছাকের সঙ্গে তেমনি আমিনা খাফুনঃ’

অগত্যা একদিন এছাক মিঞা হায়দরের কাছে আমিনাকে শাদি করার প্রস্তাব দেয়।

আর বলে—

“আষ্ট কানি জমি দিব শংক নদীর কূলে
ভরি ভরি সোনা দিব কান হাতে চূলে।”

আর—

“তোমরারে পালিবাম সারা জীবন ভরি।”

দরিদ্র দম্পতি প্রলুব্ধ হয়ে কন্যা আমিনার মত জিগুগেস করে— কিন্তু আমিনা রাজি হলো না, সে দুঃখে দানাপানি ছেড়ে দিলো। বুধা শুণীণের সাহায্যে এছাক আমিনার মন জয় করতে চাইলো, দারু টোনায় বুধা গুস্তাদ। বুধার তেল পড়া মুখে মেখে এছাক একদিন হায়দরের বাড়ী গিয়ে হাজির; -‘শৈশীর’ বাড়ী যাবে বলে আমিনার মা ও বাপ আগেই আমিনাকে ঘরে একলা রেখে বেরিয়ে গেছে। এছাককে দেখে আমিনা খাতুন কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

এদিকে নছর ‘কুম’ নামক জাহাজের লকর হলো— কার্য-দক্ষতার গুণে, সে ‘মালুম’ পদে উন্নীত হয়ে বহু ধন-দৌলত উপার্জন করে। একবার বাণিজ্য উপলক্ষে ‘অঙ্গী’ নামক শহরে গিয়ে ‘মাকো পোয়াজা’র পরমা সুন্দরী কন্যা এখিনের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। ‘অঙ্গীতে মেয়েরা অবাধে চলাফেরা ও প্রেম করে বেড়ায়। এখিনকে বিয়ে করে নছর আমিনার কথা একদম ভুলে গেলো।

আমিনার দুঃখের সীমা নেই। কারণ—

“খোদায় ছরুত দিয়ে ছরুত হৈয়ে বৈরি।” তবু

“নারীর দৌলত সন্তীপনা রাইখতে যদি চায়

এমন পুরুষ কেহ নাই কাড়ি লৈয়া যায়।”

সে ইলসাখালির কূলে, আশি বছরের বুড়ো খেতিয়াল গফুরের বাড়ীতে পেলো আশ্রয়; ঘরে ‘গুজা’ বুড়ি আছে, সে চোখে দেখে না, গফুরের গরু-মোষ আর ধন-ধান্য অটেল, সে হলো তার ধর্মের বাপ।

দক্ষিণ সাগরে ‘চর পরীদিয়া’ নামক স্থানে শুটকি মাছের বিরাট কারবার; মাকো তার খবর পেয়ে, জামাতা নছর মালুমকে সেখানে সস্তায় শুটকি কিনতে পাঠায়। শুটকি বোকাই করে মাঝির গাও এসে গুনতে পায়—আমিনার মা-বাপ মরে গেছে, আর ‘বেশ্যামতি’ আমিনা—

‘তারারে কালাইয়া শেষে বজ্জাত সে মাইয়া
লোভং পড়ি কন দেশেতে গেইয়ে খাইয়া ।’

নহর আর দানাপানি মুখে দিলো না । জাহাজে চড়ে সে সমুদ্রে ভাসলো আর প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজ গিয়ে আটকা পড়লো ‘গোবর্ধার চরে’ । সেখানে হার্মাদের দল হামলা করলো তাদের উপর । সমস্ত মাল-মত্তা, বেসাত লুট করে ডাকাতেরা নহর মালুমসহ তার দলের সবাইকে বেঁধে নিয়ে চললো ।

এদিকে, গফুরের গুজ্জা বৃড়ি মরে গেছে । আমিনার কথা চিন্তা করে করে গফুরের ঘুম হয় না । সাত বছর হলো, নহরের খবর নেই, কাবিনের শর্ত মত তালাক হয়ে গেছে । এখন তার আবার বিয়ে করা উচিত, কারণ :

‘কয়বরে ডাকিছে মোরে শুন মোর মাও’ ।

কিছু আমিনা- কিছুতেই রাজি হলো না । সে বললো—

‘মা বাপরে ছাড়ি আইলাম ছাইড়লাম বাড়ী ঘর
শাদি দিতে চাইল বলি মা-বাপ হৈল পর ।’

কন্যার মন বুঝে গফুর আর কিছু বললো না, কিছুদিন পর, একদল মগ এসে গফুরের বাড়ীর এক পড়ো ভিট খুঁড়ে দশঘড়া সোনার মোহর পায়, এবং দুঘড়া গফুরকে দিয়ে যায় । বড়ো কিছুদিন পর সমস্ত সম্পত্তি আমিনাকে সঁপে দিয়ে মারা গেলো । এদিকে এছাক আমিনার মাকে হাত করে, তিনটি লোক দিয়ে আমিনাকে ধরে নিয়ে যায় । অঙ্গী নহরে মাকো পোয়াজ নহর মালুমের কিরতে বিলম্ব দেখে এখিনের আবার অন্যত্র বিয়ে দেয় । জানের সয়ে নহর অঙ্গী ছেড়ে পালিয়ে আসে । টাকা নেই, পয়সা নেই, পথের ভিখারী হয়ে নহর উত্তর মূলুকে ঘুরে ঘুরে ফিরে । একদিন সে বপু দেখলো—আমিনা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে :

‘সস্তিপনা রাইখ্যে কন্যা রাইখ্যে জাতি কুল ।’

যৌবন কলসী আঞ্জো তার ভরাট রয়েছে, ‘এই ফুল ঝরাও নহে, বাসিও নহে । আমিনাকে লুট করে নিয়ে নানাভাবে তার মন জয়ের জন্য চেষ্টা করেও যখন এছাক সফল হলো না, সে তাকে ঘর থেকে বের করে দিলো । কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ী এসে আমিনা ভাঙ্গা ঘরে বসে রইলো । সেখানে রাত্রির অন্ধকারে হানা দিলো এছাক :

‘হরিশীরে পাইয়ে বাঘ ধরিবে কামড়ি ।’

কিন্তু নহর মালুমের এক আঘাতেই সে খতম। এরপর নহর আর আমিনার মিলন হলো :

‘কথাবার্তা নাই তাহার চোগৎ বয় পানি।’

এই পালা গানটিতে আমিনা চরিত্রটি অভ্যন্ত নিপুণতার সাথে অংকিত হয়েছে। প্রেম ও সতীত্বের ভাঙ্গুর প্রতিমা এই আমিনা—নহর মালুমের চরিত্রটি এই নারী চরিত্রটির নিকট অনুচ্ছল।

এ গানটি আর একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাসের অনেক মাল-মশলা এতে পাওয়া যায়। পর্তুগীজ জলদস্যুও হার্মাদদের উপদ্রব এবং শায়েন্টা খান কর্তৃক মগ-বিতাড়নের ফলে দক্ষিণমুখী ‘মগ-ধাওনি’ ঐতিহাসিক সত্য। পালা গানটিতে ‘মগ-ধাওনি’র কথা আছে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শায়েন্টা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। দীনেশ বাবুর অনুমান—পালাটি ঐ সময়ের কিছু পরে রচিত হয়ে থাকবে। পালায় উল্লেখিত ‘দিয়াঙ্গের পাড়ি’ হচ্ছে আধুনিককালের দিয়াঙ্গের বন্দর, ‘গোবধ্যার চর’ কর্ণফুলীর মোহনার নিকটবর্তী একটি চর, এবং পরীদিয়া অথবা ‘শাহ-পরীদিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

নুরুন্নেহা ও কবরের কথা

৬৩২ পঙ্ক্তিতে সম্পূর্ণ এই পালাটি ১৯২৮ সনে আন্ততোষ চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত হয়। ‘বড় উঠান’ গ্রামের জমিদার আলী খাঁর নিকটে পালাটির সংবাদ পেয়ে আন্ততোষ তাঁর সাথে দেখা করেন, তাঁর কাছে তিনি পালা গায়ক, বুড়ো সাঙ্গান-মাঝি হায়বত আলীর খবর পান এবং পেশকার হাট নামক গ্রামে তাঁর সাথে দেখা করে তাঁর সাঙ্গান ভাড়া করে হায়বত আলীর সাথে এক ক্ষুদ্র নদীতে আট ঘন্টাকাল সাঙ্গানে কাটান। সাঙ্গান বাইতে বাইতে হায়বত আলী এই সুদীর্ঘ আটঘন্টা ধরে এই গান গেয়ে যান। হায়বত এতো সুকণ্ঠ ছিলেন যে এ এলাকার লোকেরা তাঁর গানকে ‘জীবনের একটি প্রধান আনন্দোৎসব’ বলে মনে করতো।

কোতোয়ালী থানার চর-চাকতাই গ্রাম নিবাসী হাসীম খাঁ, বোয়ালখালির ‘পূবদিয়া’ নিবাসী গুণা মিত্রা এবং রাউজানের নোয়াপাড়া গ্রামের পৈখান চন্দ্র দে নামক কৃষকের নিকট পালাটি সনে আন্ততোষ বাবু তা সম্পূর্ণ করেন।

কাহিনী

দেয়াঙ পাহাড়ের পিছনে নয়চর 'রঙ্গদিয়া'র আজগর খেতিয়ালের বাস। তার একমাত্র কন্যা নুরুন্নেহা পরমা সুন্দরী, তার উঠন্ত যৌবন। চৈতালি বায়ুতে পশ্চিম সাগর যখন ডাকতে শুরু করে তখন "আপন যৌবন কন্যা ফিরি ফিরি চায়।"

এদিকে দেওগাঁয় পরম ধার্মিক নজু মিঞা তার একমাত্র ছেলে মালেককে রেখে মারা গেছে। নজু মিঞা যতো দিন বেঁচে ছিলো ততোদিন আজগরের সাথে তার সম্ভাব ছিলো না মোটেই। তখন আজগরও বাস করতো দেওগাঁয়, নজু মিঞার সামনাসামনি বাড়ীতে। একবার বাণিজ্য করতে গিয়ে নজু মিঞা মারা যায়। মালেক এতিম হয়ে পড়ে; মা নেই, বাপ নেই, ঘরে এক বুড়ো দাদী আছে। আজগর ও তার বউ এতিম মালেকের প্রতি দয়র্ প্রিয় হয়ে ওঠে, মালেক আজগরের 'শাদা দিল' দখল করে বসলো। মালেকের দুঃখে নুরুন্নেহারও 'পরান পোড়ে'। নুরুন্নেহার মা তাকে আদর যত্ন করতে থাকে। এই সুযোগে নুরুন্নেহা ও মালেকের সম্পর্ক নিবড়তরো হয়ে ওঠে—তারা পরস্পরকে ভালোবেসে কেলে। নুরুন্নেহার

"যৌবন উঠে বসন কাড়ি, ওরে কলসী কাঁকে লই
চোগে চোগে চাহি নুর চলি যাইত গই।"

"রৈস্যা রোসিকা ভইন" নুরুন্নেহা মালেককে ঘুম থেকে তুলে লঙ এলাচি দিয়ে পানের গোলাপী ঝিলি খাওয়ায়। মালেক হুকা আর বেনা নিয়ে যায় মাঠে—যেখানে আজগর চাষ করে—

"আইলর পাড়ত বসিয়ারে তারা দোনজন
খুশী হৈয়া খাইতরে ভাত বাপ পুতর মতন।"

এলাকাটি এরি মধ্যে একদিন 'গরুকি বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেলো। আজগরের সর্ব্ব গেলো। মালেক যে কোথায় টেউএর সাথে ভেসে গেলো তার কোনো হদীসই পাওয়া গেলো না। নিরুপায় আজগর স্ত্রী কন্যা নিয়ে দেওগাঁও ছেড়ে রঙ্গদিয়ার চরে কুটীর তৈরি করলো—

"স্তিরি কন্যা লইয়া আজগর থাকে রঙ্গদিয়ার
সুখে দুঃখে এক মতন দিন কাড়ি যায়।"

এদিকে মালেক বহু জায়গা ঘুরে দেওগাঁর ঝালি ভিটা দেখে রত্নদিয়ার চরে এসে হাজির। নুরুন্নেহা তাকে পরম যত্ন করে খাওয়ায় তার বাপের সংগে বসিয়ে, এবং রাতের বেলা সবাই স্বপ্ন ঘুমিয়ে পড়লো, তখন সে উঠে পড়লো—অবুঝ মন কিছুতেই মানা মানলো না—

‘মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উঠে
হরা চাপা দিলেরে ভাত যেমন করে ফুটে।

নুরুন্নেহা সেই নিরুন্ম রাতে মালেকের কাছে গিয়ে হাজির হলো। এমনি করে দিন-রাত তারা “পীরিতির রসে ডাসতে” থাকে। এরি মধ্যে একদিন হার্মাদেদার আজগরের বাড়ী আক্রমণ করে তার টাকা পয়সা সব লুটে নিলো; এবং নুরুন্নেহা আর মালেককেও বেঁধে নিয়ে গেলো। সমুদ্রের মাঝে জেলেরা ডাকাতদেরকে হারিয়ে মালেক ও নুরুন্নেহারকে উদ্ধার করে। বেহাশ নুরুন্নেহার হাশ কিরিয়ে আনতে ওদের খুবই কষ্ট করতে হয়। হাশ কিরে এলে—

‘ইছুপরে পাইল যেন জোলেখা সুন্দরী’। মালেক নুরুন্নেহারকে নিয়ে রত্নদিয়ার চরে কিরে এলো। বাপ-মার সুখ আর ধরে না।

শ্রেম কিছুতেই গোপন করা যায় না—
“আউনে উনায় ঘি-ও যদি কাছে থাকে
ছাড়াই দিতে ন পারেরে যদি পীরিত থাকে।
নুনা পানি ছাকি রৈলে ন যায়রে নুন
দিনে দিনে বাড়ে পীরিত এমনি তার গুণ।
পাষাণের দাগ পীরিত মনে পৈলে আঁকা
যত না গোপনে হৌকরে না থাকিব ঢাকা।”

আজগর নুরুন্নেহা ও মালেকের মতিগতি বুঝতে পেরে মালেককে কাছে ডেকে নিয়ে বললো—নুরুন্নেহার সাথে তার শাদি হতে পারে না। কারণ, মালেক ও নুরুন্নেহার মা একই, তারা ভাই-বোন হয়। নজু মিঞা খুব ধুমধাম করে বিয়ে করলেও, মালেকের জন্মের পরই তাকে নানা জনে নানা কথা বলতে থাকে, তখন নজু তার ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। সেই অসহায় নারীকেই পরে আবার নিকা করে আজগর, তারই গর্ভে জন্ম হয়েছে নুরুন্নেহার। মালেক এ কথা শোনার পর আর ঘরে কিরে এলো না, বিরাগী হয়ে এক বালাম নৌকায় চড়ে দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেলো। এদিক আজগর, নুরুন্নেহার কী উৎকর্ষ প্রতীকা মালেকের জন্য! কিন্তু মালেক এলো না।

কিছু কাল পরে আজগর, তার স্ত্রী ও নুরুন্নেহা সবই একের পর এক বসন্ত হয়ে মারা গেলো। পাঁচ বছর পর, মস্তবড়ো ভোয়াঙ্গর হয়ে মালেক রঙ্গদিয়ার চরে ফিরে এসে সব কিছু শুনে প্রচণ্ড এক আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়লো। সমুদ্রের পারে সে খুঁজে পেলো তাদের তিনটি কবর। তারি একটির উপর সে গিয়ে শুয়ে পড়লো। দিন গেলো, রাত এলো, তার হুশ নেই। শেষ রাতে সে শুন্তে পেলো, নুরুন্নেহা কবরের ভেতর থেকে যেন বলছে তার গায়ে গোশত আর লৌ শিরা না থাকলেও সে মালেকের কথা ভুলেনি, গিরা খুলেনি :

‘খুলিত নাই গিরায়ে ভাই রইয়ে মনর বান
মওতেও হামিশ খন কাঁদে পরান নান।

দাঁড়ি মাঁহারা বহু টানাটানি করলো, তবু মালেক আর গেলো না। সেই মালেক হলো মালেক পাগলা।

কাব্য বর্ণিত রঙ্গদিয়ার চর, দেওগাঁও, পাঁচ গৈরা, কালা পানি, উজানটেক, লালদিয়া ও সোনাদিয়া দ্বীপ চট্টগ্রামের কতিপয় স্থানের নাম। এই গ্রাম ও দ্বীপগুলি এখনো বর্তমান আছে। শুধুমাত্র ‘ধান-চিবান্যা ও আগার চর বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত।

এই পালাটিতে পর্তুগীজ হার্মাদদের উৎপাতের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

নুরুন্নেহা চরিত্রটি অংকনে অজ্ঞাতনামা পত্নী কবি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন পত্নী সাহিত্যে তা বিরল। মালেক চরিত্রটি তুলনায় অনেকখানি নিশ্চল। ‘নুরুন্নেহা যেন স্বভাবের শিশু। প্রেমই তাহার জীবন এবং তাহার বাঁচিবার উপাদান ও অবলম্বন।’ (দীনেশ সেন)।

সূজা ভনয়ার বিলাপ

এই পালা গানটি শ্রীযুত আন্ততৌষ চৌধুরী সংগ্রহ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের অন্যতম ভ্রাতা সূজা ভ্রাতৃঘ্নের পরিণাম স্বরূপ বিতাড়িত হয়ে কিছুকাল ঢাকায় বসবাস করেন। তারপর সেখান থেকে হস্তী-পৃষ্ঠে চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখান থেকে চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমান্য নাক নদীর তীরে উপনীত হলে আরাকানের রাজ প্রতিনিধি তাঁকে অভ্যস্ত তাজিমের সাথে স্বাগতম জানান।

প্রায় সকল ঐতিহাসিকই আরাকান রাজের মহানুভবতা ও সহৃদয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, আরাকান রাজ শাহ সূজা ও তাঁর পরিবার পরিজনবর্গের জন্য একটি সুন্দর দালান বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শাহ সূজার কন্যার রূপে মোহিত হয়ে আরাকানরাজ সন্দ-সুধম্ম তাঁর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করলে, একটি ঋণবদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় শাহ সূজাকে পত্নী পরীবাণু ও একটি কন্যাসহ বঙ্গোপসাগরে ছুঁবিয়ে মারা হয়।

‘রাজ-মালা’র গ্রন্থকার কৈলাসচন্দ্রের মতে, “সূজার পত্নী পরীবানুর রূপ ও গুণ গাঁথা এক সময়ে বঙ্গে পত্নীতে পত্নীতে গীত হইত। সে সকল গ্রাম্য গীতি এখন বিস্মৃতির সাগরে বিলীন হইয়াছে।” ‘সূজা-তনয়ার বিলাপ’ নামক ক্ষুদ্র গীতিটিও একই জাতীয়। ইহা সম-সাময়িক কোনো অজ্ঞাত চাষী-কবির রচনা বলে অনুমিত হয়। সূজা পরিবারের বিয়োগান্ত পরিণতি এবং বঙ্গোপসাগরে তাদের শেষ সমাধি, স্বাভাবিকভাবে এই এলাকার তৎকালীন বাসিন্দাদের মধ্যে গভীর সমবেদনা ও কারুণ্য উদ্বেক করেছিলো। সন্দ-সুধম্মর মুসলিম সভাসদ, তাঁর কাব্যে যা অতি গোপনে ও রেখে-ঢেকে বর্ণনা করেছেন, নিরঙ্কর চাষী কবির হাতে তা-ই হয়ে উঠেছে আবেগের তীব্রতায় প্রচণ্ড। কেউ কেউ এ গীতিকাটিকে বাড়বানলের সাথে তুলনা করেছেন—এর “একদিকে তরঙ্গায়িত নয়নবারি এবং অন্যদিকে ধুমায়মান বহি।” শোকাহত, অপমানিত সূজা-তনয়া একবার বলছেন :

“দুরগত্যা পরাণ আমার ন যায় নিকলি
ভূইষর আইল্যা হৈয়েরে বৃগ উডের জ্বলি জ্বলি।”

আবার অন্য সময় তিনি রাগে, বিকোভে আহতা কণিনীর মতো ফুসে উঠছেন, এবং চাষী রমনীর ভাবায় গালি দিয়ে উঠছেন :

“কন্ সতীনর পুতর সঙ্গে করিলি ছুহুক।”

মগরাজা সন্দ-সুধম্ম সূজা, পরীবানুও তাদের একটি কন্যাকে সমুদ্রে ছুঁবিয়ে নিহত করে এবং সূজার অপর কন্যাকে বলপূর্বক তার অন্তঃপুরে বন্দী করে। সম্ভবতঃ এই কন্যাকে নিয়েই শাহ সূজার সাথে তার মনোমালিন্যের কারণ ঘটেছিল। জগজ্জয়ী তাজমহলের নির্মাতা শাহ জাহানের পৌত্রী মাছ পঁচিয়ে তৈরি করা ‘নাগপি’ খেতে, কালো “ধামী” ও কানে সোনার ‘নাধং’ পরতে বাধ্য হয়েছিলেন। সূজা তনয়ার এ দুঃখ

ও মর্মবেদনা বর্ণনা করার ভাষা নেই বটে, তবু পশ্চীর নিরঙ্কর চাষী কবি এ নিয়ে যে পালা গান রচনা করেছেন, তাতে সীমাহীন দুঃখের অনেকখানিই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ভাষার নমুনা :

“কু সাহাতে আইলরে বাপ মঘ্যা রাজার দেশে
কুলও দিলি মানও দিলি জানও দিলি শেষে ।
ধন-দৌলত লৈয়ারে তুই পোলালি কার ডরে
সোনার জেয়র হীরামতি রাখিলি কার ঘরে ।

অথবা

আচমানেরি ফুলরে ছিলাম আচমানেরি ফুল
মঘ্যা রাজার হাতে পড়ি দিলাম জাতি কুল ।
সাইগরের তলে মা বাপ করিলি কল্পবর
হার্মাদ্যার মুহুরে আমার কে লৈব খবর ।”

পরী বানুর হাঅলা

‘সূজা’ তনয়ার বিলাপের অনুরূপ এই পালাটিও আওতোষ চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত হয়। চট্টগ্রামের ডবলমুরিং থানার আনরাবাদ গ্রামের খলিলুর রহমান ও আরাকানের মৎসু মহকুমার মৌলবী আবদুল হালিমের নিকট থেকে এ পালা গানের কিছু অংশ তিনি সংগ্রহ করেন। বেশীর ভাগ সংগ্রহ করেন পেরুয়া ধীপের উজ্জান টেইয়া গ্রাম নিবাসী মনসুর আলীর কাছ থেকে। পেরুয়া ধীপের ঐ অঞ্চলটিতে এ পালা গানটি ‘পরী বানু হাঅলা’ নামে পরিচিত।

এই পালা গানটিতে আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা আরাকানে আশ্রয় গ্রহণকারী হতভাগ্য সূজার জীবনের শেষ করদিনের কাহিনী করুণ রসাত্মক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সূজা ও তাঁর পত্নী পরী বানুর কাব্য বর্ণিত এই পরিণতি ইতিহাস-সম্ভব কিনা তা বলা মুশকিল, তবে এ কাহিনী যে পাঠক মাজকেই বিচলিত করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ গানটিতে জানা যায়, সূজা ও পরী বানুকে আরাকানরাজ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়ে মারেন নি,

বরং তাঁরা আরাকান রাজের দুর্ভিসন্ধি থেকে নিজেদের ইচ্ছত রক্ষা করার অভিপ্রায়ে নিজেদের কন্যা দু'টিকে রেখে রাত্রিযোগে নৌকায় করে বঙ্গোপসাগরে ভেসে পড়েন। বাদশাহ্ সূজা ধরলেন নৌকার হাল। কিছু সমুদ্রের বুকে ক'দিনই বা অমন করে চলে? অনেক দুঃখ-কষ্ট সয়ে শেষে ক্রান্ত হয়ে পড়লেন সূজা। কালাপানিতে এসে তাঁর নৌকা ডুবুডুবু—তখন বাদশাহ্ ও বেগম পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বাঁপ দিলেন সমুদ্রে—তাজমহল নির্মাতা শাহজাহানের পুত্র ও পুত্রবধুর অন্তিম শয্যা রচিত হলো বঙ্গোপসাগরের তলায়।

এ গীতিকাটির ভাষা কারুণ্যের গভীরতায় মর্মস্পর্শী।

কবি যখন বলেন :

‘ভাইয়ে চাইলো ভাইয়ের লোউ মিছা রাজ্যর লাগি
গরীব ওইন্যা বেশী ভালা যারা খায় মাগি।
কিসের রাজ্য কিসের ধন কিসের টাকা কড়িয়ে
সাইগরে ডুবালি পরীরে’-

তখন ইতিহাসের পটভূমিতে মানব জীবনের একটা করুণ, একটা পরম সত্য্য মুহূর্ত হয়ে ওঠে।

ভ্রাতা আওরঙ্গজীব কর্তৃক বিভাড়িত হয়ে সূজা স্ত্রী-কন্যাসহ রোসাকরাজের আশ্রয় নিয়েছিলেন— কিছু হায়,

‘ভোগালুয়ে ভাত চায় তিয়াসিয়ে পানি
পানিরে পাইলে নন্দী বুকে লয় টানি।

নসিবের দোষে আরাকানরাজ তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো, কারণ,

‘পরীর লাগিন্না রাজা হইল পাগল।’

‘দেশ নাই, রাজ্য নাই, না আছিল দুখ’, কিছু বিদেশ বিহুঁয়ে যে তাদের আশ্রয় দিলেছিলো, তারই লুক্ক নজর পড়েছে পরীবানুর উপর। এ দুঃখ রাখার ঠাই কোথায়? দু’জনে সলাপরামর্শ করে, ইচ্ছত বাঁচানোর জন্য, এক আরাকানী জেলাকে পরীবানুর সোনার হার উপহার দিয়ে, প্রভাতকালে ‘পরথম জোয়ারের হ হ কন্না পানিতে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন—সূজার হাতে নৌকার বঁটা :

‘বেমান দরিয়ান্ন মাঝি নয়্য এক মাঝি
আওরতে লইয়া সঙ্গে পাড়ি দিয়ে আজি ।’

তারপর, মাঝ দরিয়ান্ন এসে, ‘ঢেউ-এর বাড়ি খেয়ে

‘ছুপিল ছুপিল নৌকা—সূজা পরীজান

দরিয়ান্ন মাঝে হায় দিলরে পরাণ ।

মরণেও রৈল তারা বুক জড়া জড়িরে—

সাইগরে ডুবালি পরীরে ।’

লোক সাহিত্যের আরো কয়েকটি দিক

উপরে আলোচিত পালাগানগুলি ছাড়াও চট্টগ্রামে আরো বহু পালাগান, বারমাসী ও কিস্সার খবর পাওয়া গেছে। এর কিছু কিছু সংগৃহীত এবং প্রকাশিতও হয়েছে। এই কিস্সা, পালাগান ও বারোমাসীগুলির নাম ‘নসিরাম বাদশার কিস্সা’, ‘গোরক্ষ বাদশার কিস্সা’, ‘কাঁশ বাশী ও বাঁশ বাশী’, ‘রাখাল রাজা’, ‘আলু-কালুর বারোমাস’, ‘রাধার বারোমাস’, ‘সীতার দশমাসী’, ‘সীতার বারোমাসী’, ‘নিমাই-এর বারোমাসী’, প্রভৃতি। এসব গানের রচয়িতা ও কাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শেষোক্ত পাঁচটি বারোমাসী বাদ দিলে, বাকী পালাগান ও কিস্সাগুলি চট্টগ্রামী ভাষায় রচিত; এগুলিতে কবিত্বগুণ বেশি কিছু নেই, চরিত্র-চিত্রণও বৈশিষ্ট বর্জিত। আঞ্চলিকতাই এগুলির বিশেষ গুণ। বারোমাসীগুলি বিত্তরু বাঙলা ভাষায় রচিত এবং চট্টগ্রামী ভাষার কোনো প্রভাব এগুলির উপর দেখা যায় না। এসব শিক্ষিত লোকের রচনা বলে মনে হয়। এই পাঁচটি বারোমাসী সংগ্রহ করেছেন চট্টগ্রাম ধলঘাটের শ্রীআদিনাথ সরকার। বারোমাসীগুলির নামেই বিষয়বস্তুর বিজ্ঞাপন রয়েছে।

এগুলিকে বাদ দিলে আরো যেসব পল্লীগীতির সন্ধান পাওয়া গেছে তা বৈচিত্র্যে, ব্যাপকতায় বিস্ময়কর। জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা নিয়ে চট্টগ্রামের নিরক্ষর লোকেরা গান রচনা করেননি। বাচ্চাদের মাথা কামানোর গান থেকে শুরু করে নাতিনের গান, বিয়ে-শাদীর গান, রোদ আর বৃষ্টির গান, ঘুম পাড়ানি গান, মা-বাপের বিলাপের গান, মুশিদী, ভাটিয়াসী খেলোয়াড়ী গান—ইত্যাদি অজস্র রকমের গানে চট্টগ্রামের পল্লী গান সমৃদ্ধ। চট্টগ্রামের শাদি-বিয়ের গানকে ‘হাঁহলা বা ‘হঁলা বলে। ঘুম পাড়ানি গানগুলিতে মাসী-শিসীর স্থান গ্রহণ করেছে ‘নিদ্রাউলী মাউ’।

এ জাতীয় পল্লীগীতিগুলির কিছু কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া যাচ্ছে :

মেয়েলী গান :

“ছিবা গাছত বৈসেয়র তোতা
মা'রে জ্বালাতি,
মায় দিয়ে দস্তর খান
বাশে দিয়ে শাড়ি,
সেই শাড়িখান যদদুর লম্বা
খুল্যা মায়ুর বাড়ী॥
খুল্যা মাঁউ ভাত খাইত বৈসো
হানক ভরা লই
মুলি মিঞা পুঁথি পড়ের
মালত্যা লই ।
মালত্যা বেজার আইয়ে
কুরার ঠেংগান লই॥”

নীচের দু'টি পদে বুড়োর তরুণী-স্ত্রীর মনোভাব অতি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে :

“বুজ্যা যদি মরে
কুদাল ভাঙ্গি নথু গড়াইম
নাকে যত ধরে ।”

রোদ এবং বিষ্টির জন্য চট্টগ্রামী ভাষায় অনেক ছড়া আছে । রোদের একটি ছড়া নিম্নরূপ :

‘রইদলে রইদানী
চাঁদার মারে পুতানী
চাঁদার হাতে বৈল ফুল
চিড়চিড়ি মারি রৈদ তুল ।
উইর ভলে ধোরা হাপ
ফালদি উঠ্য বোয়র বাপ
বোয়র বাপ চতুরা
দরগ্যার পানি মথুরা ।”

খরায় যখন দেশ-জুড়ে 'হা পানি' 'হা পানি' রব ওঠে তখন চাটগাঁর মানুষ বিষ্টির
ছড়া কাটে :

“মেঘ রানিরে ঠেং ধুই ধুই পানি ফেলা পানিরে
ঠেংর পানি ন পাইয়া
হাইল্যা মরে ঠাঁড়াইয়া
হাইল্যা তারা সাত ভাই
নাকল ধুইত পানি নাই
মোহা তারা পাঁচ ভাই
অজু বানাইত পানি নাই
ধুইজা তারা দোন ভাই
কাপড় ধুইত পানি নাই
মেঘ রানিরে ঠেং ধুই ধুই ফেলা পানিরে ।” ইত্যাদি ।

চট্টগ্রামের একটি ঘুম পাড়ানি গানের নমুনা :

“ঘুম যারে দুধের বাছা
ঘুম যারে ছুই
ঘুমরতন উড়িলে বাছা
লই বেরাইয়ম মুই ।
সোনার দিয়ম ঢুলইন কোঁড়া
রূপার দিয়ম দড়ি
ঢুলইনের বাইর কাইর দি
চারজন দিয়ম চৌকিদার প্রহরী ।
বাইরগ্যা বাঁশর বেতর ঢুলইন
অমোর কেরাগ বেতর বান
সেই ঢুলইনে ঢুলিবরে যাদু
মোর পূর্ণ মাসীর চাঁন ।
ঝর পড়েৱলে ফোড়া ফোড়া
বাইরে ভিজের লাই
দুধের বাছা ঘুম যাদে
সোনার ঢুলইন পাই ।”

একটি বিরহের গান নিম্নরূপ :

সূর্য উডের লে ভাই লাল মারী,
রস্যা বন্ধু ছাড়ি গেল গৈ রে বৃগত ছেল্ মারি ।
শংকর খালর কূলর উয়র ও ভাই রস্যা বন্ধের ঘর
লাগত পাইলে কইয়রে তারে আমার পরাণের খবর ।
নিদয়া বন্ধের জ্বালায়রে পঁরাণ আমার যায় ছাড়ি ।
শংকর খালর পানিরে কালা, কালারে দুশ্মন
তারতুন অধিক কালা ও ভাই পাষাণ বন্ধুর মন ।
ফিরিয়া ন চাইল বন্ধুরে অবলারে গেল ছাড়ি ।
কইয়রে কোকিলা বন্ধু পাষাণ বন্ধের ঠাই,
এতোদিনে পীরিতের নারী তোমার এ জগতে নাই—
পাইলে একবার কইয় বন্ধুরে—
মরা মুখখান চাই তারি ।

রূহের সংগে দেহের সম্পর্ক একটি গানে পোষা ময়না পাখির রূপকে অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

“আমারি পালনা ময়না কোন্ বনে যায়রে
আমারি চুটালী ময়না কোন্ বনে যায়রে ।
ঝাঁকে থাকে ঝাঁকে উড়ে
ঝাঁকে আদার খায়রে—
আমারি পালনা ময়না কোন্ বনে যায়রে ।
যাইবারে না কালে ময়না ফিরিয়া ন চায়রে৷”

এসব ছড়া শ্রেমগীতি ছাড়া চট্টগ্রামে অনেক তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতামূলক গানেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। গীতি কবিতা আলোচনাকালে সুকীভাবেপন্ন কবিদের কারো কারো নাম উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু যেসব গানের রচয়িতার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না সে সবেসব সংখ্যাও নেহায়েৎ নগন্য নয়। এসব ছড়া ও গানের কিছু কিছু চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের উদ্যোগে সংগৃহীত হয়েছে। এগুলি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হলে একটা মূল্যবান সম্পদের সাথে দেশের সুধী মহলের পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটবে।

গ্রন্থ পঞ্জী

১। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা :

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

২। পুঁথি পরিচিতি : আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশ্যারদ,

সম্পাদনা-আহমদ শরীফ

৩। Antiquity of Chittagong : S.C Das. JASB 1898

৪। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) : ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

৫। মুসলিম বাঙলা সাহিত্য : ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক

৬। আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য : ডক্টর এনামুল হক

আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

৭। History of Bengal. Voll. II : Ed. by Sir Jadunath Sarcar

৮। চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানো আমল) :

মাহবুব-উল-আলম

৯। চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল) :

মাহবুব-উল-আলম

১০। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) :

ডক্টর সুকুমার সেন

১১। ইসলামি বাঙলা সাহিত্য :

ঐ

১২। বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস :

আন্ততোধ ভট্টাচার্য

১৩। An Advance History of India : Dr. R. C. Majumdar

১৪। বাঙলা লোক-সাহিত্য :

আন্ততোধ ভট্টাচার্য

১৫। মধ্যযুগে বাঙলা :

শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়

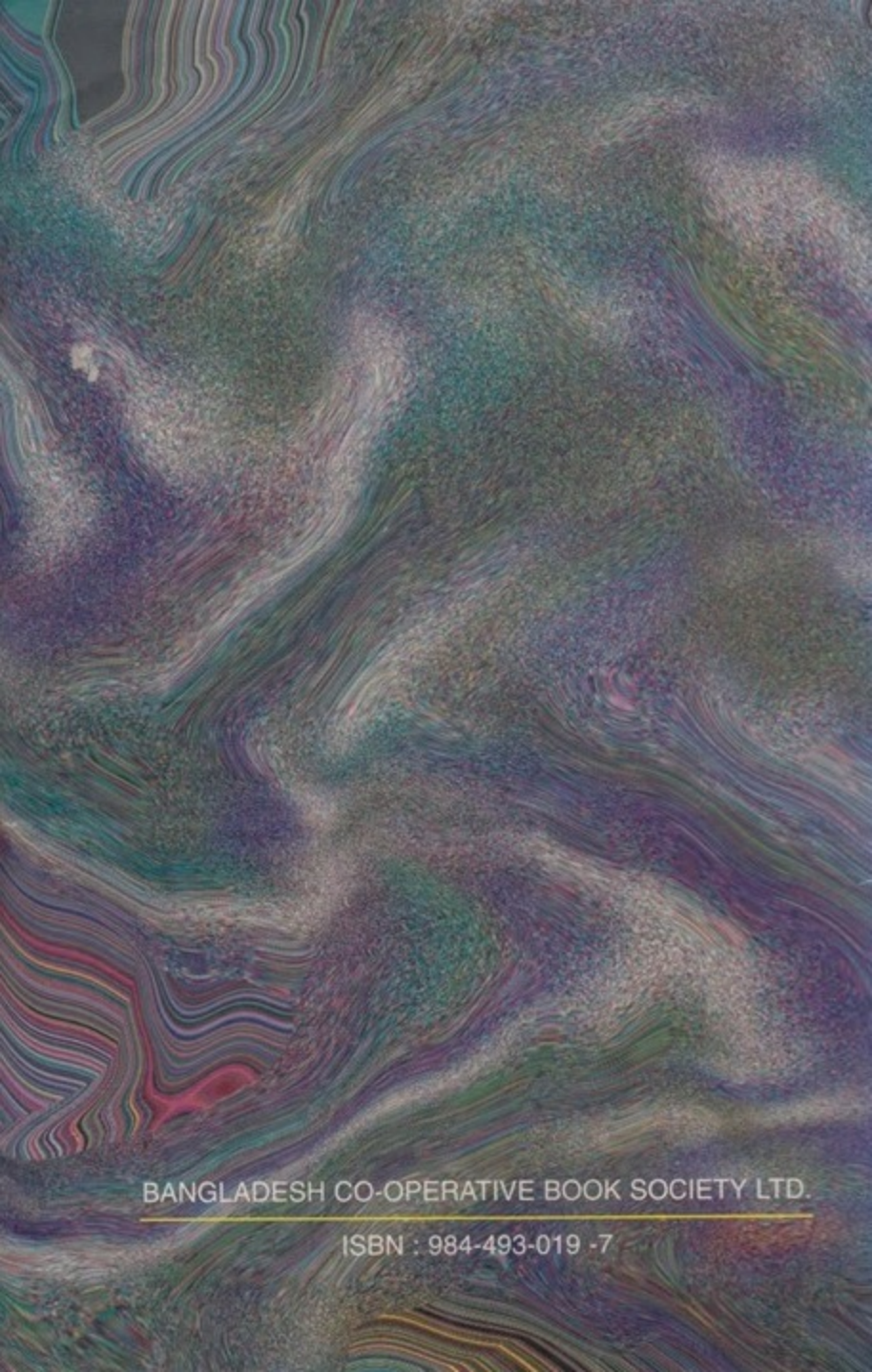
১৬। সাহিত্য পত্রিকা, সংখ্যা : ১৩৬৭

- ১৭। সংস্কৃতির রূপান্তর : গোপাল হালদার
- ১৮। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : ডঃ দীনেশ সেন
- ১৯। ভারতবর্ষ : ২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
- ২০। বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দী অবধি পটভূমি : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা-
ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার *চতুর্থ বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা)
- ২১। বাংলা পুঁথি সাহিত্য Pakistan Publications
- ২২। পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস : আদামুদ্দিন (মাসিক মোহাম্মদী)
- ২৩। ব্রহ্ম দেশের ইতিহাসে মুসলমান : বাঃ এঃ পঃ ৫ম বঃ ১ম সঃ
- ২৪। পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার : এস, এম, ইকরাম
- ২৫। মানব ধর্ম ও বাঙলা কাব্যে মধ্যযুগ : ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার
- ২৬। সাময়িক পত্রে বাঙলা সমাজ চিত্র : ১ম খণ্ড, বিনয় ঘোষ
- ২৭। Social History of Muslims of Bengal by :
Dr. Abdul Karim.
- ২৮। পূর্ববঙ্গ গীতিকা : তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা
- ২৯। পূর্ববঙ্গ গীতিকা : চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা
- ৩০। মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্য : ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(মাহেনও, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮)
- ৩১। চট্টগ্রামী বাঙলা রহস্য ভেদ : ডঃ এনামুল হক
- ৩২। মধু মালতী : সম্পাদনা, আহমদ শরীফ
- ৩৩। বাঙলা ভাষাতত্ত্বেও ভূমিকা : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- ৩৪। বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড) : গোপাল হালদার
- ৩৫। বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় খণ্ড) : গোপাল হালদার

• #####



বাংলা ভাষার প্রখ্যাত গল্পকার, প্রবন্ধকার, অনুবাদক, সাবেক এম.পি.এ. ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক শাহেদ আলীর জন্ম দায়িরপুর থানার মাহমুদপুর গ্রামের ১৯২৫ সালে। তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রভাতী, সৈনিক, দৈনিক বুনিয়াদ, ইসলামিক একাডেমি পত্রিকা, সবুজপাতা সম্পাদনা করেন। তিনি বগুড়া আজীজুল হক কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, বাংলা কলেজ, আবুজর গিফারী কলেজ, নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পরিচালক হিসাবে ১৯৮২ ইং সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শাহেদ আলী বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসিদ্ধী। তাঁর প্রকাশিত গল্প গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে উপন্যাস হৃদয় নদী, গল্প গ্রন্থ জিব্রাইলের ডানা, একই সমতলে, শা'নযর, অতীত রাতের কাহিনী, নতুন জমিনদার, অমর কাহিনী, শাহেদ আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প। সাহিত্যের জন্য তিনি পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, রাষ্ট্রীয় একুশে পদক, জালালাবাদ স্বর্ণপদক সহ আরো অনেক পদক। তিনি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি, আবুজর গিফারী কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং নিজ এলাকায় মোয়াজ্জমপুর জুনিয়র হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।



BANGLADESH CO-OPERATIVE BOOK SOCIETY LTD.

ISBN : 984-493-019 -7